কিছু ভাবনা

জাতীয় অধ্যাপক
ডাঃ নুরুল ইসলাম

492

কিছু ভাবনা

University of Science & Technology Chittagong
9580
CENTRAL LIBRARY
1992

কিছু ভাবনা

জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম, এসআই ;
এমবি, কলি ; টিডিডি, ওয়েলস ; এফসিপিএস, পাক ;
এফআরসিপি, লন্ডন ; এফআরসিপি, এডিন ;
এফএএস ও এফসিজিপি, বাংলাদেশ

080.61
NUK

CENTRAL LIBRARY
Acc. No. 9580
Date. 30.3.09
JUSTC
1992

কিছু ভাবনা
SOME THOUGHTS

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬
First published : 1996

প্রকাশনায় : আনোয়ারা ইসলাম
Published by : Anwara Islam

গ্রন্থস্বত্ব : আনোয়ারা নুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
গুলমেহের, ৬৩, সেন্ট্রাল রোড
ঢাকা – ১২০৫

Copyright : ANWARA-NUR WELFARE TRUST
Gulmeher, 63, Central Road
Dhaka - 1205

প্রচ্ছদ : আয়েশা ইসলাম
Cover design : Ayesha Islam

কম্পোজ : নৃশা কম্পিউটারস
৩৪, আজিমপুর সুপার মার্কেট
ঢাকা – ১২০৫

মুদ্রণ : মমিন অফসেট প্রেস
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা
ঢাকা – ১২০৫

মূল্য : অফসেট : ১৫০.০০ টাকা
Offset : Tk. 150.00
: সাধারণ : ১০০.০০ টাকা
Ordinary : Tk. 100.00

SOME THOUGHTS is a compilation of articles published or presented by the author on various occasions concerning wide range of subjects from Health Care to Quality Assurance and Herbal Medicine.

উৎসর্গ

প্রয়াত পিতা
সৈয়দুর রহমানকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ সংকলন যাদের প্রেরণায় :
আনোয়ারা, দীনা, ইফতেখার, নীনা ও সেলিম জাহাঙ্গীর

মুদ্রণ প্রমাদ বর্জনে :
বাংলা : মনফিক, রহিম ও ডা: সাইফুল
ইংরেজি : ডা: প্রবির, শিবলি, রাশেদ, ডা: সাইফুল ও আনোয়ারা

ছাপাখানায় সংযোগ রক্ষা এবং পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে :
সুকুল মিত্র বড়ুয়া

সহকারী রূপে নানাভাবে :
জব্বার, মাহবুব, বারেক, আব্বাস ও শাহজামাল

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :
ড: সেলিম জাহাঙ্গীর

A PRIZE FOR MY WIFE

I do acknowledge the ungrudging help and constant encouragement I received from my wife Anwara during the whole process of this publication. Her last minute correction removed many 'printer's devils'.

She shares my pleasure at the outcome, 'That is my prize', she says.

ভূমিকা

বিভিন্ন ফোরামে নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ আমার জীবনে বহুবার এসেছে। কোথাও প্রধান বক্তা কিংবা অতিথিরূপে আবার কোথাও বা সেমিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

নানা পত্রপত্রিকায় একাধিক বিষয় নিয়ে বিশেষ দিবস কিংবা সাক্ষাৎকারে আমার বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে অনেকবার।

এ সকল বক্তৃতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, সাক্ষাৎকার নিয়েই 'কিছু ভাবনা'।

আমার চিন্তাভাবনা যদি পাঠকদের উৎসাহ যোগায়, গঠনমূলক সমালোচনার বিষয়বস্তু হয় এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম-কাণ্ডের সূচনায় সহায়ক হয়, আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

নুরুল ইসলাম

'গুলমেহের'
৬৩, সেন্ট্রাল রোড
ঢাকা – ১২০৫
জানুয়ারী ২৪, ১৯৯৬

University of Science & Technology Chittagong
CENTRAL LIBRARY
9580
1992

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৯	দেশোপযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থা চাই
১৪	আজকের শিশু
১৭	পরীক্ষানীতি
২৩	ডাক্তার আপনি নিজে কেমন আছেন
২৯	সুচিকিৎসা জন্মগত অধিকার
৩৬	বিএমএ সম্মেলন
৪০	প্রেসক্রিপশনে ঔষধের ছড়াছড়ি
৪৫	কে দেবে এই প্রেসক্রিপশন
৪৭	কর্তব্যনিষ্ঠাই চিকিৎসকের আদর্শ
৫০	চিকিৎসা বিদ্যায় বাংলা
৫৭	আমাদের চিকিৎসা সমস্যা
৬৪	বুদ্ধিজীবিদের সাক্ষাৎকার
৬৮	উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজী না বাংলা
৭১	রোগ-রোগী-চিকিৎসক
৮৩	গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষাজ্ঞান
৮৭	তামাক ও ধূমপান বিষয়ক সেমিনার
৯৪	আই, ডি, ই, ১২তম কাউন্সিল
১০১	সাংবাদিক ইউনিয়নের ১৪তম কাউন্সিল
১০৩	এখনো সেকেলে চিকিৎসা

বিষয়	পৃষ্ঠা
একুশ এখনো অজানা	১১৭
বিশ্ববিদ্যালয় দিবস	১২০
'এডাব সংবাদ- এর সাথে সাক্ষাৎকার	১২৯
আই এ এইচ এস	১৩৭
ঢাকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা	১৪৩
মানের মাপকাঠি আইনের বালাই নেই	১৫৮
পেশা জনসাধারণ এবং সংবাদপত্র	১৬৬
আইএএইচএস- এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	১৭৮
সাপ্তাহিক রোববারের সাথে সাক্ষাৎকার	১৮৫
মাদকাশক্তির অভিশাপ	২০০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	২০৯
গণমাধ্যম ও তামাক	২১৮
তিনটি দেশের রাষ্ট্রদূত	২২১
মরহুম আবদুর রহমান চৌধুরী	২২৪
চট্টগ্রাম পরিষদ কলিকাতা	২২৯
বাংলাদেশ দর্শন সমিতি	২৩৪
চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে গুণীজন সংবর্ধনা	২৩৮
তামাক শিল্প সঞ্চয়ের নয়, সংকটের	২৪২
ধূমপান বিসর্জনে মসজিদের ইমাম	২৪৬

দেশোপযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থা চাই

বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করে দেশোপযোগী একটি ব্যবস্থা চালু করা দরকার। দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন মহল থেকে এই দাবী উচ্চারিত হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা দরিদ্র ও রুগ্ন জাতির জন্যে অনুপযুক্ত, এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। এসব কথা যাঁরা বলছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম তাঁদের একজন। প্রফেসর ইসলাম পিজি হাসপাতাল ও চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের পরিচালক।

সম্প্রতি দৈনিক বাংলার এই রিপোর্টার প্রফেসর নুরুল ইসলামের এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। নীচে সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেয়া হল ঃ*

প্রশ্ন ঃ দেশোপযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে আপনি কি বোঝাতে চান?

উত্তর ঃ এমন ব্যবস্থা যা আমাদের দেশের প্রয়োজনের পরিপূরক হবে।

প্রশ্ন ঃ আরো স্পষ্ট করে বলুন।

উত্তর ঃ যেমন একটা উন্নত দেশের আর উন্নয়নশীল দেশের চাহিদা এক নয়। সমস্যাও এক নয়। রোগ–বালাই–এর ক্ষেত্রেও সমস্যার চেহারা আলাদা। ফলে ওষুধপত্র ও চিকিৎসার মধ্যে তফাৎ রয়েছে। একে বলা হয় জিওগ্রাফিক মেডিসিন। অন্যতম উদাহরণ ক্যান্সার। পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলে যকৃৎ–এর ক্যান্সার দেখা যায় বেশি। আবার পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায় ফুসফুসের ক্যান্সার বেশি। এটা হয় পরিবেশগত পার্থক্যের জন্যে। যক্ষ্মার ব্যাপারটাও তাই। এখন দেখা যাচ্ছে, যক্ষ্মায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা এশিয়ার বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণ–পূর্ব দিকে বেড়ে চলছে। জাপান এশিয়াতে হওয়া সত্ত্বেও সেখানে যেসব অসুখ–বিসুখের প্রবণতা দেখা যায়, তা আমাদের দেশে তেমন নেই।

আমাদের দেশের লোক বেশি থাকেন গ্রামে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাঁরা সুচিকিৎসা পান। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে চিকিৎসকরা গ্রামে যেতে ক্রমাগত অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। আমাদের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা শহর ও হাসপাতাল ভিত্তিক। গ্রামের সাধারণ মানুষ চিকিৎসার ব্যাপারে নিদারুণ অবহেলিত।

---

* ৭. ৫.৭৬. ইং তারিখে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত। সাক্ষাৎকার গ্রহণে : আহমেদ নূরে আলম

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন ধরে একটা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে আমাদের চিকিৎসকরা গ্রামে যেতে চান না।

উত্তর ঃ শুধু চিকিৎসকদেরকে একতরফাভাবে অভিযুক্ত করা সঠিক হবেনা। শহরের সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে কে গ্রামে যেতে চায় বলুন? শহর ও গ্রামের পরিবেশগত পার্থক্য একটি বাস্তব সত্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও লক্ষ করা গেছে যে, সেখানেও চিকিৎসকদের শহরমুখী প্রবণতা রয়েছে। সেখানকার গ্রাম আর আমাদের গ্রামের পার্থক্য অকল্পনীয়। সেখানকার গ্রামে শহরের সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল নয়। আমাদের শহর ও গ্রামের পরিবেশগত পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েও আমরা একথা বলতে পারি না যে, গ্রামের লোক সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকবেন। আমাদের চিকিৎসকদেরকে গ্রামমুখী করে তোলার জন্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ কম সময়ে গ্রাম পর্যন্ত ডাক্তার পাঠাতে আমাদের কি করা উচিত?

উত্তর ঃ আমাদের সামনে তিনটি উপায় রয়েছে। এক — অধিকসংখ্যক ডাক্তার তৈরি করতে হবে। দুই — ডাক্তারের সমপর্যায়ের নির্ভরযোগ্য এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে গ্রামে পাঠাতে হবে। তিন — বর্তমানে আমাদের মেডিক্যাল ও প্যারামেডিক্যাল ব্যক্তিদের যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

ম্যাট্রিক বা আই.এসসি. পাস বেকার যুবকদেরকে আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামে পাঠাতে পারি। এই প্রশিক্ষণকাল এক বছর থেকে দু' বছরের জন্যে হতে পারে। জেলা বা সদর হাসপাতালে এরা চিকিৎসকদের অধীনে থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হবে। একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের মাধ্যমে এদের পরীক্ষা গৃহীত হবে। পাস করলে ওরা স্ব স্ব গ্রামে চলে যাবে। এদের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে পর্যায়ক্রমিক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। যাতে এরা ক্রমশ উন্নতি করতে পারে। গ্রামে গ্রামে এখন শিক্ষিত ও বেকার যুবক বসে আছে। এর ফলে সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা ওদের কাজে লাগাতে পারি। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের সাথে জড়িত ১২ হাজার কর্মীকেও প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা তাদেরকে বহুমুখী কাজে ব্যবহার করতে পারি।

প্রশ্ন ঃ গ্রামের বর্তমান হাতুড়ে ডাক্তারদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? এদেরকে কি স্বীকৃতি দেয়া উচিত?

উত্তর ঃ হাতুড়ে বলুন আর যাই বলুন — ওরাই গ্রামের রুগ্ন মানুষের প্রধান ভরসা। ওরা চিকিৎসার সাথে অনেকদিন ধরে জড়িত। এদেরকে আমরা সামান্য চেষ্টা

করলে আরো দক্ষ ও উপযোগী করে তুলতে পারি। সরকারী বৃত্তি দিয়ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণে পরীক্ষা নিয়ে এদেরকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ বিলুপ্ত ন্যাশনাল স্কুলগুলো থেকে পাস করা অনেক চিকিৎসককে সরকার এখনো স্বীকৃতি দেয়নি। এরা প্র্যাকটিস করছে। ওদের কি স্বীকৃতি দেয়া উচিত নয়?

উত্তর ঃ যে সমস্ত ডাক্তারকে সরকার এখনো স্বীকৃতি দেয়নি তাদের একটা পরীক্ষা নিয়ে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। এরা বহুদিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন বলে এদেরকে সার্টিফিকেটও দেয়া যেতে পারে। এজন্য প্রশিক্ষণ নিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত হবেনা। যেমন, বিলেতে এমআরসিপি-র জন্যে সব সময় কোর্স করার প্রয়োজন হয়না। সার্টিফিকেট পরীক্ষায় এধরনের ডাক্তাররা কোর্সের মাধ্যমে বা সরাসরি বিনাকোর্সে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেন, এমন ব্যবস্থা করা উচিত। এরা সার্টিফিকেট পেলে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথ, আয়ুর্বেদ ও হেকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? এগুলোকে কি স্বীকার করে নেয়া উচিত নয় সরকারীভাবে?

উত্তর ঃ হোমিওপ্যাথি একটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান। ভারতেও আয়ুর্বেদ ও হেকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সরকারীভাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। হাজার বছর ধরে আমরা এই কবিরাজী আয়ুর্বেদ ও হেকিমি চিকিৎসা পেয়ে আসছি। আমাদের এই ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনকে বিনষ্ট হতে দেয়া কিছুতেই উচিত নয়। এগুলো নিয়ে গবেষণা এবং পড়ানোর ব্যবস্থাও থাকা উচিত। মহাচীনে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ওখানে এ্যালোপ্যাথী আর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেটা অধিকতর উপযোগী সেটাই গ্রহণ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে কবিরাজী-হেকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক মূল্যবান জিনিস অনাদরে-অবহেলায় চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে এসব নিয়ে গবেষণা করলে এখনো আমরা মূল্যবান তথ্য পেতে পারি।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন বর্তমানে চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা হাসপাতালভিত্তিক। গ্রামের সাথে যোগ নেই আমাদের। এটাই কি আমাদের চিকিৎসকদের গ্রামবিমুখতার প্রধান কারণ নয়? হাসপাতালকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কি দেশোপযোগী?

উত্তর ঃ আমাদের চিকিৎসকদের গ্রামবিমুখতার কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা। যে দেশের শতকরা নব্বই জন থাকেন গ্রামে, সে দেশে হাসপাতালকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রাকটিক্যাল এ্যাপ্রোচ নয়। কারণ, গ্রামীণ পরিবেশে সীমিত সুযোগসুবিধার মধ্যে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা এবং হাসপাতালে নানা রকম সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক সুযোগসুবিধা নিয়ে চিকিৎসা করার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। একটি ছাত্র তার শিক্ষাকালীন অবস্থায় ভবিষ্যতে ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবেশে থাকবে সে পরিবেশে যাতে সুচিকিৎসা পদ্ধতি শিখতে পারে — তা করা হলে, ছাত্রটি পাস করার পরই তো আমরা আশা করতে পারি যে উক্ত পরিবেশটি সে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন ঃ ছাত্রাবস্থায় কিভাবে একজন ভবিষ্যৎ ডাক্তারকে গ্রামমুখী করে তোলা যায়?

উত্তর ঃ আমাদের এমবিবিএস কোর্সের প্রথম দু' বছরে ছাত্ররা মানুষের সংস্পর্শে আসে না। আমরা ওদের পড়াই এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি। বছরে ওরা তিন–চার মাস ছুটি পায়। এ সময়ে আমরা ওদেরকে গ্রামে পাঠাতে পারি। এজন্যে ওদেরকে সম্মানজনক আর্থিক সুবিধাও দিতে হবে। এতে ওরা গ্রামের মানুষের কাছাকাছি আসবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং ওদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাও ওরা উপলব্ধি করবে। চিকিৎসকদের প্রতি জনগণের অসীম শ্রদ্ধাও তাদেরকে ভবিষ্যতে অনুপ্রাণিত করবে। তৃতীয় বছর থেকে ওরা শিক্ষকদের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট করা এলাকায় রোগপ্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। কাজের মাধ্যমে ওরা আনন্দও পাবে। এতে ছাত্র শিক্ষক দুজনই গ্রামে চিকিৎসা সম্পর্কে মটিভেট হবেন।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে অপুষ্টিজনিত রোগ অনেক বেশি। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা কি এমন হওয়া উচিত যাতে রোগীর পুষ্টির দিকেও নজর দেয়া চিকিৎসার একটি অঙ্গ হয়?

উত্তর ঃ খুবই দরকার। অপুষ্টির সাথে অনেক রোগের সম্পর্ক থাকে। অপুষ্টির কারণ অনেক — শুধু অর্থাভাবই নয়। কাজেই সেখানে চিকিৎসকের দায়িত্ব — অপুষ্টিজনিত রোগের চিকিৎসা করা এবং অপুষ্টির মূল কারণ দূর করা, পুষ্টি সম্পর্কে লোককে শিক্ষিত করে তোলা। গ্রাম থেকে আসা কোন রোগীকে হয়তো ৫০ টাকার বিদেশী ওষুধ দিলাম। হয়তো দেখা গেল ওই ওষুধে যে উপকার পাওয়া যাবে তা ৫ টাকার কোন খাদ্যদ্রব্যেও থাকতে পারে। এটা অবশ্যই একজন চিকিৎসককে লক্ষ রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ রোগী দরিদ্র বলে প্রেসক্রিপশন দেয়ার সময় কি ডাক্তারদের কিছু করণীয় রয়েছে?

উত্তর ঃ প্রেসক্রিপশন দেয়ার সময় আমি আরও চারটি জিনিস চিকিৎসকের লক্ষ্য রাখা উচিত বলে মনে করি। তা হল — (১) প্রেসক্রিপশন দেয়া কি জরুরী? (২) কোন্ নির্দিষ্ট ওষুধটি জরুরী? (৩) ওই নির্দিষ্ট ওষুধের বিকল্প বা কম দামের ওষুধ রয়েছে কি? (৪) ওই ওষুধের বদলে প্রাকৃতিক সোর্স বা খাদ্য কি রয়েছে? তবে এমন রোগী রয়েছে, যারা প্রেসক্রিপশন না পেলে খুশী হবে না। তাদেরকে প্রেসক্রিপশন দিতে হবে মানসিক কারণের জন্যে।

প্রশ্ন ঃ দেশোপযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থায় হাসপাতালের চাইতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এমবিবিএস-এর চেয়ে প্যারা-মেডিক্যালদের প্রয়োজন কি আপাতত বেশি নয়?

উত্তর ঃ গ্রামের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে আরো স্বাস্থ্যকেন্দ্র দরকার। আমাদের এমবিবিএস চিকিৎসক যেমন দরকার প্যারা-মেডিকেলও তেমন দরকার। একজন এমবিবিএস তৈরি করা সময় সাপেক্ষ বলে অধিকসংখ্যক প্যারা-মেডিকেল লোক তৈরি করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে যেসব রোগ হয়, যেমন কৃমি, আমাশয়, কলেরা, ইত্যাদি — এগুলোই কি এদেশের মেডিকেল পাঠক্রমে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত নয়?

উত্তর ঃ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এই যে এ রোগগুলোর উপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি এখানে। আমাদের দেশের শিক্ষা পাঠক্রমে দেশের সাধারণ রোগ-ব্যাধিই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।

দৈনিক বাংলা ৭-৫-৭৬ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত।

আজকের শিশু

বর্তমানে সারা দুনিয়াতে শিশুর সংখ্যা হলো দেড়শত কোটি। আর তার শতকরা ৮০ জনেরও বেশি বাস করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

গড় হিসেবে দেখা গেছে, প্রতি হাজারে ৮৩ জন শিশু জন্মের প্রথম বছরেই মারা যায়। আরো সহজ করে বলা যায়, জন্মের এক বছরের মধ্যে মারা যায় এই রকম শিশুর সংখ্যা হলো প্রতি ১২ জনের মধ্যে একজন। শিশু মৃত্যুর এই হার হচ্ছে উন্নত দেশের তুলনায় ১০ হতে ২০ গুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সুইডেনে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮ জন অথচ অনেক উন্নয়নশীল দেশে এই সংখ্যা ২০০ পর্যন্ত হয়।

গত বছর (১৯৭৮) আনুমানিক ১২ কোটি ২০ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ শিশু জন্মের প্রথম বছরেই মারা গেছে। এর মধ্যে শতকরা ৮০ জনেরও বেশি শিশুর বাসভূমি হচ্ছে এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশে।

কোন নির্দিষ্ট দেশে শিশুদের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ প্রগতি শিশুমৃত্যুর হার দেখে অনেক পরিমাণে নির্ণয় করা যায়।

এই ব্যাপকহারে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ প্রতিকূল পরিবেশ। জন্মের পর প্রথম কয়েকমাসে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় প্রতিপালনের ফলেই অনেক সময় শিশুদের মৃত্যু হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছয়টি প্রধান রোগ মৃত্যুর জন্য দায়ী। এর মধ্যে হাম, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া এবং টিটেনাস প্রধান। অথচ এই সমস্ত রোগ উন্নত দেশে এখন নেই বললেই চলে। শিশুদের অন্যান্য মারাত্মক রোগের মধ্যে রয়েছে পোলিও এবং যক্ষ্মা।

প্রতি বছর অন্তত ২ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু পৃথিবীতে জন্ম নেয় যাদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। এর মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষই জন্ম নেয় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ১৪৯ জনের মত। গত বছর অক্টোবরে ম্যানিলা সম্মেলনের রিপোর্টে জানা যায়, এই অঞ্চলে প্রতি হাজারে ১৮২ জন শিশু জন্মের প্রথম বছরেই মারা যায়। সুতরাং এই অঞ্চলের মধ্যেও বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার সর্বোচ্চ। ডিপথেরিয়া, হাম, হুপিং কাশি এবং যক্ষ্মা শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ হলেও পোলিও তিন বছরের কম বয়সের শতকরা একজন শিশুকে পঙ্গু করে দেয়। শিশুদের স্বল্প ওজনের অন্যতম কারণ হল মায়ের পুষ্টির অভাব ও

ধূমপান (বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মহিলারা ধূমপান করেন)। বাংলাদেশে ঘন ঘন শিশুজন্মও একটি পরিচিত ঘটনা।

এই সমস্ত সমস্যার মুখেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একজন সদস্য হিসেবে বাংলাদেশেও সংস্থার শ্লোগান "২০০০ সালে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য" কার্যকর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উপরন্তু ১৯৭৯ সালকে বিশ্ব শিশুবর্ষ হিসেবে উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবার স্বাস্থ্য দিবসের শ্লোগান হচ্ছে "সুস্থ্য শিশুই ভবিষ্যতের চাবিকাঠি"। এখন এই আহ্বান কার্যকর করার জন্য উচ্চতম হতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সকলের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

শিশুদের এমন অনেক রোগ আছে যার প্রতিরোধের ব্যবস্থা পূর্বেই নেয়া সম্ভব। এভাবেও আমরা স্বাস্থ্যবান শিশু গড়ে তুলতে পারি।

অবশ্য একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোন স্তরেই এখন পর্যন্ত কোনকিছুই করা হয় নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই ক্ষেত্রে আত্মসন্তুষ্টি লাভেরও কোন কারণ নাই।

একটি উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক। আমি মনে করি শিশুদের নিরোগীকরণ সহজতম না হলেও একটি সহজ কাজ। সহজেই সকল শিশুর জন্য এর পথ উন্মুক্ত রাখা সম্ভব। অথচ দেখা যায় সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধের অভাব কিংবা অপ্রতুলতার কারণেই তা সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে ডিপিটি কিংবা পোলিওর টিকার কথা ধরা যায়। এই ঘাটতি দূর করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পথ বের করতে হবে।

মনে রাখা দরকার এই দায়িত্ব সরকার এককভাবে সম্পাদন করতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট সকলকেই এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। কম লাভজনক হলেও ঔষুধ আমদানীকারকদের এই সমস্ত প্রতিরোধমূলক ঔষুধ আমদানী করতে হবে। কোন রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে তার আশু নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পুষ্টি এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর জোর দিয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার কাজকে বিস্তৃত করা দরকার। কারণ এটা সুস্থ মা ও সুস্থ শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর সুস্থ মা ও শিশুই গড়ে তুলতে পারে আগামী দিনের সুস্থ মানুষ, সুস্থ জাতি।

শিক্ষিত ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং দেশীয় ডাক্তার, সকলের মিলিত জনশক্তিকেই এই কাজে নিয়োগ করতে হবে। আধুনিক ডাক্তারদের কারো কারো রোগে বেদনাবোধহীনতা এবং সমাজের সুবিধাভোগী স্তরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টির প্রবণতাকে নির্মূল করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়গুলো সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোর দায়িত্ব হল উন্নয়নশীল সকল দেশের

সম্পদের সমবিতরণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডঃ মাহলারের ভাষায়, "এটা বুঝা দরকার যে সনাতন পদ্ধতিতে আজকের শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে স্বাস্থ্য রক্ষার সম্পদগুলোর সমবণ্টন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদের বিতরণ, দেশীয় ওষুধের ও বিভিন্ন স্তরের চিকিৎসকের সৃষ্টিশীল ব্যবহার। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন এবং জাতিসমূহের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ।"

একটি জাতি হিসেবে আসুন আমরা আমাদের সম্পদকে কাজে লাগাই এবং আশা করি উন্নত দেশগুলোও তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে "২০০০ সালে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য" আমাদেরও প্রতিজ্ঞা — তা আমাদের প্রমাণ করতে হবে। আর আজকের শিশুদের স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আমরা এই প্রতিজ্ঞারক্ষায় ব্যর্থ হব। আসুন, আমরা সবাই মিলে ভবিষ্যতের চাবিকাঠি আজকের শিশুদের স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলি।

দৈনিক সংবাদ ১০-৪-১৯৭৯ইং সংখ্যায় প্রকাশিত।

পরীক্ষানীতি

চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষানীতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করতে আমাকে বলা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে মেডিক্যাল শিক্ষার যে বিভিন্ন দিক রয়েছে সেগুলোর মধ্যে পরীক্ষানীতি ও পদ্ধতিই হ'লো সর্বাধিক বিতর্কিত এবং অপ্রিয় হ'লেও সত্য, সর্বাধিক কলুষিত। নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্ন মূল্যায়ন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে, নতুন নতুন ব্যবস্থাও চালু হয়েছে, কিন্তু কার্যকর কোন সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি।

সোজা কথায়, পরীক্ষার অর্থ হ'লো একটি শিক্ষাবর্ষ শেষে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিক্ষার মূল্যায়ন ও মান নিরূপণ ; অন্য কথায়, শিক্ষার মান নির্ণয়ের এটি একটি মাপকাঠি। আজকে প্রশ্ন হলো — ৪/৫ বছর শিক্ষা গ্রহণের পর পরীক্ষার যে পদ্ধতি এখন প্রচলিত রয়েছে সেটি যথার্থ কি না, যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মান নির্ণয় করা হয় সেটি সঠিক কি না। বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় সময়ের স্বল্প পরিসরে হঠাৎ-জিজ্ঞাসা-করা প্রশ্নের উত্তরের মূল্যায়ন ক'রে মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অনেক সময় এমনও হয় যে একজন পরীক্ষার্থী কোন সিস্টেমের ওপর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয় ; সেই সিস্টেম সম্বন্ধে হয়তো তার গভীর পড়াশুনা নেই, অথচ নিছক ভাগ্যের জোরে সেটি একটি সোজা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং সে-ও ভালো উত্তর দিতে সমর্থ হয়। এছাড়া পরীক্ষা ভালো বা খারাপ হওয়ার অন্যান্য দিকও রয়েছে। পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা, চেহারা, চলন-বলন, সালাম-আদাব ও কুশল সম্ভাষণ, বসার ভঙ্গী, হাসি সব কিছুর সার্বিক বিবেচনায় পরীক্ষার্থী নম্বর পেয়ে থাকে। এছাড়া পরীক্ষকের মানসিকতা ও তৎকালীন মানসিক অবস্থাও পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা ভালো খারাপ করার নির্ণায়ক।

বর্তমান পরীক্ষা নীতিতে যে দুর্নীতি চলছে, এটা প্রায় স্বীকৃত সত্য। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন ও উত্তর রচনামূলক **(essay type),** এক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষকের ধৈর্য থাকে না দীর্ঘ উত্তরগুলো পড়ার, যার ফলে মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ওপর ভিত্তি করেই লিখিত পরীক্ষায় নম্বর দেয়া হয়। এছাড়া লিখিত পরীক্ষায় নকল করলে সেই খাতায় নম্বর কমানোও পরীক্ষকের আয়ত্তের বাইরে। এমনও শুনা যায়, হাসপাতালে রোগ নির্ণয় বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার আগে অনেক সময় রোগী সম্বন্ধে বলে দেয়া হয়।

এই পরীক্ষানীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে প্রচলিত রচনামূলক লিখিত পরীক্ষার গুটিকয়েক প্রশ্নের মাধ্যমে একজন ছাত্রের মান নির্ণয় করা

অসম্ভব। সুতরাং রচনামূলক (essay type) প্রশ্নের বদলে বস্তুনিষ্ঠ (objective type) প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা শুদ্ধ উত্তর বাছাইকরণ (multiple choice) প্রশ্নপত্র প্রবর্তন করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে প্রকৃত ধীমান ছাত্ররাই স্বল্পসময়ে ক্ষিপ্রতার সাথে সমস্যা সমাধানে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। অনেকগুলো প্রশ্ন থাকলে একদিকে যেমন পরীক্ষায় নকল করার সুযোগ থাকবে না, অন্যদিকে পরীক্ষকের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে পক্ষপাত বা ভুলের সুযোগও থাকে না। এমনকি পরীক্ষকের ব্যক্তিগত আক্রোশও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা বাড়বে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জন্যে নির্ধারিত নম্বর সে অনুপাতে কম থাকবে।

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার আর একটি দিক হলো — বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পরীক্ষার বিভিন্ন মান (standard)। এতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের মধ্যে একটি অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে। আজ এমন একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে যাতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে একটি সুষম মান বজায় থাকে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক মেডিকেল কলেজ থেকে শিক্ষক-প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরীক্ষক প্যানেল গঠন করতে হবে, প্যানেলের সদস্যরা উত্তরসহ প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন, প্রশ্নগুলো প্রশ্নব্যাংকে জমা থাকবে, সারা দেশে একই দিনে একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা হবে, সব কলেজের পরীক্ষার ফলাফলও একই সাথে প্রকাশিত হবে।

মৌখিক পরীক্ষায় পূর্ব-নির্ধারিত প্রশ্ন লিখিত থাকবে। অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্য থেকে পরীক্ষার্থী বা পরীক্ষক লটারীর মাধ্যমে প্রশ্ন নির্বাচন করবেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের বিবেচনায় পরীক্ষকমণ্ডলীর প্রত্যেক পরীক্ষক আলাদাভাবে নম্বর দেবেন, এই নম্বরগুলো যোগ ক'রে গড় নিতে হবে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পক্ষপাতের সুযোগ থাকবে না। ৯-১২ নম্বর সিস্টেম এ ব্যবস্থায় চালু করা যেতে পারে। যেমন নিম্নরূপ ঃ

৯ পেলে অনুত্তীর্ণ।
১০ পেলে বিবেচনা করা যেতে পারে।
১১ পেলে উত্তীর্ণ।
১২ পেলে খুব ভালো।

ক্লিনিক্যাল বিষয়ে বিশেষ রেগে নির্ণয়ে পরীক্ষার্থীর সার্বিক জ্ঞান ও উপলব্ধিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোন্ ধরনের মারমার (murmur) ? — এ ধরনের বিষয়ের ওপর অহেতুক গুরুত্ব আরোপ বর্জনীয়। বিষয়ের মৌলিক দিকগুলো সম্বন্ধে ভুল উত্তর করলেও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে।

পরীক্ষার মান নির্ণয়ের মানও উন্নত করতে হবে। নির্ধারিত নম্বর সিস্টেমে উত্তীর্ণ হওয়ার মান শতকরা ১০০ নম্বরেরই কাছাকাছি হওয়া উচিত ; প্রচলিত

ব্যবস্থার ১০০ নম্বরে ৪০ বা ৫০ নয়। এর অর্থ হলো, একজন মেডিক্যাল শিক্ষার্থী যখন চিকিৎসক হয়ে বেরুবেন তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মোটামুটি সব বিষয়ে তাঁর একটি সামগ্রিক জ্ঞান থাকতে হবে যাতে তিনি সব রোগেরই মোটামুটি চিকিৎসা করতে সক্ষম হবেন। পরীক্ষকরা একজন শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ বলবেন এই চিন্তা করে যে, সেই শিক্ষার্থী তাঁর বিশেষ বিষয়ে মোটামুটি সার্বিক পারদর্শিতা অর্জন করেছে। সেই পারদর্শিতা অর্জনের মূল্যমান শতকরা ১০০ নম্বরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় ফেল করা শিক্ষক বা পরীক্ষকের অগৌরবের বিষয়। এজন্যে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই দায়ী। তাই সবার আগে প্রয়োজন — প্রচলিত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ পরিস্থিতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন। একজন ছাত্রকে তৈরি করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হবে শিক্ষকের। তিনি যেমন সততার সাথে শিক্ষা দান করবেন তেমনি ছাত্রদেরকে কড়া শাসনও করবেন। কথায় বলে, "শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে"। ছাত্র-ছাত্রীদের মান যেভাবে নির্ণয় করা হয় অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের দ্বারা এবং অন্য সহকর্মী শিক্ষকদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে শিক্ষকের মানও যাচাই করা প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে একজন শিক্ষকের মান যাচাই করতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে পরীক্ষার মানও উন্নত করা দরকার। পরীক্ষার মান উন্নত করতে হ'লে পরীক্ষকের মান উন্নত করতে হবে। ছাত্র ও অন্যান্য শিক্ষকের মাধ্যমে পরীক্ষকের মূল্যমান যাচাই করা উচিত। অনুপযুক্ত শিক্ষককে শিক্ষকতা থেকে নিস্কৃতি দিতে হবে। পরীক্ষার উন্নতিকল্পে গোটা শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন সময়ে বার বার পরীক্ষা নিতে হবে। এর সামগ্রিক বিবেচনায় সমন্বিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রের মান নির্ধারণ করতে হবে। নকল বন্ধ করতে হলে চাই বৃহৎ পরিকল্পনা — চাই সমাজের সংস্কার — মূল্যবোধের পরিবর্তন।

বাড়াতে হবে পরীক্ষার মান, চিকিৎসার মান, সর্বোপরি শিক্ষকের মান। ভাল শিক্ষকের জন্যে প্রয়োজন শিক্ষকের সম্মান বৃদ্ধি ও চাহিদা সৃষ্টি করা ; তাহলেই সামগ্রিক অর্থে শিক্ষা উন্নত হবে। যে সমাজে শিক্ষক তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা পান না, জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে নিমন্ত্রিত হওয়ার অধিকার রাখেন না, আর নিমন্ত্রিত হলেও সর্বনিম্নস্তরভুক্ত থাকেন, মনে হয় যেন নিমন্ত্রণের নামে তাঁর প্রতি অনুকম্পাই প্রদর্শন করা হয়েছে ; সরকারী তথাকথিত প্রোটোকল তালিকায় যেখানে তিনি কোন স্থানই পান না, যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য সেটুকু থেকেও হন বঞ্চিত, সেই সমাজে — সেই পরিবেশে শিক্ষক অবহেলা ও অনাদরে এক সীমাহীন হীনমন্যতার শিকার হন। যেটুকু আত্মসম্মান তাঁর আছে সেটুকুও হারানোর ভয়ে তিনি হন সংকুচিত, শংকিত। এরকম একজন অবহেলিত ব্যক্তির কাছ থেকে সমাজ

কতোটুকু আশা করতে পারে? অথচ কি আশ্চর্য! বহির্বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখি, সমাজে শিক্ষকের স্থান হ'লো সর্বোচ্চে। আজ শিক্ষকদের মধ্যে যে দুর্নীতি বিরাজ করছে বলে শোনা যায়, এ অবস্থাটি হয়তো এই সামাজিক অবহেলা ও বঞ্চনা থেকে পলায়নপরতার চেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়েছে। সুতরাং দুর্নীতির মূল কারণ অনুসন্ধান করে এর সমাধানের চেষ্টা না করলে এ অবস্থা ক্রমশ:ই আরও অবনতির দিকে যাবে।

তাই শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে প্রথমেই চাই শিক্ষকের প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতির নিশ্চয়তা বিধান। শিক্ষাঅঙ্গনে আজ যে নৈরাজ্য ও হতাশা বিরাজ করছে সেগুলো তখন হবে অপসারিত। আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় পর্যায়ে সমাজের কর্তাব্যক্তিদের মনে এ বোধোদয় ঘটবে অচিরেই, ঘটবে চিন্তার মুক্তি ও বুদ্ধির মুক্তি। শিক্ষাঙ্গন সে আলোকেই হবে উদ্ভাসিত। সেই নতুন আলোর ভোরের প্রত্যাশায় আমরা রইলাম।

প্রশ্নোত্তর

এক ঃ পরীক্ষানীতি পরিবর্তনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা সত্ত্বেও যে সমস্ত বাধার কারণে এর বাস্তবায়ন আজও সম্ভবপর হয়নি সেগুলো কি কি?

০ সদিচ্ছার অভাব এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বৃহৎ আকারে এ সম্বন্ধে চিন্তা–ভাবনার অনুপস্থিতি। এ পর্যন্ত কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের বিচ্ছিন্ন চিন্তাই এ ব্যাপারে স্থান পেয়েছে। আপনাদের আজকের এ সিম্পোজিয়ামের মতো আরো প্রচেষ্টা অন্যেরা গ্রহণ করলে এ বিষয়ে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যেতে পারে।

দুই ঃ পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন কি এম.বি.বি.এস–এর সঙ্গে সঙ্গে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্যেও প্রয়োজন নয়? আর যদি তা হয় তবে সেটি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়?

০ অবশ্যই। আগেই উল্লেখ করেছি।

তিন ঃ অনেক সময়, বিশেষতঃ কোন ক্লিনিক্যাল বিষয়ের পরীক্ষায়, কোন একজন শিক্ষক হয়তো তাঁর পছন্দমাফিক কোন উত্তর ছাত্রদের কাছ থেকে আশা করেন, অথচ সে সম্বন্ধে অন্য এক অধ্যাপক হয়তো ভিন্ন মত পোষণ ক'রে থাকেন। তাই এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষামান কি আশা করা যায়, যার ফলে অধ্যাপকদের পক্ষে মতৈক্যে পৌছুনো সম্ভব হবে?

০ এই সমস্যার সমাধানের উপায়ও আমি আমার বক্তব্যে উল্লেখ করেছি। পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নাবলী থেকে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচন এবং পরীক্ষকমণ্ডলীর

প্রত্যেকের দেয়া নম্বরের গড়ের ওপর ভিত্তি ক'রে ফলাফল নির্ধারণ করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব। বস্তুনিষ্ঠ (objective) প্রশ্নোত্তর এবং শুদ্ধ উত্তর বাছাইকরণ (multiple choice) পরীক্ষায় এ ধরনের সমস্যা উদ্ভবের সুযোগ কম।

চার ঃ বর্তমানে পরীক্ষার্থীদের ব্যাপক হারে অকৃতকার্যতার জন্যে প্রধানত দায়ী কে বা কি কি পরিস্থিতি?

o শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি।

পাঁচ ঃ প্রি-ক্লিনিক্যাল পর্বে Gray's Anatomy না পড়বার উপদেশ দেয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষকরা উত্তর আশা করেন এই বইটি অনুযায়ী। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে?

o বইটির প্রচলন এদেশে বন্ধ করে দিয়ে। বিশ্বের কোথাও একে text book হিসাবে পড়ানো হয় বলে আমার জানা নেই।

ছয় ঃ ছাত্রদের অধিক পড়াশুনার মাঝে ব্যস্ত রাখার জন্যে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা যায় না?

o এটি পরীক্ষা-সাপেক্ষ। চালু করার আগে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে।

সাত ঃ পরিকল্পিত নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি কতো দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব?

o সদিচ্ছা ও সৎ উদ্যোগ থাকলে অবিলম্বে সম্ভব।

আট ঃ শিক্ষণ পদ্ধতির নিম্নমানের জন্যে মূল কারণ হিসেবে কি ছাত্রাবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষকতার প্রতি অনীহাকে বিবেচনা করা যেতে পারে?

o এর অবদান অস্বীকার করা যায় না। এই অনীহার কারণ অনুসন্ধান করে সমাধানের উপায় খুঁজতে হবে।

নয় ঃ (ক) আমাদের পরীক্ষায় কি বহুবিধ প্রশ্ন সম্বলিত একটি নতুন পদ্ধতি চালু করা যায় না যেখানে বর্তমান নম্বর পদ্ধতির পরিবর্তে বিভিন্ন মানের দ্বারা ছাত্রদের যাচাই করা হবে?

o বস্তুনিষ্ঠ (objective) ও শুদ্ধ উত্তর বাছাইকরণ (multiple choice) প্রশ্নাবলী সম্বলিত পরীক্ষার কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। বর্তমান নম্বর পদ্ধতির পরিবর্তে ৯-১২ নম্বর পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

(খ) এছাড়া ছাত্রদের মেধার সঠিক নিরূপণের জন্যে কি আরও বেশি পরীক্ষক নিয়োগ করা যায় না যেখানে তাঁদের প্রদত্ত বিভিন্ন মানের গড়ই হবে মান-নির্ণায়ক?

o অবশ্যই।

দশ ঃ আপনার বক্তব্যের সাথে আমরা সকলেই একমত এবং আশান্বিত, তাই আমরা জানতে আগ্রহী, আপনার মতো শিক্ষকরা যখন এতোদূর অগ্রসর হয়ে এ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করছেন তখন কেন আমাদের পরীক্ষানীতিতে পরিবর্তন আসছে না? প্রতিবন্ধকতা কোথায়?

০ এতকাল যা হয়েছে, তা' হলো এ সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন চিন্তা। এই চিন্তা-ভাবনাকে একত্রিত করে সমন্বিত করে সৎ উদ্যোগ নিলে প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়।

এগার ঃ অনেকে মনে করেন চিকিৎসক ও শিক্ষকদের পেশাগত মান ও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত না হওয়ার পেছনে কারণগুলোর মধ্যে প্রধান দু'টি হলো ঃ

(ক) ছাত্রজীবন থেকে ভবিষ্যতের শিক্ষক হিসাবে গড়ে ওঠার মানসিকতা ও প্রক্রিয়ার অভাব (খ) 'প্রাইভেট প্র্যাকটিস' করার দরুণ শিক্ষকতায় মনোনিবেশের ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা এবং শিক্ষকতার জন্যে প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু মানসিকতার অভাব। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

০ ভালো শিক্ষক পেতে হ'লে শিক্ষকের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি এবং সম্ভাবনা প্রশস্তকরণ পূর্বশর্ত। শিক্ষক সম্বন্ধে সহকর্মী শিক্ষার্থীদেরও মতামত গ্রাহ্য করার কথা আমি আমার বক্তব্যে বলেছি।

আলোচনা সিম্পোজিয়াম ৬-৩-১৯৮০ ইং।

ডাক্তার, আপনি নিজে কেমন আছেন?

সুখ ! চন্দনের মতো সুবাসিত, নাকি ভোরের শিউলির মতো স্নিগ্ধ? একটা ঘর, একজন মনের মানুষ, সেইসাথে নিঃশব্দ ভালোবাসায় প্রবাহিত জীবনে একথাল সোনার মতো একটা শিশু — এসব কিছুতেই তো মানুষের সুখ। কিন্তু এই সুখানুভূতিতে বাধা দিচ্ছে কে?

'শরীর মহাশয়'। সর্দি, জ্বর পেটেব্যথা, অরুচি, বুকে-ব্যথা। শরীর খারাপ, তাই মনও ভালো নেই। সুখ নেই, শান্তি নেই। লক্ষ্য তখন ডাক্তারের চেম্বার। কিন্তু আপনার আমার সবার মতো ডাক্তার সাহেবেরও তো রয়েছে ঘর, সংসার, সন্তান। কোনোদিন কি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'ডাক্তার সাহেব, কেমন আছেন?' তা হলে আসুন না, তাঁদের কাছে এ প্রশ্নটাই এবার আমরা রাখি।

একজন তরুণ ডাক্তারী পাস করে উদ্দীপনাময় নতুন জীবনের আশ্বাসে বিপুল উৎসাহে কাজে নামে। প্রথমেই এক বছর মেয়াদী ইন্টার্নিশীপে। এ সময়ে ডাক্তারেরা হাতে-কলমে শিক্ষা নেন। এক কথায় এ সময়টাই তাঁকে ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। অত্যন্ত মূলবান সময় এটা। একে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ৬ মাস বিভিন্ন বিভাগে এবং পরবর্তী ৬ মাস একটি নির্দিষ্ট বিভাগে (যে বিভাগে তিনি কাজ করতে ইচ্ছুক) কাজ করতে হয়। এরপর পোস্টিং-এর পালা। সরকার আজকাল ডাক্তারদের গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে সুচিকিৎসার পরিকল্পনা নিয়েছে। ইন্টার্নিশীপের পর ডাক্তাররা এ্যাসিসট্যান্ট সার্জন হিসেবে কাজ শুরু করেন। এছাড়া পোস্ট-গ্রাজুয়েট পড়ার সুবিধেও রয়েছে। বাংলাদেশের ৮টি মেডিকেল কলেজে যে প্রায় ১২০০ ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর ডাক্তারিতে ভর্তি হয়, তাদের প্রায় সবারই উচ্চশিক্ষা লাভের ইচ্ছে থাকে। কিন্তু প্রতিবছর পোস্ট-গ্রাজুয়েট কলেজের বিভিন্ন বিভাগে মাত্র ৫০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে। প্রথমে ৬ মাসের প্রথম পর্ব শেষ করার পর দু'বছরের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডাক্তাররা এ্যাসোসিয়েট কিংবা অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, বেসরকারী ডাক্তারদেরও এখানে পড়বার সুযোগ রয়েছে।

বেশ কজন ডাক্তারের সাথে আলাপ আলোচনা ক'রে তাদের কিছু-কিছু সমস্যার কথা এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশাসনিক জটিলতা

মেডিকেল কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল, সার্টিফিকেট ইত্যাদির জন্য ভার্সিটি এলাকায় তাদের আসতেই হয়। অথচ এসব ব্যাপারে পৃথিবীর অন্য মেডিকেল কলেজগুলোর আলাদা ফ্যাকাল্টি রয়েছে। এছাড়া প্রতি মাসের বেতন তোলার সময়ও ডাক্তারদের কমবেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

ওষুদের অপর্যাপ্ততা

প্রায় প্রত্যেক ডাক্তার এবং প্রফেসরের মতে হাসপাতালে ওষুধের অভাব রয়েছে। মাঝে-মাঝে বিভিন্ন কারণে এ সমস্যাটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ না করতে পারলে ভীষণ বিপাকে পড়তে হয় এবং তখন লজ্জা ও দুঃখের সীমা থাকেনা।

সামাজিকতা

একজন ডাক্তারের সামাজিক জীবন অন্যদের থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এ পেশা তাঁকে প্রায় সারাদিনের জন্যই ব্যস্ত রাখে। তাই স্বাভাবিক সামাজিক জীবন কিছুটা ব্যাহত হয়। তবে বেশির ভাগ ডাক্তারের ভাষায় সেবাধর্ম হিসেবে ডাক্তারি-পেশায় সরাসরি মানুষের দুঃখ-কষ্টের ভাগ নেয়া যায়, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায়। এতে করে পাওয়া যায় অনাবিল আনন্দ। তাই কোনো ডাক্তারের মুখেই শোনা যায় না 'জীবনটা বড্ড একঘেঁয়ে।'

সংসার জীবন

ডাক্তার পুরুষ কিংবা মহিলা যে-ই হোক না কেন, সবারই আছে ব্যক্তিগত জীবন, আর সেই সাথে রয়েছে সংসার এবং সন্তান। ডাক্তারদের মতে, তাদের পরিবারের সদস্যরা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। যে সংসারের কর্তা ডাক্তার, সে সংসারে স্ত্রীকে নিতে হয় সর্বময় কর্তৃত্ব। সংসারের খুঁটিনাটি প্রায় সবকিছু তাঁকেই পরিচালনা করতে হয়। মহিলা ডাক্তারদের এ ক্ষেত্রে হতে হয় আরো অনেক বেশি পারদর্শিনী। ডাক্তারি পেশার পাশাপাশি তাঁকে সংসার ধর্মও পালন করে যেতে হয়। বেশ ক'জন মহিলা ডাক্তারের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তাঁরা জানিয়েছেন যে, তাঁদের সবচেয়ে বড় দুঃখ তাঁরা তাদের সন্তানদের ঠিকমতো সঙ্গ দিতে পারেননা। তবে নিজের জন্য যেটুকু সময় তাঁরা পান, তার সবটুকুই সংসারের

পেছনে ব্যয় করেন এবং সংসারটা অন্য দশটা সংসার–এর মতো সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। কেননা পেশা কিংবা সংসার কোনোটাকেই তাঁরা ছোট করে দেখেন না।

'হে ডাক্তার, আপনি কেমন আছেন?' এই প্রশ্ন জানার জন্য আমরা বেশ কজন ডাক্তারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিচে পত্রস্থ করা হলো।

প্রফেসর নুরুল ইসলাম

প্রঃ কেমন আছেন?

উঃ মোটামুটি ভালোই।

প্রঃ আপনি ডাক্তার না হয়ে অন্য কিছু হলে কেমন হতো?

উঃ কেমন হতো জানি না। ভালোও হতে পারতো, আবার খারাপও হতে পারতো। তবে ডাক্তারী পেশায় রোগীকে সুস্থ করে তোলাতে যে তৃপ্তি, যে আনন্দ তা অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না।

প্রঃ ডাক্তার হিসেবে আপনি কি সুখী? কেন?

উঃ আমি তো নিজেকে সুখীই মনে করি। কেননা একজন অসুস্থ লোককে সুস্থ করে তোলার পর যে আনন্দ পাওয়া যায় তা টাকা–পয়সা দিয়ে কেনার নয়। সেই সাথে রয়েছে রোগী এবং তার আত্মীয়–স্বজনদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা করার পরও যদি রোগী ভালো না হয় তবে সেক্ষেত্রে নিয়তির অমোঘ নির্দেশকে বরণ না করে উপায় নেই। কিন্তু এতে যে ডাক্তারের প্রতি তাদের ভক্তি কিংবা শ্রদ্ধাবোধ যে এতোটুকুও কমে যায় না, তার প্রমাণও আমি বেশ কবার পেয়েছি। এব্যাপারে একটা ঘটনার কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। একবার আমার চিকিৎসাধীন এক রোগী মারা যায়। অথচ এর পরে সে রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলো এবং তাতে জানিয়েছিলো যে, আমার যতোটুকু করার ছিলো ততোটুকু আমি করেছি আর তাঁরা এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছেন যে, তাঁদেরও যতোটুকু করা প্রয়োজন ছিলো তারও ত্রুটি তাঁরা করেননি। আমার মনে হয় অসীম শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতাবোধের কারণেই তাঁরা অতোবড় শোকের মধ্যেও আমাকে ধন্যবাদ জানাতে পেরেছিলেন। এ রকম ভক্তি এবং শ্রদ্ধা লাভের সুযোগ ডাক্তারদের অনেক রয়েছে।

প্রঃ আপনার অসুখ হলে কি করেন?

উঃ ছোটখাটো অসুখে আমি ওষুধ খাই না। কারণ প্রত্যেক ওষুধেরই একটা খারাপ ফল আছে। তবে অসুখের মাত্রাটা একটু বেশি হলে বন্ধু ডাক্তারদের,

যাঁদের ওপর আমার বিশ্বাস রয়েছে তাঁদের ডেকে থাকি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের দেয়া ওষুধগুলোর ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ কটাই আমি বেছে নেই (যদিও তাঁরা সৎ উদ্দেশ্যেই সেসব ওষুধ দিয়ে থাকেন)।

প্রঃ আপনার স্ত্রী কিংবা সন্তানেরা অসুস্থ হলে আপনি কি করেন?

উঃ আমি নিজেই চিকিৎসার ভার নেই। ছোটখাটো অসুখে সাধারণত ওষুধ দেই না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের অনেক ডাক্তারেরই বেশি ওষুধ দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। কদিন আগে আমি বিদেশে থাকাকালীন সময়ে আমার মেয়েটার হঠাৎ খুব জ্বর হলো। ডাক্তাররা এলেন। প্রতিদিন দামী দামী ওষুধ দিলেন, অথচ জ্বর বেড়েই চললো। আমি ফিরে এসে সমস্ত ওষুধ বন্ধ করে দিলাম। জ্বর নেমে গেলো।

প্রঃ আপনার স্ত্রী কি করেন? চাকুরিজীবী স্ত্রী সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

উঃ ঘর-সংসার করেন। আমার স্ত্রী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রফেসর ছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পর সংসারের স্বার্থে নিজেই চাকুরি ছেড়ে দিলেন। তবে আমি মনে করি এটাও একটা চাকুরি। তিনি সন্তানদের লালন-পালন এবং লেখাপড়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। আমার মতে, এতে সমাজেরই সেবা করা হচ্ছে। তাই নয় কি? সংসার তো সমাজেরই অঙ্গ।

প্রঃ আপনার সন্তানদের প্রতি আপনার দায়িত্ব পালন করতে পারেন কি?

উঃ আমি বেশ ব্যস্ত থাকি সত্যি। তবে আমি বিশ্বাস করি যে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। সন্তানদের প্রতি নজর দিতে চাইলেই দেয়া যায়। যেমন আমি তিনবেলাই পরিবারের সবার সাথে খাওয়া-দাওয়া করি। এ ছাড়া অন্য যে কোনো সময় সুযোগ পেলেই তাদের সঙ্গ দেয়ার চেষ্টা করি।

প্রঃ চাকুরি জীবনের অনেকটা সময়ই তো আপনি শিক্ষকতা করেছেন। ডাক্তারি পেশা কিংবা শিক্ষকতা কোনটাকে উপরে স্থান দেন?

উঃ অবশ্যই শিক্ষকতাকে। তবে পেশা ছাড়া শিক্ষকতা হয় না। শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের ডাক্তারি শেখানো হয়। তাদের শেখালে নিজেরও শেখা হয়। আমি তাই আজও কলেজ অব ফিজিসিয়ানে গিয়ে পড়ি, আর প্রতি শনিবার পোস্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের তিন ঘণ্টা পড়িয়ে থাকি।

প্রঃ প্রথম যেদিন আপনি মেডিকেল কলেজে ঢুকেছিলেন সেদিন, আর যেদিন পাস করে বেরিয়ে ছিলেন সেদিন এবং আজকের ভাবনার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উঃ মেডিকেল কলেজের প্রথম দিনের একটা ঘটনার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। ক্লাশ শেষ করে ফিরছি। সাথে রয়েছে আমারই এক বন্ধু, ডাঃ ওমর

আহমদ জামাল (তিনি এখন লন্ডনে আছেন)। মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসার মুখে হঠাৎ একটা গাড়ি তীব্র বেগে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেলো। বন্ধুটি তখন বলে উঠেছিলো, 'জানিস, আমরা ডাক্তার হ'লে এসব গাড়িওয়ালারা আমাদের রোগী হয়ে আসবে।

এরপর যেদিন পাস করে বেরুলাম সেদিন ভেবেছি, সার্জন হবো নাকি ফিজিসিয়ান হবো। বন্ধুরা বলতো, আমি কেন সাইকেল চালাতে শিখিনি। উত্তরে বলতাম, 'সাইকেল নয়, আমি গাড়ি চালাবো। এও মনে পড়ে, একদিন আমারই এক আত্মীয় বড় একজন ডাক্তারের সাথে তুলনা করে বলেছিলেন আমি কেন চেম্বারে বসি না। উত্তরে সেদিন বলেছিলাম, 'সে ডাক্তারের চেয়েও যেদিন বড় ডাক্তার হবো সেদিন সম্মান নিয়ে প্রাক্‌টিস করবো।'

আজও আমার অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমি চাই আমার পেশা এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, এ দুটোর সবটাই কাজে লাগে এমন কিছু যেন আমি করতে পারি। আমার অগণিত শুভাকাঙ্ক্ষীর অকৃত্রিম শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা একদিন না একদিন আমাকে সে সুযোগ এনে দেবে — একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

প্রঃ সংসার, সামাজিকতা এবং ডাক্তারি এ তিনটা একসাথে সুষ্ঠুভাবে পালন করা কি সম্ভব?

উঃ আমি মনে করি সম্ভব। তবে মনে করুন, একটা সামাজিক অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিন্তু সেখানে যাবার মুহূর্তে একজন সিরিয়াস রোগী আমার কাছে আসলো। আমি অবশ্যই তখন সে রোগীকে প্রাধান্য দেবো। অনুষ্ঠানের আনন্দ সেখানে তুচ্ছ। কেননা ডাক্তারের ধর্মই 'সেবা'।

প্রঃ ডাক্তার হিসেবে আপনার দুঃখ কি?

উঃ যখন দেখি আমার কাছে আসা রোগীর কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। কেননা চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার আর্থিক সামর্থ্য রোগীর নেই। বেশকিছু ডাক্তার আছেন যাঁরা রোগীর চেয়ে টাকা পয়সাটাকেই বড় করে দেখেন। টাকার জন্য তাঁরা রোগীকে তার শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করতে বাধ্য করেন। এ ছাড়া আমাদেরই ভুল চিকিৎসার জন্য রোগীর রোগ যখন আওতার বাইরে চলে যায়, নিজেকে তখন ভীষণ অসহায় মনে হয়।

প্রঃ সাধারণ লোকের জন্য আপনাদের 'ফি' অত্যন্ত বেশি। তাই সাধারণ অসুখে তাঁরা আসতে পারেন না। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উঃ মরিচের দাম থেকে শুরু করে একজন উকিল কিংবা আর্কিটেক্ট–এর কথা ভাবুন, দেখবেন আমাদের 'ফি' অন্যদের তুলনায় বেশি নয়। এ ছাড়া আমরা যারা বিশেষজ্ঞ তাদের কাছে জটিল রোগের রোগীদের আসা উচিত। তবুও আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক ডাক্তারই দু'একজন রোগী বিনে পয়সায় দেখে থাকেন।

প্রঃ আপনার ডাক্তারী জীবনে সবচাইতে আনন্দায়ক ঘটনা কি?

উঃ যেদিন প্রথম ডাক্তার হয়ে বেরুলাম সেদিনই খবর পেলাম আমার মা টাইফয়েড–এ সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ শয্যাগত। ছুটে বাড়ি গেলাম এবং সাধ্যমত চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললাম। সেদিনটাই বোধহয় আমার ডাক্তারী জীবনের সবচাইতে আনন্দের দিন।

সাপ্তাহিক রোববার ৮–২–১৯৮১ ইং।

সুচিকিৎসা — জন্মগত অধিকার

"সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যগত মান ভোগ করা প্রতিটি মানব সন্তানের বুনিয়াদী অধিকার।" বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাংবিধানিক এই ধারায় যেসব সদস্যদেশ স্বাক্ষর দান করেছে সেসব দেশের প্রতিটি মানুষকে স্বাস্থ্য–সুবিধা প্রদানের নৈতিক বাধ্যবাধকতা সেই দেশের ওপর বর্তায়।

বাংলাদেশও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সদস্য দেশ। সুতরাং এ বাধ্যবাধকতা তার ওপরেও বর্তিয়েছে। এটাকে জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে যেন দুঃখের সাথে বলতে না হয় "সারা ইতিহাস জুড়ে কোন সময় গ্রাম্য জনসাধারণ যত্নের ছোঁয়া পায় নি, আজকের দিন গেলকালের সাথে আর একটি দিনের মত যোগ হয়েছে" (ডাব্লু এইচ ও ক্রনিকল ১৯৭২)। বাংলাদেশের বর্তমান স্বাস্থ্য অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রকৃত ছবি জানা যাবে।

বর্তমান স্বাস্থ্য অবস্থা

প্রায় দশ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশে জন্ম–মৃত্যুর হার যথাক্রমে ৩৩ ও ১৩ প্রতি হাজারে। হাজারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি শতকরা ২ ভাগ হয় তবে আগামী ২০ বছরে বর্তমান জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

নবজাতকের মৃত্যুর হারও পৃথিবীতে সর্বাধিক — প্রতি হাজারে ১৪০। অথচ উন্নয়নশীল দেশসমূহে মাত্র ৩০ জন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৪.৬ ভাগ অপুষ্টিতে এবং শতকরা ৮০ ভাগ শিশুই কৃমিতে ভুগছে। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিং কাশি, হাম এগুলো অতি পরিচিত সংক্রামক ব্যাধি। একমাত্র যক্ষ্মায় প্রতিবছর এক লাখ লোক মারা যায়।

কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরী (বর্তমান নাম ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়েরিয়াল ডিজিজ রিসার্চ)–এর সফল চিকিৎসা পদ্ধতি বের করার ফলে কলেরায় মৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবে জীবাণুমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবে এই রোগ এখনও নখর মেলে আছে।

পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুরা প্রধানত ডিপথেরিয়া, কলেরা, হুপিং কাশি, হাম ও অন্যান্য সংক্রামক রোগে মারা যাচ্ছে।

আমাদের দেশে হাসপাতালে সব ধরনের মিলিয়ে বেড সংখ্যা ১০,১১৮টি। তাও বেশির ভাগই শহরে অবস্থিত। বিছানা ও রোগীর অনুপাত ১ ঃ ৫৮৭৭।

দশ কোটি মানুষের জন্য সর্বমোট পাশ করা ডাক্তার প্রায় ৮০০০। এঁদের প্রায় শতকরা ৭০–৮০ জন শহরে থাকেন।

সারা দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সংখ্যা ১৪৩৪। দাই ও লেডি হেল্থ ভিজিটারের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৪৪ ও ৬৪৩।

প্যারা মেডিকেল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের বর্তমান সংখ্যা ঃ

স্যানিটারী ইন্সপেক্টর	৫৯৫
ডিসপেন্সার্স	১৯৬
ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান	১০৭
রেডিওথেরাপি টেকনিশিয়ান	৪
ফিজিওথেরাপী টেকনিশিয়ান	৭

বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষায়তন আছে ঃ

মেডিকেল কলেজ	৮
পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটিউট	১
বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট	১
সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫
লেডি হেল্থ ভিজিটর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩
প্যারা মেডিকেল ইন্সটিটিউট	১
পোস্ট–বেসিক কলেজ অব নার্সিং	১

১৯৬৪–৬৮ সালে প্রতি বছর ডাক্তার হয়ে বেরুত ২৪০ জন। স্বাধীনতা–পূর্বকালে মেডিকেল কলেজে ৬০০ জন ভর্তি করা হত। ডাক্তার ও জনসাধারণের আনুপাতিক হার ১ ঃ ১০০০০।

পোস্ট গ্রাজুয়েট উত্তীর্ণ ডাক্তার

স্নাতকোত্তর বিদ্যাপীঠে ভর্তির হার বেড়ে গেছে। প্রথমে বছরে ৪০ জন ছাত্র ভর্তি হতো। এখন এই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বিভিন্ন হাসপাতালে স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা হয়েছে। যেমন ঃ আই. ডি. সি. এইচ. সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে বক্ষব্যাধি ও অরথোপেডিক–এর ওপর ডিপ্লোমা। নিপসমে পাবলিক হেল্থ, কমিউনিটি মেডিসিন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেল্থ–এর ওপর ডিপ্লোমা ইত্যাদি। প্রয়োজন ও সরবরাহের মধ্যে কতখানি পার্থক্য তা সবার জানা। যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

ন্যাশনাল ডাক্তার

মুক্তিযুদ্ধের আগে দেশে ৪টা ন্যাশনাল মেডিকেল শিক্ষালয় ছিলো যেখানে এস. এস. সি পাশের পরে ৪ বছরের কোর্সে ডিপ্লোমা ডিগ্রী দেয়া হতো। এই লোকদেরকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হতোনা। সরকার ভাবলেন এই ব্যবস্থা চলতে দেয়া যায় না। কিছু লোক আবার ডিগ্রী না নিয়েই ন্যাশনাল পাশ ডাক্তার হিসেবে ডাক্তারি চালাচ্ছিল। মেডিকেল কাউন্সিলকে ঠিক অনুসন্ধান করে সত্যিকার ডিগ্রিধারীদেরকে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হলো।

এভাবে এ পর্যন্ত ১৫০০ রেজিস্টার্ড ডাক্তার আমাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্মী

ডাক্তার-রোগীর হার বর্তমানে ১ ঃ ১০০০ জন। এই স্বল্প সংখ্যক ডাক্তার নিয়ে আমাদের বিরাট বিস্ফোরিত জনসংখ্যার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অসম্ভব। শহরে ডাক্তারদের কেন্দ্রীভূত হবার প্রবণতার ফলে গ্রামের বিস্তর জনগণ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। কিছু কিছু নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে আগের ৮টি মেডিকেল কলেজও ঠিকভাবে চলতে পারছেনা। তাই এ সমস্ত কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে যে সংখ্যক ডাক্তার বেরুচ্ছেন তা নিতান্তই অপ্রতুল। এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশের এটি একটি বড়ো সমস্যা। একটি মেডিকেল ক্যাডার তৈরি করলে এই সমস্যার কিঞ্চিত সমাধান হতে পারে। চীনের নগ্নপদ ডাক্তার ও রাশিয়ার ফেডসার (**Feldser**) এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পল্লী চিকিৎসক ও আমাদের মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট এই সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করতে পারেন। মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারদের সহকারী এবং যেখানে কোন ডাক্তার নেই সেখানে এককভাবে নিযুক্ত থাকবেন। থানা স্বাস্থ্য প্রশাসনকে অন্যান্য ডাক্তারদের সাথে সাহায্য করা এদের কাজ। এরাই আবার ছোটখাটো রোগীর বিবৃতি শুনবেন, লিপিবদ্ধ করবেন, রোগীকে সহজ সরল রোগের চিকিৎসা দেবেন এবং জটিল রোগ নির্ণয় করে থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পে পাঠিয়ে দেবেন। সরকার তাই একটি বিশেষ ক্যাডার তৈরি করে ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে। অধুনা ৪টি জেলায় ৮টি কেন্দ্রে এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এস. এস. সি. পাস করে এরা ভর্তি হবেন। প্রথমে ৫০ জন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ৩ বছর ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। দু'বছরে মেডিকেল-পূর্ব ও ক্লিনিক্যাল-পূর্ব বিষয় নিয়ে শিক্ষা দেয়া হবে ; তৃতীয় বছরে

তাদেরকে শহর ও গ্রামের হাসপাতালে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে কৃতিত্বের মাপকাঠিতে বিচার করে তাদের মধ্যে কাউকে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

স্কুলের শিক্ষার অষ্টম বছর থেকে কলেজ শিক্ষার একাদশতম বছর পর্যন্ত নার্সিং ও প্যারা মেডিকেল বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হলে ধীরে ধীরে ৩ বছরের মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট কোর্স ও ৪ বছরের উৎপাদিত ক্যাডারের সাথে সমতা রক্ষা করা হবে।

সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকরী করার আগে পল্লীর জনগণের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিলো অপ্রতুল। এর একটা বড়ো কারণ হচ্ছে — স্বাস্থ্যনীতি ছাড়াও বসন্ত নির্মূল অভিযান, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ, যক্ষ্মা প্রতিরোধ, কুষ্ঠ প্রতিরক্ষা, জন্মনিরোধ অভিযান এসব নানা প্রকল্প নিজস্ব ব্যবস্থায় আলাদাভাবে কাজ করতো। বিভিন্ন বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য নির্ণয় করে এবং রোগমুক্ত (curative) ও রোগ প্রতিরোধ (preventive) বিভাগকে একত্র করে স্বাস্থ্য উন্নতি আশা করা যায়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই একত্রীকরণ জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে যতটা কার্যকরী হয়েছে নিচের দিকে ততোটা হয়নি। অসুবিধাগুলো সুস্পষ্ট ঃ

ক. বহুমুখী প্রশাসন — সরকারী (এম. ই. পি, এস. পি. ই, বি. সি. জি, এফ. পি) ; স্থানীয় (মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা প্রশাসন)।

খ. বিভিন্ন সংগঠনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব।

গ. প্রতিরোধ কাজে সাংগঠনিক অসুবিধা।

ঘ. একমুখী কাজের (Unipurpose service) কম সদ্ব্যবহার।

ঙ. মাতৃমঙ্গল ও শিশু চিকিৎসা গ্রামদেশে পুরোপুরি করা যাচ্ছে না।

চ. তদারকী ব্যবস্থার অভাব (Supervisory service)।

এই সমস্ত অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং সীমিত জনশক্তিকে সর্বোচ্চভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে বর্তমান স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত।

থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প

এ যাবত ১৬০টি পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতর ৯২টিকে থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পে পরিবর্তন করা হয়েছে। একজন থানা স্বাস্থ্য প্রশাসক প্রকল্পের সার্বিক দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবেন। প্রকল্পের দুটি বিভাগ — জন্ম-নিরোধ ও স্বাস্থ্য। ২৫টি শয্যাসহ ৬টি আলাদা শয্যা থাকবে মাতৃমঙ্গল ও প্রসূতি মায়ের জন্য। একজন মেডিকেল অফিসার রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবেন। এই কাজের ভেতর থাকবে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কলেরা, অন্যান্য পানিবাহী ও মৃত্তিকাবাহী রোগ, স্কুল স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংস্কার, মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্য।

মেডিকেল অফিসার ছাড়াও সাহায্যকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের ভেতর থাকবে মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, হেল্থ এসিস্ট্যান্ট, এফ. ডব্লিউ. ডব্লিউ ইত্যাদি।

ইউনিয়ন পর্যায়

ইউনিয়ন পর্যায়ে কয়েকটি উপকেন্দ্র থাকবে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে। বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মী (এফ. ডব্লিউ. ডব্লিউ) প্রতি ৪০০০ জনগণের জন্য একজন করে প্রতিটি উপকেন্দ্রে থাকবেন। এখানে উল্লেখ্য, থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পের ২৫টি শয্যাসহ হাসপাতালে যে বিভাগ থাকবে, সেগুলো হলো ঃ

ক. সাধারণ অসুখের চিকিৎসা ব্যবস্থা
খ. জরুরী কেস ছাড়াও অন্যান্য মেডিকেল ও সার্জারী চিকিৎসা সুবিধা
গ. ধাত্রীবিদ্যার চিকিৎসা
ঘ. এক্স-রে ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা।

মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্য

১৬০ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সব কয়টিতে মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্যের নিজস্ব বিভাগ আছে। কিন্তু অধিকাংশই উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী সমন্বয়ে সমৃদ্ধ নয়। শহরে এই বিভাগ হাসপাতালের সাথে সম্পৃক্ত। গ্রামে পরিবার কল্যাণ ও পরিবার স্বাস্থ্যকর্মীরা এই কাজ ছাড়া অন্যান্য পরিবারগত কাজ করেন। এ কাজগুলো হচ্ছে — বিভিন্ন পরিবার থেকে সংখ্যালিপি আহরণ, টিকা দেয়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া, পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রী বিতরণ ও পরিবার কার্ড চালিয়ে নেয়া।

পল্লী এলাকার অসুবিধা ও বাধা কি কি

পল্লী এলাকার বহুবিধ সমস্যা স্বাস্থ্য কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশের লোক বাড়ছে শতকরা ৩ জন হারে। যে কোন উন্নয়নকামী দেশে বেড়ে যাওয়া লোকসংখ্যার সাথে তাল রেখে স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা দুরূহ কাজ। এই সমস্যা গ্রামদেশে বেশি।

পল্লী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। শিক্ষা একটি সমস্যা। পল্লীর জনগণ অনেক সময় নিজের আসল সমস্যা কি তা তুলে ধরতে পারে না বলে স্বাস্থ্যের সুবিধাও ভোগ করতে ব্যর্থ হয়। এই সমস্ত সমস্যা থেকে আগে মুক্তি প্রয়োজন। অনেক সময় গ্রাম এলাকায় দূর দূরান্তের স্বাস্থ্যকর্মী চাকুরি পায়। পরিবেশ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, নতুন তার কর্তব্যের পরিধি। অনেক সময় কথাবার্তার ভাষাও হয় আলাদা। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে থাকেনা। এ সমস্ত কারণে রোগীরা সুচিকিৎসা পান না, অথচ এটা তাদের জন্মগত অধিকার।

এ সমস্ত বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পারতপক্ষে নিজ এলাকায় চাকুরি দেয়া উচিত।

এছাড়া প্রথম বছর থেকে একজন মেডিকেল ছাত্র সামাজিক পরিবেশের সাথে পরিচিতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম বছরে তাকে দিয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে টিকা দেয়া এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা দেয়া যেতে পারে। কোথাও মহামারী হলে মেডিকেল টিমের কর্মী হিসেবে তাদেরকে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো যেতে পারে। যদি তাকে দিয়ে এ সমস্ত কাজ করানো হয় তাহলে সে তার পাঠ্যবিষয়ে একগাদা হাড়ডি আর মৃতদেহের বাইরে আরও আনন্দ খুঁজে পাবে। সে নিজেকে সমাজের একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখবে। পরবর্তী জীবনে এই অভিজ্ঞতা ও মেশার আগ্রহ কাজে লাগবে।

এই কথার মানে এই নয় যে, একজন ডাক্তার গ্রামে বসে তাঁর সাধারণ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবেন না। একই সাথে তাঁর ভবিষ্যত উন্নতির সোপান কেমন হবে, কেমন করে একজন ডাক্তার তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট রেখে কর্মজীবন চালাতে পারেন সে বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হবে। তখনই ডাক্তার সমাজের লোকজনকে নিয়ে ভাবতে পারেন, তাদেরকে আপন বলে মনে করবেন।

আমাদের দেশে যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা নিতান্তই কম, যেখানে মৌলিক বিষয়সমূহে (Basic subjects) জনস্বাস্থ্য বিভাগে (Public health) ও প্রতিরোধ কর্মীদের (Preventive workers) ক্ষেত্রে কম নজর দেয়া হয়। আবার অন্যদিকে সাধারণ চিকিৎসকদের (General Practitioner) হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠান থেকে

অনেক দূরে রাখা হয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানের চাহিদা ও ডাক্তারের সংখ্যার বিরাট ব্যবধানের ভেতর এই সকল ডাক্তারের ভূমিকা নগণ্য নয়। তাঁদের প্রতিভা ও প্রজ্ঞার সঠিক মূল্যায়ন করা উচিত, যা আমাদের সমাজের কল্যাণে আসবে। বর্তমান ব্যবস্থায় তাঁদেরকে ৬০ টাকা থেকে ১০০ টাকা মাসিক হারে প্রাকটিস না করার ভাতা দেয়া অপমানজনক বৈকি।

সংক্ষেপে, সমস্ত ডাক্তারদের সমাজের অঙ্গ হিসোবে গড়ে তোলা উচিত। সাধারণ স্বাস্থ্য শিক্ষা থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ এবং এমনকি জটিল অপারেশন করার ব্যবস্থা একটি এলাকায় নির্দিষ্ট ডাক্তারের মাধ্যমে করা প্রয়োজন। ধীরে ধীরে এ সমস্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম এলাকায় যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা কম, সেখানে এলাকার কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা শহরের বেসরকারী হাসপাতালকেও চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা উচিত।

এ যাবত আমরা হাতুড়ে ডাক্তার, হোমিও চিকিৎসক, কবিরাজ এঁদেরকে অবজ্ঞা করেই এসেছি। তাঁদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা করিনি। কিন্তু তাঁদের অবদানও সমাজে কম না, তাঁদের নিয়েও চিন্তা করার সময় এসেছে।

একটি বিষয় সুস্পষ্ট, জনগণের স্বার্থে সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে কাজে লাগাতে হবে, দেশের অত্যাধুনিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত এই ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিতে হবে। আমরা ডিগ্রীধারী বা হাতুড়ে ডাক্তার সবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি।

একটি সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনীতির কথা সর্বকালের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে নিশ্চিত করে বলা যায়না। মাঝে মাঝে এর সুবিধা–অসুবিধা, সুফল–দুর্বলতা নিয়ে বিচার করা উচিত। জনগণের স্বার্থে যখন যে স্বাস্থ্যনীতি প্রয়োজন সেই অনুযায়ী তা নির্ণয় করতে হবে। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে — সবার জন্য স্বাস্থ্য, সু-চিকিৎসা পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের একটি জন্মগত অধিকার।

শুশ্রূষা মার্চ '৮১ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বি. এম. এ. অষ্টম জাতীয় সম্মেলন ১৯৮১-এ অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের সভাপতি হিসেবে ভাষণ

আজকের সভার সভানেত্রী, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও বন্ধুগণ,

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের অষ্টম জাতীয় সম্মেলনের এই মহতি সভায় আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি আজ আমাদের এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। আপনারা হয়তো জানেন, তিনি কিছুদিন পূর্বে অসুস্থ্য হয়ে হাসপাতালে ছিলেন এবং সে সময়ই তিনি আমাদের অনুরোধে এই সভার প্রধান অতিথি হবার সানন্দ সম্মতি জানিয়েছিলেন। আজকে তাঁর উপস্থিতি আমাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসারই নিদর্শন। আপনাদের সকলের তরফ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এই সাথে আমি বিশেষ অতিথিকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের এ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন এবং যে সব বিদেশী প্রতিনিধি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আজকের সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের সকলকে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে মূল বক্তব্য রাখার পূর্বে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা বিগত বৎসরে আমাদের কাছ থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক বদরুল আলম, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউটের শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল কাদের এবং ডাঃ ফাহিমউদ্দিন আহ্‌মেদ, ডাঃ বনি আমিন, ডাঃ শামসুল হুদা, ডাঃ কামরুল হাসান পিনু এবং ডাঃ আলি হাফিজ সেলিম (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক) আজ আমাদের মধ্যে নেই। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে।

এখন আমি, প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার সুযোগ গ্রহণ করছি। সুযোগ্য সভানেত্রী ও সুদক্ষ সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত বলবেন। আমি সাধারণভাবে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব।

"২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" সংস্থার এই শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে

রোগ প্রতিরোধ ও রোগ মুক্তির জন্য উপযুক্ত কুশলী ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের চিকিৎসা সহায়তাকারী (auxillary) তৈরি করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। মেডিকেল এসিসটেন্ট, প্যারামেডিক, পল্লী চিকিৎসক এই বিভিন্ন প্রকল্পের ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা যাচাই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং এই স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। আমি মূলত যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের চিকিৎসকদের শিক্ষা দিয়ে থাকি সে সম্বন্ধে আলোচনা সীমিত রাখবো। উপযুক্ত চিকিৎসক তৈরি করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকমণ্ডলী। যে দেশে দশ কোটি মানুষের জন্য ডাক্তারের সংখ্যা দশ হাজরেরও কম, সে দেশে অধিক সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমরা যেন মনে রাখি যে, প্রচুর চিকিৎসক সৃষ্টি করতে গিয়ে যেন চিকিৎসার মান নিম্নগামী না হয় এবং তাঁরা স্বাস্থ্যরক্ষার পরিবর্তে স্বাস্থ্যহানি করে না বসেন। এই সম্পর্কে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সপ্তম জাতীয় সম্মেলনের অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম সাহেবের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

"প্রশ্ন হচ্ছে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের আর্থিক সঙ্গতি, অত্যাবশ্যকতা, বিশেষত সঠিক অর্থে চিকিৎসা বিজ্ঞানী সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপকরণ ও দক্ষ শিক্ষক, জনশক্তি আমাদের রয়েছে কি? স্মরণ রাখতে হবে, আমরা আমাদের দেশবাসীর জীবন রক্ষার কারিগর সৃষ্টি করছি। নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের আগে খতিয়ান করে দেখতে হবে আমাদের বর্তমান মেডিকেল কলেজগুলো যথার্থ অর্থে ডাক্তার সৃষ্টি করার একান্ত প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে কি?"

সাধারণভাবে বিশেষত মৌলিক বিষয়ে (basic subject) সংকট প্রকট রয়েছে। এ ধরনের বহু বিভাগ রয়েছে যেখানে কোন পূর্ণ অধ্যাপক নেই। ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে শিক্ষকের স্বল্পতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও রাজধানীর বাইরে অনেক মেডিকেল কলেজে এই সমস্যা প্রকট।

দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, সরকারী চিকিৎসকদের নিয়মিত পদোন্নতি, বদলী, অবসরপ্রদান ও পুননিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু নীতিমালা নেই কিংবা থাকলেও তা সঠিকভাবে অনেক সময় প্রয়োগ করা হয়না। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের স্বল্পতা হেতু বিএমএ অবসর প্রদানের বয়ঃসীমা ৫৭ বছর থেকে বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ন্যায় ৬০ বছরে উন্নীত করার আবেদন জানিয়েছে। অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র বই-পুস্তকের পাতা থেকে সংগ্রহ করা যায় না। সাধারণভাবে বহু উন্নত ও অনুন্নত দেশে কুশলী বিজ্ঞানীদের যতদিন তাঁরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ততদিন সরকারীভাবে জাতীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত রাখবার বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা

হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করছি।

মৌলিকভাবে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিভিন্ন হাসপাতালে সরকারী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করলে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উর্দ্ধতন ব্যক্তিদের খামখেয়ালী, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা, চাকুরিজীবীদের অবহেলা হ্রাস পাবে। এ বিষয়ে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী অধ্যাপক সালাম সাহেব ঢাকায় অবস্থানকালে এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষকদের দ্বারাই স্বয়ংশাসিতভাবে পরিচালিত হওয়া উচিৎ। বিএমএ সেজন্য মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা প্রদানের আহ্বান অতীতেও জানিয়েছে। উপযুক্ত গভর্নিং বডির মাধ্যমে শিক্ষাদান, নাগরিক এবং প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সমঝোতার মধ্য দিয়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা মহাবিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। এর শিক্ষাগত মান দেশে ও বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক ছাত্র ভর্তি পোস্ট-গ্রাজুয়েট চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষায় কি প্রভাব ফেলতে পারে তা আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই রেওয়াজ কোন দেশে নেই এবং এডিনবরা রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান এ্যান্ড সার্জন এর প্রাক্তন সভাপতি বাংলাদেশ সফরকালে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, এর ফলে পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা ও গবেষণা ব্যাহত হতে পারে। প্রতিবেশী ভারতের শুধুমাত্র **All India Institute of Medical Sciences** -এ স্নাতক ছাত্র ভর্ত্তি করা হয় এবং তা হয় সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে এবং যে সকল মেডিকেল কলেজের বিশেষ বিভাগে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেয়া সম্ভব সে সকল স্থলে পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স খোলা প্রয়োজন।

সর্বশেষে, মেডিকেল গবেষণা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। মেডিকেল গবেষণা পরিষদের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি **Science and Technology Division** এদিকে নজর দিয়েছে। এর বার্ষিক বরাদ্দ মাত্র ৬ লক্ষ টাকা এবং তা থেকে গবেষণা ও কর্মচারীদের বেতন নির্বাহ করতে হয়। যে সকল শিক্ষক ও চিকিৎসক গবেষণার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপনার সুযোগ দেওয়া দরকার এবং এ ব্যাপারে অনেকে হয়রানির

শিকার হয়েছেন, যাঁরা মেডিক্যাল পুস্তক লিখেছেন তাঁরাও কোন প্রশংসা লাভ করেন নাই।

সুধীমণ্ডলী,

একজন চিকিৎসক, শিক্ষক এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে জাতীয় স্বার্থে আপনাদের সামনে চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা আমি করেছি। প্রশাসনকে সাহায্য করার স্বার্থেই কিছু তথ্য আমি পেশ করলাম। বিএমএ সরকারকে গঠনমূলক সুপারিশ দিয়ে সাহায্য করতে আগ্রহী। আমাদের এই সকল সুপারিশ সহৃদয়তার সাথে উপযুক্ত প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দেশের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে — এই আশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। *

---

* বিএমএ অষ্টম জাতীয় সম্মেলনে ১৯৮১ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে।

প্রেসক্রিপশনে ওষুধের ছড়াছড়ি চিকিৎসকের অজ্ঞতারই পরিচায়ক

বিশেষ সাক্ষাৎকারে চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রফেসর নুরুল ইসলাম

"একজন রোগী একাধিক রোগে ভুগতে পারেন। তবে একাধিক রোগের চেয়ে একই রোগের একাধিক লক্ষণ থাকার সম্ভাবনা বেশি। সেমতাবস্থায় একাধিক রোগের একাধিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা যুক্তিসংগত নয়। এতে করে মূল রোগের নিরাময়ও হয়ে যায় জটিল, ওষুধের ছড়াছড়িও যায় বেড়ে। প্রেসক্রিপশন খুললে দেখা যায় ৭/৮ কিংবা ততোধিক আইটেমের ওষুধ দেয়া হয় রোগীকে। রোগ নির্ণয়ে যত্নবান না হয়ে ওষুধের পর ওষুধ দিয়ে যাওয়া আসলে চিকিৎসকের অজ্ঞতারই পরিচায়ক।" কথাগুলো দেশের প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ঢাকা পোস্ট–গ্রাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর নুরুল ইসলামের। 'সচিত্র স্বদেশে'র সাথে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রফেসর নুরুল ইসলাম চিকিৎসা শাস্ত্রের কতগুলো মৌলিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন, যার সংক্ষিপ্তসার এখানে পত্রস্থ করা হলো ঃ

কেন এত ওষুধের ছড়াছড়ি?

ওষুধের দোকানে রোগী 'প্রেসক্রিপশন' নিয়ে আসে। প্রেসক্রিপশন খুলে দেখা যায় নানা রকমের ওষুধের সন্নিবেশে প্রেসক্রিপশনটি পরিপূর্ণ। কেউ যদি ওষুধের দোকানে গিয়ে বসেন তাহলে দেখতে পাবেন একের পর এক রোগী বা তাদের লোকজন প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসছেন। প্রেসক্রিপশনগুলো বিভিন্ন সাইজের। কোনটিতে ওষুধ ১টা বা দুইটা, কোনটিতে ৭/৮ পদের ওষুধের নাম লেখা আছে। ডিগ্রীধারী ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনও আছে, স্বল্পশিক্ষিত* [যাদেরও ডাক্তার বলা হয়] ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনও আছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, প্রেসক্রিপশন দেবার লোকের তেমন অভাব নেই। অভাব শুধু সুচিকিৎসার। প্রেসক্রিপশন যে–কেউ লিখে দিচ্ছেন। তা সে ছোট একটা কাগজে বন্ধু–বান্ধবরা আন্দাজেও লিখে দিতে পারে, মাঝারী আকারের প্রেসক্রিপশনও হতে পারে। প্রেসক্রিপশনে ওষুধের এত ছড়াছড়ি দেখে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে — এক অসুখের জন্য একটা ওষুধ এবং একাধিক ওষুধ

---

* সচিত্র স্বদেশ ২৭–১–১৯৮৩ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

একাধিক অসুখের জন্য কি না। একজন রোগী একাধিক রোগে ভুগতে পারেন কিন্তু একাধিক রোগের চেয়ে একই রোগের একাধিক লক্ষণ থাকার সম্ভাবনাই বেশি। যদি কোন ক্ষেত্রে একজন রোগীর একাধিক রোগ থাকে, সেক্ষেত্রে একাধিক রোগের একাধিক ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা যুক্তিসংগত নয়। এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল — যে রোগটি সবচেয়ে বেশি প্রকট তার আশু প্রতিকার। দ্বিতীয়ত যে রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে, দেখা দিতে পারে নানা রকম উপসর্গ, সে রোগের চিকিৎসাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে — রোগীর একাধিক রোগ থাকলে সব রোগের চিকিৎসা এক সাথে করা যাবেনা কেন? অনেকে ভাবতে পারেন সব রোগের এক সাথে চিকিৎসা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আসলে কিন্তু তা নয়। আসল রোগ নির্ণয় এবং প্রতিকারই হলো উদ্দেশ্য। ওষুধের কদর বৃদ্ধি করার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। একজন চিকিৎসক রোগ, রোগী এবং ওষুধ সম্বন্ধে যত কম জানবেন, ওষুধের পরিমাণও ততই বেড়ে যাবে।

এক সাথে একাধিক রোগ নিরাময়

এক সাথে একাধিক রোগের চিকিৎসা দিতে গেলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকটতর এবং জটিল রোগের চিকিৎসা সর্বাগ্রে করা উচিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা বাঞ্ছনীয়। তাই যদি হয়, তবে প্রেসক্রিপশনে একাধিক ওষুধ লেখা হয় কেন? কেনই বা ওষুধের সংখ্যা ৬/৭ কিংবা ততোধিক হয়? সাধারণত আমরা দেখি, একজন রোগী সবচেয়ে কষ্টদায়ক বা তাৎক্ষণিক সব লক্ষণ নিয়ে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে রোগের ইতিহাস বলতে গিয়ে কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায় অথবা রোগ ধরা পড়ে। অনেকগুলো প্রেসক্রিপশন এক সাথে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ওষুধের সংখ্যা রোগের উপর নির্ভর না করে লক্ষণের উপর নির্ভর করেই দেয়া হয়েছে।

রোগের চিকিৎসা বনাম রোগের লক্ষণের চিকিৎসা

ধরা যাক এক ব্যক্তি 'আলসার' রোগে ভুগছেন। লক্ষণ হিসেবে তার পেটে ব্যথা থাকা খুব স্বাভাবিক। তার হজমশক্তিও একটু কম, পায়খানা নিয়মিত হয় না, মাঝে মাঝে ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটে। তার মূল রোগ কিন্তু 'আলসার।' এ রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন একটা কি বড়জোর দুইটা ওষুধ। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা লক্ষণের জন্য

যদি ওষুধ দেয়া হয়, তাহলে কমপক্ষে তাকে ৬/৭ টা ওষুধ দিতে হবে। একটা দিতে হবে হজমের জন্য, একটা গায়ে ব্যথার, একটা ঘুমের আর একটা নিয়মিত পায়খানার জন্য। সে রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেলো — মূল রোগ নির্ণয়ে গলদ রয়ে গেলো — এক ধার থেকে লক্ষণ বা উপসর্গের জন্য তাকে সেবন করতে দেয়া হলো এতগুলো ওষুধ।

রোগী যে 'আলসার রোগে ভুগছে তা' সাব্যস্ত করার পর যদি সে রোগের সম্পূর্ণ লক্ষণ জানা না থাকে, চিকিৎসকও যদি তার পরামর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল না থাকেন তাহলেই বিপদ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, রোগীর 'আলসার' হয়ে থাকলে হজমের শক্তি হ্রাস পেতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার দোষেও অনেকের পায়খানা নিয়মিত হয় না, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাও বিচিত্র কিছু নয়। মোট কথা, এ রোগের যে যে লক্ষণ তার সবগুলো পূর্ণ হতে পারে। তাহলে সেখানে মূল রোগের চিকিৎসা যখন একটা/দুটো ওষুধে সম্ভব, তখন একাধিক ওষুধ দেয়া হবে কেন? আমার যদি সন্দেহ থাকে, এ রোগীর সব লক্ষণ 'আলসার'-এর নয়, সেক্ষেত্রে এ রোগের চিকিৎসা ছাড়াও লক্ষণের চিকিৎসা মোটামুটিভাবে আমার কাছে অপরিহার্য বলে মনে হবে। আর আমি যদি জানি বা এ ব্যাপারে আমার যদি কোন রকম সন্দেহই না থাকে যে, এসব লক্ষণ একই রোগের, তাহলে আসল রোগের চিকিৎসা করে কিংবা সেরকম ব্যবস্থাপত্র লিখে রোগীকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে তাকে অনেক বাহুল্য ওষুধের হাত থেকে রেহাই দিতে পারি।

প্রসঙ্গ ঃ হজমি ওষুধ

চিকিৎসা ক্ষেত্রে হজমি ওষুধের কোনো স্থান নেই। কোষ্ঠকাঠিন্যের আসল ওষুধ খাওয়া দাওয়ার উপর নির্ভর করে, তবু এগুলো বহুল প্রচলিত। অনেক প্রেসক্রিপশনে লেখা হয় এসব হজমি ওষুধ। বাজারে এগুলো বহুল প্রচারিত। কেউ প্রেসক্রিপশন নিয়ে গিয়ে কেনে, কেউ সোজাসুজি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসে। হজমী ওষুধ নামে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বাজারে যে কত আছে তার কোন হিসেব নেই। নানা রঙের বিভিন্ন ডিজাইনের অল্প দামী এবং বেশি দামী অনেক ধরনের এ জাতীয় ওষুধ বাজারে ভরা। কোন কোন কোম্পানী তাদের নিজেদের কথায়, টিকে থাকে এসব ওষুধ বিক্রয়ের উপর। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যেহেতু এগুলোর কোন গুণাগুণ নেই, তাহলে এগুলি আমরা লিখি কেন? আমরা লিখি বিভিন্ন কারণে। তথাকথিত এইসব ওষুধ সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি তাদের প্রচারপত্রের মাধ্যমে, তাদের নিযুক্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। যাঁরা প্রেসক্রিপশন লেখেন তাদের

অনেকের কাছে এইসব প্রচারপত্রই ধারণার উৎস। এখানে বলা দরকার যে, 'আলসার' না থাকলেও কিংবা কোন রকমের রোগ ধরা না পড়লেও হজম হচ্ছে না বলে হজমি ওষুধ খেতে হবে এমন কোন কথা নেই। বরং বিপরীতটাই সত্য, হজমের যদি ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে দেখতে হবে দোষটা কোথায়? যে খাবারে অভ্যাস নেই, যে খাবার গুরুপাক — এধরনের কিছু খেলেও হজমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অতি জটিল রোগ থেকে শুরু করে মানসিক অবস্থা যে কোনটিই এ লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই মূল কারণটা বের করে তার প্রতিকার না করে এধরনের ওষুধ ব্যবহার চিকিৎসকের অজ্ঞতার পরিচায়ক। মোটকথা, পেনক্রিয়াটিক ডেফিশিয়েন্সি, সেখানে পেনক্রিয়াটিন নামক একটি ওষুধ দিতে হয়। আর শিশুদের ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি থাকলে ল্যাকটেজ দিতে হয়। এদু'টো রোগ ছাড়া আর কোন অসুখে হজমি বা 'এনজাইম'-এর দরকার হয়না। অন্যসব হজমির (যা বিভিন্ন নামে বাজারে আছে) বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয় এবং এগুলো liquid (তরল) হিসেবে বোতলজাত করায় এগুলোর stability বা স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। এবং ও দুটো মাত্রায় বেশি করে দিতে হয়। অনেক সময় পেটের অম্লতা অন্য ওষুধ দিয়ে নষ্ট করে **Pencriatik** বেশি করে দিলে কিছু অংশ হলেও পেটে অবশিষ্ট থেকে যায়।

ভ্রান্ত ধারণা ঃ অলীক সান্ত্বনা

আগেই বলেছি, আমরা অজ্ঞতাবশতই হোক আর সচেতনভাবেই হোক — রোগের সুচিকিৎসা না করে, রোগের লক্ষণের চিকিৎসা করছি। অহেতুক ওষুধের পর ওষুধ দিয়ে ফর্দ বাড়াচ্ছি, প্রেসক্রিপশনের কলেবর বৃদ্ধি করছি। অবশ্য এর পেছনে আরও কিছু কারণ আছে, যা কিনা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা এবং সান্ত্বনামূলক। আমাদের অনেকের মধ্যে এরকম একটা ধারণা কাজ করে যে, বেশি ওষুধ দিতে পারলে রোগী ভাববে ইনি অনেক ওষুধ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখেন। এ ছাড়া কারো কারো নতুন (সদ্য বাজারজাতকৃত) ওষুধ প্রেসক্রাইভ করারও প্রবণতা আছে। নতুন নামের ওষুধ দিয়ে আমরা অনেকে এটা প্রমাণ করতে চাই যে, নতুন ওষুধ দিলাম, রোগীও ভাবলো এই ডাক্তার নিত্যনতুন ওষুধের খোঁজ-খবর রাখেন। অবশ্য নতুন ওষুধ দেবার পেছনে কোম্পানীগুলোর প্রচারও একটা বড় কারণ। অনেক চিকিৎসক প্রচারাভিযানে বিশ্বাস স্থাপন করেই প্রেসক্রিপশনে নতুন নতুন ওষুধ লেখেন। অনেক সময় ওষুধের সুদর্শন প্যাকেট বা শিশির বাহ্যিক আকর্ষণও কাজ করে।

বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের চিকিৎসায় সমস্যা

অনেক বিত্তবান রোগী প্রয়োজন থাক বা না থাক বিদেশ থেকে আমদানীকৃত দামী ওষুধপত্র পছন্দ করেন। রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের সন্তুষ্ট করার জন্য আমরাও অনেক সময় এসব অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করতে বলি। বস্তুত প্রভাবশালী ও বিত্তবানদের চিকিৎসা করা আরও কঠিন। অনেক সময় মেডিকেল বোর্ড-এ একাধিক চিকিৎসকের পছন্দ মাফিক একাধিক ওষুধ দিলেও রোগীর জন্য তা হয়ে দাঁড়ায় দুর্বিসহ।

প্রসঙ্গ ঃ ডাক্তারদের সময়সীমা

যে কোন চিকিৎসকের রোগীর সম্পূর্ণ অভিযোগ শ্রবণ এবং রোগের ইতিহাস জানা দরকার। এঁদের অবশ্যই রোগীর জন্য প্রয়োগজনীয় সময় দিতে হবে। ধৈর্য্যের সাথে শুনতে হবে তার সমস্ত অভিযোগ এবং রোগের ইতিবৃত্ত। এক্ষেত্রে রোগীর জন্য সময় না দিলে চলবেনা। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তথা সুচিকিৎসা বিধানের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হলো চিকিৎসকের সময়-স্বল্পতা। চিকিৎসকের উচিত এক সাথে একাধিক রোগী না দেখে বা ত্বরিৎ গতিতে কোন রোগী বিদায় না করে প্রত্যেকটি রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে রোগ নির্ণয়ে মনোনিবেশ করা।

কে দেবে এই প্রেসক্রিপশন?

ওষুধনীতির আড়াই বছর পূর্ণ হলো। এই ওষুধনীতি দেশ-বিদেশে সমাদৃত। যে উদ্দেশ্য নিয়েই এর প্রণয়ন তার সাফল্য এখন প্রমাণিত। স্বল্প কথায় বলতে গেলে এখন সবাই জানে, 'সব ওষুধই ওষুধ নয়', অনেক ওষুধ অতি প্রিয় হলেও অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। বহু যুগের তথাকথিত পরীক্ষিত ওষুধ ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তথাকথিত প্রচলিত ওষুধের মূল্যায়ন হয় ওষুধনীতির মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ৭ই জুন। ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদন এবং বিক্রি এই নীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় উপাদান বাদ দিয়ে কোনো কোনো কোম্পানীকে ওষুধ তৈরি করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু ওষুধ, যেগুলো তৈরি করার পারদর্শিতার প্রয়োজন নেই, দেশী কোম্পানীর উপর সেগুলোর ভার দেয়া হয়েছে। যেমন এন্টাসিড বা আলসারের ওষুধ এবং নানা ধরনের ভিটামিন। সুযোগ সুবিধা এবং পারদর্শিতা আছে বলে বিদেশী কোম্পানীকে ভিটামিন ও ইনজেকশন তৈরির ভার দেয়া হয়েছে। আরো উল্লেখযোগ্য, এই সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ওষুধগুলো জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষায় অপরিহার্য ও অতি প্রয়োজনীয়।

নিষিদ্ধ ওষুধের সর্বশেষ সময়সীমা ছিলো ১২ জুন, ১৯৮৪। স্বার্থান্বেষীমহল এখন উদগ্রীব, বাজারে নকল ওষুধের ছড়াছড়ি। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আকুল আবেদনে বলা হয়েছে বিধিনিষেধ আরোপিত হলে এমনতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাধানিষেধই যদি না থাকে তবে আইনের প্রয়োগ কোথায়? অন্যায়কে যদি অন্যায় না বলি, তবে ন্যায় কাকে এবং কি দিয়ে বলা হবে জানি না।

স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশে ওষুধনীতির ভিত্তিতে অনেক নিষিদ্ধ ওষুধ উন্নত দেশগুলোতে প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন টেরামাইসিন সিরাপ, কফ মিক্সচার। তাহলে প্রশ্ন জাগে কেন এগুলো নিষিদ্ধ হলো।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশ। সাড়ে ন' কোটি লোকের জন্য শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা এখানে দশ হাজারের মতো। অন্যদিকে শতকরা নব্বই-পঁচানব্বই জন লোক গ্রামের বাসিন্দা। দশ হাজার ডাক্তারের প্রায় আট হাজার থাকে বড় বড় শহরে। জনবহুল গ্রামবাংলার অনেকেই শিক্ষিত ডাক্তারের মুখ পর্যন্ত দেখেনি। এদের অসুখ হয়, এরা ওষুধ খায়, কিন্তু কার উপদেশে? অশিক্ষিত কিংবা অল্প-শিক্ষিত গ্রাম-ডাক্তার এদের অনেকের সহায়। আবার অনেকের কপালে তাও জোটেনা। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শে এরা চিকিৎসা চালায়। শোনা কথায় এরা ওষুধ কিনে, সুন্দর কাগজে ছাপা কোম্পানীর প্রচারপত্র শুধু স্বল্প-শিক্ষিত চিকিৎসক নন,

অনেক শিক্ষিত চিকিৎসকের মন জয় করতে পারে। তার উপর তাদের চটপটে চতুর প্রতিনিধি নানা কলাকৌশলে নিজ নিজ কোম্পানীর বিভিন্ন ওষুধের কীর্তনের কথা বলেন। এমনি করে অনেক প্রেসক্রিপশন প্রভাবান্বিত হয়। আটষট্টি হাজার গ্রামে গড়পড়তা একজন করে ধরলেও পল্লী চিকিৎসকের সংখ্যা দাঁড়ায় আটষট্টি হাজারে। সমস্ত ওষুধ সম্বন্ধে এদেরকে সজাগ করে তোলা কতোটুকু সম্ভব জানি না। অলৌকিক কোনো শক্তি বলে তাও যদি হয়, তবে কিসের মাধ্যমে আমরা আইনগত এবং বেআইনী প্রেসক্রিপশন আইনের কাঠামোতে ফেলে বিচার করে দেখবো? টেরামাইসিন সিরাপ শিশুদের বেলায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ — এই ধরনের প্রেসক্রিপশন দেয়া বেআইনী, কথাগুলো আইনের খাতায় লেখা হলেও অজগ্রামের কয়েক হাজার প্রেসক্রিপশনে শিশু চিকিৎসায় এই ওষুধ লেখা হলো, কোন্ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে এগুলোর বিচার হবে? কোন্ সংগঠনের মাধ্যমে এগুলি প্রশাসনিক নজরে আসবে? অন্যদিকে যারা নিজেরা ওষুধ কিনে, প্রেসক্রিপশন যেখানে সম্ভব নয় — তাদের বেলায় শুধু কি তাই? আইন করে দিলাম বিনা প্রেসক্রিপশনে ওষুধ বিক্রি নিষিদ্ধ। অথচ প্রেসক্রিপশন দেয়ার লোক নেই তাহলে? শুধু প্রেসক্রিপশনে ওষুধ বিক্রি সেখানেই সম্ভব যেখানে সকলের প্রেসক্রিপশন পাওয়ার সুযোগ সুবিধা আছে।

বেআইনী প্রেসক্রিপশন যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কবলে সেখানে বিশেষ কোনো ওষুধের বিধিনিষেধ প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে সম্ভব। উন্নত দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এমন ব্যাপৃত, ডাক্তার জনসংখ্যার অনুপাত এবং আর্থিক সংগতি এমন একটা পর্যায়ে, প্রেসক্রিপশন সেখানে শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকের মাধ্যমে সম্ভব। আপনার ইচ্ছামতো ওষুধ সেখানে কিনতে পারবেননা। স্বীকৃত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনার ইচ্ছা আর পয়সা সেখানে ওষুধ কেনার কাজে লাগে না। এমনকি, সেদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত না হলে আমার দেশের কোনো উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে সেখানে ওষুধ কেনা যাবেনা। মোটকথা, তাঁদের যথেষ্ট ডাক্তার আছে, সামর্থ্য আছে, আইন আছে, ভুল প্রেসক্রিপশনের সাজা আছে। ওষুধের অপপ্রয়োগ আমাদের এখানে এড়ানো যায়না। ক্ষতির মাসুল এখানে অনেক। জীবন নিয়ে খেলা চলেনা, প্রতিটি প্রেসক্রিপশন একটা দলিল। যে দেবে আইনের চোখে সেই দায়ী।

আর বাংলাদেশে? যদি আইন করেন প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ দেয়া যাবে না তাহলে প্রশ্ন জাগে — কতো ডাক্তার, কতো রোগী, কতো প্রেসক্রিপশন? কে দেবে এই প্রেসক্রিপশন?

সাপ্তাহিক রোববার ১০-২-১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কর্তব্যনিষ্ঠাই চিকিৎসকের আদর্শ হওয়া উচিত

প্রজ্ঞা মানুষের প্রশান্তি দেয়, সাধনা অন্তর্গত সৌন্দর্যকে বিকশিত করে। চিত্তে চেতনার দ্বীপ জ্বলে সেবার মাধ্যমে। আর প্রেম মানুষকে দেয় পূর্ণতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে জীবনের আয়ত্তে আসে সে জীবন বিশিষ্ট তথা ব্যতিক্রম। যাঁরা এই মানবিক গুণাবলী স্ফুরণের জন্য নিবেদিত তাঁরা মহান। প্রফেসর নুরুল ইসলাম এ দলের একজন। মানুষের বেদনা তাঁকে বিচলিত করে, দায়িত্ববোধ অবিরত তাড়িয়ে বেড়ায়। এই তাড়না যোগ্য মানুষের জন্য স্বাভাবিক। একজন যথার্থ সেবকের পক্ষে এটাই সংগত। তাই দেশের সর্বস্তরের মানুষের তিনি প্রিয়জন, বিদেশেও বিজ্ঞজন বলে পরিচিত।

বয়স যখন চার, তখন তিনি তাঁর পিতাকে হারান। তিন ভাই-এর মধ্যে তিনি ছোট। আরবী শিক্ষা দিয়ে বর্ণপরিচয় শুরু। তীক্ষ্ণ মেধা পরিলক্ষিত হয় কৈশোরেই। ক্লাস ডিঙ্গিয়ে ভর্তি হন ৪র্থ শ্রেণীতে। শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র নুরুল ইসলাম ম্যাট্রিক পাস করেন ১৯৪৩ সালে, প্রথম বিভাগে। অতঃপর কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ।

আজকের খ্যাতনামা চিকিৎসা বিজ্ঞানীর জীবন হয়তো বাঁক নিতো অন্যদিকে, যদি তিনি ফিজিক্সে সর্বোচ্চ নম্বর না পেতেন। যথেষ্ট বাধা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ প্রিন্সিপালের কাছ থেকে তিনি ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেন। বিনম্র স্বভাবের এই মানুষটি সত্য প্রকাশের অপারগতা দেখাননি কখনো। তাঁর শিক্ষা জীবনের সাফল্যের মূলে ছিল সততার আদর্শ। পরবর্তী জীবনের কৃতিত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলার অবকাশ নেই। আজ সম্মান তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট বিস্তৃত হয়েছে স্বদেশে-বিদেশে। চিকিৎসক জীবনের প্রেরণা তাঁর ভেতরে অংকুরিত করেছিলেন মা। স্মৃতিচারণ করে বললেন, হাত ভেঙ্গে মচকে গেলে অনেকে চিকিৎসার জন্য মায়ের কাছে আসতেন। তিনি বিশেষ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। অনেককেই ভালো হতে দেখেছি। তখন মনে হতো এসব চিকিৎসার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এখন মনে হয়, তা অবৈজ্ঞানিক ছিলোনা। এই ঘটনা আমাকে আলোড়িত করে। তিনি প্রায় বলতেন, 'মানুষকে সেবা করবে, ভালবাসবে'। মাতৃভক্ত নুরুল ইসলাম কথা রেখেছেন। তাছাড়া বড়ভাই মোঃ আছহাব কর্মজীবনের সঠিক ক্ষেত্রটি নির্দেশ করেছিলেন যথাসময়ে। স্কুল জীবনেই হোমিওপ্যাথের জনক, হ্যানিম্যানের জীবনী পড়ে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আসক্ত হোন। মেঝো ভাই ফরিদুল আলম জড়িত ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাথে। তাঁর সংগ্রহ থেকে এই বইটি তিনি পড়েছিলেন। প্রেরণার আরেকটি উৎস মামা ইকবালুর

রহমান। 'আত্মশুদ্ধি ছাড়া মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটে না' — এ কথা জীবনের সূচীপত্রে মামাই লিখে দিয়েছিলেন। ডঃ ইসলাম বললেন, 'রোগী হিসাবে বুঝতে পেরেছি চিকিৎসার আনন্দ কী আর চিকিৎসকের দায়িত্ব কতো বেশি। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিই চিকিৎসক হবো।'

কর্মজীবনের বাঁকে বাঁকে প্রচুর বাধাগ্রস্ত হয়েছেন তিনি। আকাঙ্ক্ষার তেজ তাঁকে এগিয়ে নিয়েছে। সমস্ত পিছুটান ছিঁড়ে মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছেন। মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেছে। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি জানালেন, 'সততা ও অধ্যবসায় কখনো পরাভব মানেনা। মনুষ্যত্বের পরাজয় নেই।' প্রফেসর ইসলাম আরো বললেন, 'ক্ষমতার অপব্যবহার জীবনে শোচনীয় পরাজয় ডেকে আনে। মানবতাকে লুণ্ঠিত করে কেউ স্বস্তিতে থাকতে পারেনা।' জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের নীচতা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। ভেতর ও বাইরের দুই রূপ দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। সংকীর্ণতার প্রতি তাঁর আজীবন ভীতি।

এক পর্যায়ে প্রফেসর ইসলাম স্বাধীনতা-বিরোধীদের দৃষ্টান্ত দিলেন। স্বাধীনতার শত্রুদের অনেককেই তিনি বঙ্গবন্ধুর গলায় মালা দিতে দেখেছেন, আবার মৃত্যুর পর দেখেছেন অন্য চেহারায়। এসব তথাকথিত 'বড়'দের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ। প্রফেসর ইসলামের দৃঢ় জবাব, 'বঙ্গবন্ধু জাতির জনক। ইতিহাস মূল্যায়নে ভুল করেনা।'

জীবনে তিনি বহুবার ঠকেছেন ; কিন্তু ঠেকেননি। বঞ্চিত হয়েছেন, ব্যর্থ হননি। চক্রান্তের তাবৎ জাল ছিঁড়ে এগিয়ে গেছেন। খ্যাতি তাঁকে আড়াল করেনি। বরং খ্যাতিকে আড়াল করেই তিনি দাঁড়িয়েছেন। পুঁজি করেছেন শ্রম এবং কর্মকে, সুনামকে নয়।

দেশের চিকিৎসা সংকট প্রসঙ্গে প্রফেসর নুরুল ইসলাম বললেন, 'এ সংকট সকল সংকটের সাথে সংযুক্ত। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সমস্যা নেই। এজন্যে সব মহলের সহযোগিতার প্রয়োজন। তবে একজন ডাক্তারকে অবশ্যই দুঃস্থ মানুষের আর্তনাদ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। সততা, সদিচ্ছা ও কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলে সমস্যা অবশ্য লাঘব হয়। এটা মনুষ্যত্বেরও দাবী।'

'চিকিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য আপনার সুপারিশ জানতে চাই।'

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রফেসর নুরুল ইসলাম জানালেন, 'যারা উপযুক্ত হবার উপযুক্ত, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।' এ ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেছেন অনেক আগেই। বলেছেন, দেশের সকল মসজিদ-মন্দিরে ইমাম পুরোহিতদের প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত করা যায়। স্কুল শিক্ষকরাও এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। অবসর সময়ে স্কুল এবং উপাসনালয়গুলোকে সাময়িক চিকিৎসালয় হিসেবে ব্যবহারের কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন সম্মেলন-সেমিনারে তিনি এ

ব্যাপারে সরকার ও জনগণকে অবহিত করেছেন।

তরুণ চিকিৎসকদের বিদেশে পাড়ি জমাবার বিষয়ে তিনি বলেন, 'অর্থের চেয়ে মানুষের স্বীকৃতি বড়। ইচ্ছে থাকলে যে কোন ডাক্তার দেশেই বেশ উপার্জনের সুযোগ পেতে পারেন।' ডাক্তার ধর্মঘটের প্রশ্নে তাঁর অভিমত হচ্ছে, 'ধর্মঘটের প্রয়োজন হতে পারে, তবে দায়িত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে নয়।'

প্রফেসর ইসলাম 'জাতীয় ওষুধনীতি'কে প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে অভিহিত করেন। তাঁর ভাষায় 'রাষ্ট্রপতি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সদিচ্ছা থাকলে যে কোন শুভ উদ্যোগ সফল হতে পারে — এটা তারই প্রমাণ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা সংহত করার জন্য তিনি বলেন, 'নিজের ঘর নিজেকে সামলাতে দেয়া উচিত।'

কথা হচ্ছিলো পি. জি. হাসপাতালে তাঁর চেম্বারে। একটি আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য স্মিত হেসে চলে গেলেন।

মানুষকে মূল্যায়ন করার কোন গজকাঠি নেই। কীর্তি দিয়েই কৃতীকে বিচার করত হয়। এ দায়িত্ব ইতিহাসের। আমরা শুধু মানুষ নুরুল ইসলাম সম্পর্কে দু' চার কথা বলতে পারি। আমরা দেখেছি, শত কর্মের ভিড়েও তিনি প্রশান্ত। কায়িক ও মেধাগত শ্রমে অবয়বে একটি ভিন্ন জাতের সৌন্দর্যের উদ্ভাস। প্রজ্ঞার প্রকাশ তাঁর উচ্চারণ ও আচরণে। আড়ম্বর ও বাহুল্য-বর্জিত একটি সারল্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব সদা সজীব।

সুখী গৃহকোণে তিনি অবসর খুঁজে পাননা। যদি পান, তাও কাজেই কেটে যায়। অর্থাৎ পড়েন। বই তাঁর বন্ধু। চলন্ত যানেও একটা বই চাই। এরই ফাঁকে অসংখ্য নিবন্ধ লিখেছেন দেশী-বিদেশী জার্নালে, কাগজে। পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে একাধিক। এখনও লিখে চলছেন সমানে।

আমরা বলবো ঃ এই নিরন্ন মানুষের দেশে, অপুষ্টি, খরা-জরা-ব্যাধির দেশে প্রফেসর ইসলামের মতো প্রজ্ঞাবান চিকিৎসক বড় প্রয়োজন।

আমাদের প্রার্থনা, তিনি দীর্ঘজীবী হোন, সুস্থ থেকে আমৃত্যু মানুষের স্বাস্থ্যের সপক্ষে কাজ করে যান। চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রফেসর নুরুল ইসলামের প্রজ্ঞা বিস্তারিত হোক উত্তরসূরীদের মাঝে — এটাই প্রত্যাশা।

১৭-২-১৯৮৬ সাপ্তাহিক সন্দীপ অমর একুশে সংখ্যা হতে মুদ্রিত।

চিকিৎসা বিদ্যায় বাংলা

আমার দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন, যারা ইংরেজী লিখতে, পড়তে বা বুঝতে পারেনা তারাও কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে। রোগের কাহিনী বর্ণনা করে। রোগের লক্ষণ আমরা তাদের কাছেই শুনি। এখানে কোন বিদেশী ভাষার অস্তিত্ব নেই।

মনে পড়ে ১৯৬৬ সালের কথা। বাংলা একাডেমী একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেব ছিলেন প্রধান অতিথি। আর আমি ছিলাম বিশেষ বক্তা। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সর্বস্তরে বাংলা ভাষা। আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রাণবন্ত ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার আলোচনায় অনেকেই হয়ত অবাক হয়েছিলেন। এমন বিদঘুটে কঠিন শব্দ, যেগুলো বহুলাংশে গ্রীক থেকে উৎপত্তি, তার বাংলা তরজমা কি করে সম্ভব আপাতঃদৃষ্টিতে ধারণাটা নিছক অমূলক মনে হবেনা। তবে আরো একটা দিক আছে সাধারণভাবে যেটাকে আমরা ভুলে যাই।

ইংরেজীতে আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতি একটা বিশ্বাস, একটা আসক্তি স্বাভাবিক। ধারাবাহিকভাবে ধরতে গেলে ভাষার প্রতি মানুষের মনোবৃত্তি জীবনের গতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমার জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলায়। শহরে নয় ; অজপাড়াগাঁয়ে। শহর থেকে ২০/৩০ মাইল দূরে, আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে। চট্টগ্রামের একটা আঞ্চলিক ভাষা আছে। অনেকের কাছে সেটা 'গ্রীক'। আমি বলি সে আমার মায়ের ভাষা।

বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের যুগে অনেক অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতেরও অনেক সম্ভাবনা। আমরা জানি শক্তির বিলুপ্তি ঘটে না, রূপান্তর হয়, অনেক শক্তি বিশেষ বিশেষ অবস্থান নিয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির অগোচরে থেকে যায়। মনোভাষাবিজ্ঞান অধুনা ধ্বনি ও স্নায়ুবিক সংবেদনা সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদঘাটন করেছে।

যাই হোক, আঞ্চলিক ভাষা থেকে বাংলা ভাষা, বিশেষ করে আমরা চট্টলবাসীরা যাকে 'শুদ্ধ ভাষা' বলি, আমাদের আয়ত্তে আসে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে। জন্মের শুরু থেকে না হলেও এটা জীবনের শুরু হতে। ভাষার দিক দিয়ে তারতম্য অনেক সংকীর্ণ। শুধু তা নয়, আমরা যখন বুঝতে শুরু করি তখন থেকেই এ ভাষার সংশ্রব, উপলব্ধির জন্ম। তাহলে গোড়া থেকেই আমার আঞ্চলিক ভাষা আর তথাকথিত 'শুদ্ধ ভাষা' — এ দুয়ের ব্যবধান সেখানে আর

থাকে না। দুটো আমার কাছে একই। শুদ্ধ সুর, শব্দ এবং সংযোজনের যতটুকু তফাৎ। মোটকথা, যাকে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় 'শুদ্ধ ভাষা' বলি সেটাও আমার মায়ের ভাষা, আমার মাতৃভাষা, আমার অনুভূতির ভাষা, উপলব্ধির ভাষা।

ক্রমাগত স্কুল জীবনে এগিয়ে চলি। সপ্তম শ্রেণী থেকে আরও নতুন চাপ। ইংরেজীর বোঝা বেশি, তার সাথে কারও আরবী, কারও ফারসী, কারও পালি, কারও বা সংস্কৃত ইত্যাদি। আমি মুসলমান, তাই স্কুলের দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আরবীর পথ নিয়েছিলাম। ইংরেজী বাধ্যতামূলক।

চার/পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি। মৌলভী সাহেবের কাছ থেকে আরবী শেখার শুরু। হরফ চেনা আর আরবী পড়তে পারা যেন প্রত্যেকটা মুসলমান ছেলের জন্যে অপরিহার্য। অর্থ বুঝার বালাই নেই। পড়তে পারলেই যেন সব। যিনি পড়ান তিনিও বুঝেননা। দু-একটা ব্যতিক্রম এখানে থাকতে পারে। তাহলেও বা কিছু আসে-যায় না। শিক্ষার্থীর বেলায় তার প্রয়োগ নেই। পরবর্তী পর্যায় কেউ যদি ধর্মীয় শিক্ষায় আগ্রহী হয় সেটা আলাদা কথা। তবে হ্যাঁ, তাদের বেলায়ও মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষা, ইংরেজী ভাষা তথা বিদেশী ভাষা সব কটির বিসর্জন। সে যাই হোক, আসল কথায় ফিরে আসা যাক। স্কুলের সেই সপ্তম শ্রেণীর দ্বিতীয় ভাষা আরবীর কথা বলছিলেম। পড়তে অসুবিধা ছিলনা। আস্তে আস্তে কিছুটা শাব্দিক অর্থ, কিছুটা অনুবাদ শিখে ম্যাট্রিক বা এনট্রান্স পরীক্ষা পাস। এখানেই এর সমাপ্তি। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে এটাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কোন দূরদর্শিতা বা পারদর্শিতার জন্য নয়। নেহাত বাধ্যতামূলক ছিল বলেই এই শিক্ষা পরীক্ষা পাসের এবং কিছুটা কৃতিত্বের সহায়ক ছিল সন্দেহ নেই। ধর্মীয় এবং কর্মজীবনে এর প্রভাব কতটুকু তা আমি নিজেও ভেবে পাই নাই।

শুরু থেকে যদি শব্দার্থ বুঝা যেতো তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে লাভবান হতাম তা সহজেই অনুমান করা যায়। গলব্লাডারকে পিত্তথলি বললে আমি বুঝতে পারি এটা একটা থলির মতো আর এখানে পিত্ত থাকে ; তৈয়ার হয় না। কিডনিকে আমি যদি মূত্রকোষ বলি তাহলে বুঝতে পারি ওঠা মূত্র তৈরির কারখানা, তেমন মূত্রাশয় বা মূত্রথলি ইউরিনারি ব্লাডার-এর মত একটা থলিকে বুঝায় যেখানে মূত্র জমা হয়, তৈরি হয় না।

মোটকথা, আমি বলতে চাই আরবী তথা কোন ভাষা শেখাই শিক্ষার বিপক্ষে যেতে পারে না। বিপক্ষে যায় শিক্ষার সময়সীমা এবং পদ্ধতির যৌক্তিকতা ব্যাহত হলে। খেয়াল রাখতে হবে যে ভাষার প্রয়োগ আমাদের কর্ম ও ধর্ম এই দুই পরিধিতে। কর্মজীবনের জন্য ব্যবহারিক আরবী শিক্ষা যেমন প্রয়োজন, ধর্ম বিষয়ে তেমন উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষার্থীরা এ দুটোর একটিকে

...ersity of Scienee & Technology Chitta...
9580
CENTRAL LIBRARY

বেছে নিতে পারে।

এবার বাধ্যতামূলক তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজীর কথা বলি। জীবনে এর প্রভাব ছিল অনেক। পরম শ্রদ্ধেয় হেডমাস্টার সাহেব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন উচ্চশিক্ষা পেতে হলে ইংরেজীতে পারদর্শিতা থাকতেই হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার হিসাবে আমার সেই প্রধান শিক্ষকের জীবনে শাসকচক্রের অনেক নির্যাতন এসেছে। জেলে থাকতে হয়েছে। তিনিও ছিলেন ইংরেজীর অনুরাগী। কারণ এ ছাড়া অন্য উপায় ছিলনা। বৃটিশ শাসন আমলে মুসলমানদের ইংরেজী বর্জন স্যার সৈয়দ আমীর আলীর পূর্ব সময়কার ইতিহাসের শিক্ষা হয়ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এটা একটা বিদেশী ভাষার প্রতি তাঁর আসক্তি বুঝায় না, প্রয়োজনের উপলব্ধি বুঝায়। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং পিতৃসুলভ প্রভাবে অজগ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শিখেও ভাগ্যবান শহুরে ছেলেদের চেয়েও আমরা এ ভাষায় তেমন দুর্বল ছিলাম বলা যায়না। স্কুল থেকে কলেজ, মেডিকেল কলেজ। এখানে শিক্ষার বাহন মূলত ইংরেজী হলেও অন্য ভাষার প্রভাব এবং সংমিশ্রণ ছিল প্রচুর। ল্যাটিন এবং গ্রীক শব্দে চিকিৎসা শাস্ত্র ভরপুর। প্রথম বর্ষে এনাটমী অস্থিমজ্জা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দাঁতভাঙ্গা নাম বুঝা দূরে থাকুক বানানের দিক দিয়েও ছিল জটিলতা। শুরুতে মনে হয়েছিল এ অসম্ভব। ক্রমে ক্রমে বুঝি আর না বুঝি এগুলো মুখস্থ এবং কণ্ঠস্থ করি, যেমন স্টারনোক্রীডোমাস্টয়ড` ফলক্স চেরিব্রাই, টেনটোরিয়াম চেরিবেলাই, কডাইকুইনা, ফোরামেন ম্যাগনাম, আরও কত কি। ফিজিওলজীর শব্দগুলো কমবেশি হলেও একই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম বর্ষ আর দ্বিতীয় বর্ষে রোগীর সাথে সংশ্রব ছিলনা। ইংরেজীতে লেখাপড়া। পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব, পরীক্ষা পাস ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করেনি। যেমন করেই হোক যা শিখেছি তার উপর নির্ভর করে সে একই ভাষায় পরীক্ষার ভাষার রূপান্তর এবং পরীক্ষার প্রশ্নের জবাব দিয়েই সারা। জবাব সঠিক হলে পরীক্ষায় পাস, উন্নতমানের হলে কৃতিত্ব। তৃতীয় বর্ষ থেকেই রোগীর সংশ্রব। এরা কারা? আমার দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন যারা ইংরেজী পড়তে, লিখতে বা বুঝতে পারেনা তারাও কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে। রোগের কাহিনী বর্ণনা করে। রোগের লক্ষণ আমরা তাদের কাছেই শুনি। এখানে কোন বিদেশী ভাষার অস্তিত্ব নেই। ইংরেজী তাদের একটা শোনা ভাষা, জানা ভাষা নয়। ইংরেজ এবং ইংরেজী শুধু এ দুটোর সাথেই তারা অনেকেই পরিচিত। সকলে নয়। আমি যতই ইংরেজী জানি না কেন, চিকিৎসক হিসাবে যতই পারদর্শী হই না কেন, তাদের এবং আমার মাঝখানের ভাষা ইংরেজী নয়। বিদেশী কোন ভাষা নয়। লেখাপড়া জানা একজন শিক্ষিত রোগীর জানা একটা বিদেশী রাষ্ট্রীয় ভাষা নয়। যে

ভাষায় তারা কথা বলে, বুঝতে পারে, ভাবের আদান-প্রদান করে, সেই ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা। এখনও রোগীর ইতিহাস নিতে যেখানে আমি বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাই না তাদের কাছে সেটা শুনতে পাই। টাইফয়েড তাদের কাছে অবিরাম জ্বর। টিটেনাস তাদের কাছে ধনুষ্টংকার, এনিমিয়া তাদের কাছে রক্তহীনতা, চিকেনপক্স তাদের কাছে জলবসন্ত, ডায়াবেটিস তাদের কাছে বহুমূত্র হুপিংকফ তাদের কাছে লতাকাশ। মোটকথা, তাদের দুঃখ কষ্টের রোগের কথা তারা তাদের ভাষায় বলে। সে ভাষা বুঝবার ভাষা। বুঝা আর উপলব্ধি করা এ দুয়ের সংমিশ্রণে এর উৎপত্তি। ধনুষ্টংকার ধনুকের সাথে সামঞ্জস্য বুঝায়। এ রোগে শরীরের আকৃতিক পরিবর্তন বুঝায়। রোগী ধনুকের আকার ধারণ করে বলেই এই নাম। বহুমূত্র শব্দটা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখেনা। ঘন ঘন প্রস্রাব অর্থাৎ বহুবার মূত্র নির্গমন এর লক্ষণ। তাই এটা বহুমূত্র। জলবসন্তে জল আছে। প্রথমে গায়ে যখন দানা বের হয় সেটা জল বা পানিতে ভর্তি। তাই এর নাম জল বা পানিবসন্ত।

লতাকাশে লতা নেই, তবে কাশিটা লতার মতন। একটানা লতার মত, এখানে একটানা কাশ, তাই এটা লতাকাশ। এখন যদি বলি ডায়াবেটিস, টিটেনাস, হুপিং কফ, চিকেনপক্স আর অন্যজন যদি বলে বহুমূত্র, ধনুষ্টংকার, লতাকাশ তাহলে তফাৎ কি? সেটা সহজেই ধরা পড়ে। শুধু তা নয়, এগুলো এমন শব্দ যেগুলো পরিচিত। এমন কথা, যেগুলো আমাদের জানা। এখানে স্কুলে পড়াশুনা কিংবা পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়না। এখানে আমার মায়ের ভাষার যথার্থ প্রয়োগ এবং বোঝাপড়ায় এর প্রয়োজনীয় ব্যবহার। যে শিক্ষা আমরা এখন গ্রহণ করি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে ভাষা আমাদের বাহন এ দুটো ভিন্নমুখী। এখানে শুধু শক্তির অপচয় নয়, প্রয়োগে কখনো কখনো বাধার সৃষ্টি হয় বৈকি। ফলে শুধু যোগাযোগ বিঘ্নিত হয় না, ভাষার সংযুক্তিতেও ব্যাঘাত ঘটে।

আরও একটা দিক আছে। যেমন ধরুন চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাকালীন সময় আমি শিখেছি গলব্লাডার, কিডনি, ইউটারাস, ইউরিনারি ব্লাডার আরও অনেক। নামগুলো মুখস্থ করেছি। কিন্তু শুরু থেকে যদি শব্দার্থ বুঝা যেতো তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে লাভবান হতাম, তা সহজেই অনুমান করা যায়। গলব্লাডারকে পিত্তথলি বললে আমি বুঝতে পারি এটা একটা থলির মত আর এখানে পিত্ত থাকে। তৈয়ার হয় না। কিডনিকে আমি যদি মূত্রকোষ বলি তাহলে বুঝতে পারি ওটা মূত্র তৈরির কারখানা, তেমন মূত্রাশয় বা মূত্রথলি ইউরিনারি ব্লাডার-এর মত একটা থলিকে বুঝায় যেখানে মূত্র জমা হয়, তৈরি হয় না। বাচ্চাদানী এটা অতি পরিচিত নাম। অতি সহজে বুঝায় যায় এটা কি। কিডনিকে কেউ কেউ বৃক্ক বলেন। এটা আমি সমর্থন করি না। আগেই ইংগিত দিয়েছি এটা মূত্র তৈরির কারখানা বা মূত্রকোষ। শেষোক্ত নাম উৎপত্তি এবং

উদ্দেশ্য দুটোই বুঝায়। অর্থাৎ যে শব্দ তার উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য বুঝাতে সক্ষম সেটা ভাব প্রকাশে সাহায্য করতে পারে সবচেয়ে বেশি। এটা শুধু শাব্দিক অর্থকেই বুঝায়না। এটা অনুভূতিরও সৃষ্টি করে। যে শব্দ কিংবা কথামালা আমার স্নায়ুতন্ত্রে প্রথম আলোড়ন কিংবা অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল, সেটা আমার কাছে একটা শব্দ নয়, শব্দের তরঙ্গ নয়, একটা অনুভূতির উপকরণ। যতদিন ইংরেজী ভাষা বা যে কোন বিদেশী ভাষার প্রতিশব্দ আমরা খুঁজে না পাই ততদিন সেটা ব্যবহার করা তার প্রতি অনুরাগ বুঝায়না। এটা প্রয়োজনের তাগিদে।

একটা শব্দ নয়, শব্দের তরংগ নয়, একটা অনুভূতির উপকরণ। এটা সোজা কথায় আমার মজ্জাগত। অতি সহজে এটার উদাহরণ মিলে। মুসলমানদের কাছে পানি যে অনুভূতির সৃষ্টি করে হিন্দুদের কাছে জল তাই করে। মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ের কাছে উভয় শব্দ পরিচিত। জন্মলগ্ন থেকে যেটার সাথে পরিচিত সেটার সাথে তাদের সম্পর্ক নিগূঢ়। এটা একটা অনুভূতির ব্যাপার। শুধু প্রকাশ করার নয়; বাংলায় নতুন শব্দ সৃষ্টি করার প্রয়োজন সম্পর্কিত বক্তব্য আসতে পারে।

আবার গোড়ার দিকে ফিরে যাওয়া যাক, আমার চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক বিদেশী শব্দ আমরা আয়ত্ত করি। কেউ কেউ পারদর্শিতার প্রমাণ দিই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অবদান কতটুকু বিচার করে দেখা যাক। উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা ছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষার কথা বাদ দিলে মোটামুটিভাবে প্রায় সবখানে এর ব্যবহার সীমিত। ভোর বেলায় ক্লাস, সকাল বেলায় হাসপাতাল, আর বিকালে চেম্বার, যাদেরকে নিয়ে আমার পেশা তারা যে ভাষায় কথা বলে সেটা তাদের নিজেদের ভাষা। এ দেশের ভাষা, আমাদের ভাষা, মাতৃভাষা 'বাংলা ভাষা'। চিকিৎসক হিসাবে কোন একটা বিশেষ লক্ষণের বাংলার প্রতিশব্দ আমরা যেখানে খুঁজে পাই না, সেটা তাদের জানা আছে। অন্যটা তাদের জানা নেই বলে প্রয়োজনের তাগিদে ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে এ শব্দের উৎপত্তি। বিদেশী ভাষার প্রয়োগ এখানে সীমিত। অন্যদিকে তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেতে পারি।

এবার ছাত্রদের কথা ধরা যাক। কোন একটা জটিল বিষয় তাদের বুঝাতে হলে আমরা মাতৃভাষার আশ্রয় নিই। কেউ কেউ বলতে পারেন এটাকে ভাষা বলা যায় না। ইংরেজী এবং বাংলার সংমিশ্রণে এটা জগাখিচুড়ি। আমি বলি, যে যাই বলুন, এটা বিদেশী ভাষা নয়, মূলত বাংলা ভাষা এবং প্রয়োজনবোধে বিদেশী ভাষার সংমিশ্রণ। এখন বলুন তাও বা কেন হবে। আমি বলি, হতে বাধ্য। যতদিন ইংরেজী ভাষা বা যে কোন বিদেশী ভাষার প্রতিশব্দ আমরা খুঁজে না পাই ততদিন সেটা

ব্যবহার করা তার প্রতি অনুরাগ বুঝায় না। বাংলাদেশের চেয়ে ছোট দেশের বেশ কয়েকটিতে নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন ইরান, ইরাক, তুরস্ক, জার্মানী, মিশর ইত্যাদি। চীন, রাশিয়া এবং জাপানে নিজের ভাষা শিক্ষার মাধ্যম। মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা একটা কল্পনা নয়, বাস্তব।

উচ্চশিক্ষার খাতিরে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে, গবেষণার খাতিরে উন্নত দেশের ভাষা আমাদের জানতে হবে। সেটা ইংরেজী হবে এমন কথা নেই।

একটা বৈদেশিক ভাষা মাতৃভাষার সম্পূরক হতে পারে — স্থান দখল করতে পারেনা।

এটা প্রয়োজনের তাগিদে। সচেষ্ট হলে, আন্তরিকতা থাকলে প্রতিশব্দ আমরা কেন খুঁজে পাব না, তা ভেবে পাই না। মনে পড়ে ১৯৫৮/৫৯ সালের কথা। বাংলা একাডেমী সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ এনামুল হকের নেতৃত্বে যে 'পরিভাষা কমিটি' গঠন করেছিল, আমি এর একজন মনোনীত সদস্য ছিলাম। কমিটি অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছিল। ইংরেজী চিকিৎসা বিষয়ক অভিধানে 'এ' থেকে 'ই' পর্যন্ত আমরা প্রতিশব্দ সঞ্চলন করি। এর পরিণতি এবং ভাষার এদিক দিয়ে অগ্রগতি হয়তোবা কিছু হয়েছে। বাংলা ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রে বিক্ষিপ্তভাবে দু'-একটা বইও প্রকাশিত হয়েছে। এক আধটা সাময়িকী কিছুদূর এগিয়ে চলেছে। তবে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী চিকিৎসাশাস্ত্রের উপযুক্ত পুস্তক এখনো প্রকাশিত হয়নি বললে চলে। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, এ ধরনের পুস্তক প্রকাশনায় কয়েকটা জটিল দিক আছে। সীমিত বাংলা ভাষাভাষী এর গ্রাহক। চাহিদা অনুসারে ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। কোন একটা উঁচুমানের ইংরেজী বই-এর বাংলা তরজমা এবং প্রকাশনায় যে সময় লাগে সে সময়ে এ বিশেষ বই-এর নতুন সংস্করণ, নতুন তথ্য নিয়ে বাজারে চলে আসে। বাংলা প্রকাশনা এখানে পিছিয়ে থাকে। প্রগতিতে প্রতিকূল অবস্থা, আর্থিক দিক দিয়ে নাজুক পরিস্থিতি চিকিৎসা শাস্ত্রে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার অন্তরায়। সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে সরকার এবং প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এর সুরাহা করা সম্ভব। প্রথম সংস্করণের সাথে নতুন তথ্য 'এডেনডাম' বা পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজন করলে সময়ের গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশনার আধুনিকীকরণ সম্ভব। বাংলাদেশের চেয়ে ছোট দেশের বেশ কয়েকটিতে নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় যেমন ইরান, ইরাক, তুরস্ক, জার্মানী, মিশর ইত্যাদি। চীন, রাশিয়া এবং জাপানে নিজের ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম। মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা একটা কল্পনা নয়, বাস্তব। অন্য দেশে যা সম্ভব হয়েছে তা এখানেও সম্ভব। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে চিকিৎসা শিক্ষায় বহুলভাবে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি সেটা

বাংলা। সাংগঠনিক রূপ দিয়ে আইনের কাঠামোতে ফেলে বাস্তবতার অনুসরণ করা এই যা দরকার।

প্রায়ই একটি প্রশ্ন তোলা হয় ইংরেজী ভাষাকে কি তাহলে আমরা বিসর্জন দেব? উত্তরে বলবো — প্রশ্নটাই অবান্তর, মাতৃভাষা আমাদের মায়ের ভাষা, অনুভূতির ভাষা, সর্বস্তরের জনগণের ভাষা। এ ভাষায় আমরা কথা বলি, চিন্তাভাবনা করি, আমরা স্বপ্ন দেখি। এ ভাষা আমাদের প্রাণের, মনের, জীবনের। বিদেশী ভাষা আমাদের শিখবার ভাষা, জানবার, মেলামেশার ভাষা, আদান-প্রদানের ভাষা। বৈজ্ঞানিক প্রগতি দেশ-বিদেশের গবেষণার পরিস্থিতি, যে কোন স্তরের অগ্রগতি সরাসরি জানতে হলে ভাষা অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আমি ইংরেজী জানি বলে দুনিয়ার যে কোন ইংরেজী ভাষা-ভাষীর সাথে আলাপ আলোচনা সম্ভব। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত যে কোন তথ্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা আমার পক্ষে সম্ভব। বিদেশে উচ্চ শিক্ষালাভ একই কারণে আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

একইভাবে যিনি জার্মান, রাশিয়ান বা অন্য কোন ভাষা জানেন সেইসব দেশে তাঁর উচ্চশিক্ষা সম্ভব। মোটকথা উচ্চশিক্ষার খাতিরে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে, গবেষণার খাতিরে উন্নত দেশের ভাষা আমাদের জানতেই হবে। সেটা ইংরেজী হবে এমন কোন কথা নেই। এক বা একাধিক ভাষা জানা আমার প্রয়োজনের তাগিদ। এটা কৃতিত্বও বহন করে বৈ কি। অবশ্য মাতৃভাষাকে অবহেলা করে নয়। একটা বৈদেশিক ভাষা মাতৃভাষার সম্পূরক হতে পারে, স্থান দখল করতে পারেনা।

সাপ্তাহিক সন্দীপ অমর একুশে সংখ্যা ১৭-২-১৯৮৬ সংখ্যা হতে মুদ্রিত।

আমাদের চিকিৎসা সমস্যা

১. একটি উন্নয়নশীল দেশের চিকিৎসা–ব্যবস্থার রূপ ও কাঠামো কিরূপ হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

২. আমাদের দেশের বর্তমান চিকিৎসা–ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

৩. বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসা–ব্যবস্থার সফলতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

৪. বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলো চিকিৎসা–ব্যবস্থাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে আপনি মনে করেন?

৫. সরকারী ডাক্তারদের সাধারণ প্র্যাকটিস প্রসংগে আপনার বক্তব্য কি?

৬. চিকিৎসা–বাজেটে প্রচলিত বিভিন্ন চিকিৎসা–পদ্ধতির মধ্যে একটা বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে — এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৭. আমাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন চিকিৎসা–পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয়সাধন কিভাবে সম্ভব?

৮. জনগণের জন্য প্রয়োজন সহজলভ্য চিকিৎসা–ব্যবস্থা। কিভাবে এর বাস্তবায়ন সম্ভব?

নিম্নে প্রদত্ত উত্তর সন্নিবেশিত হলো।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম
পরিচালক
আই. পি. জি. এম. আর., ঢাকা

১. যে–কোন দেশের চিকিৎসা–ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে সকলেই উপকৃত হয়। চিকিৎসা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিশেষের হতে পারেনা। এটা সকলের জন্য। এবং রোগ–প্রতিরোধ করাই উত্তম। কেহ রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা একটা জন্মগত অধিকার। এ দায়িত্ব রোগীর একার নয়। তার পরিবারের, সমাজের তথা জাতির। নানা কারণে যথোপযুক্ত উন্নতমানের চিকিৎসা–ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশে সব সময় সম্ভব হয়ে উঠেনা। সমস্যা অনেক। অনেক উন্নয়নশীল দেশের রোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যা এবং আর্থিক সংগতি এবং উপযুক্ত চিকিৎসাও একটি দেশে সমন্বয়ের অভাব নয়, বিরাট বৈষম্য থাকার ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুষম ব্যবস্থা সম্ভব হয়ে উঠে না। তবে চিকিৎসা–ব্যবস্থার অজুহাত দিয়ে রেহাই পাওয়ার কিছু নেই। প্রতিবন্ধকতার মাঝখানেও ন্যূনতম সুযোগ সবাইকে দিতে হবে। সে হিসেবে সামর্থের সুষম বণ্টনের প্রয়াসে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে নিতে হবে।

২. এক কথায় বলতে গেলে বর্তমান চিকিৎসা–ব্যবস্থা এবং এর প্রয়োজনীয়তার মাঝখানে কোন সামঞ্জস্য নেই। বরং জনস্বার্থের প্রতিকূলে এর কারণ খুঁজে বের করা কঠিন নয়। ঔপনিবেশিক আমলের চিকিৎসা ছিল শহরকেন্দ্রিক। এক যুগ পরেও আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। অতীতের ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে অনেক। এখনও দিয়েই যাচ্ছি। একদিকে যেমন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, অন্যদিকে ভয়াবহ শিশু–মৃত্যুর হার জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রথম এবং প্রধান অন্তরায়। ১৯৫৬ সালে দেশের জনসংখা যেখানে ছিল ৫ কোটির নিচে, প্রায় ত্রিশ বছর পর সেটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই হাজার সালের মধ্যে এটা ত্রিগুণ হবে। এমন ভাবতেও যে–কোন লোক শিউরে উঠবে। এমন একটা ভীতিকর জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে। কথাগুলো অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে তুলে ধরা অপরিহার্য। স্বাস্থ্য অর্থই হলো সামাজিক, শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা, তাই যদি হয়, সামাজিক পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা–ভাবনা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারেনা। চিকিৎসার দায়িত্ব এখানে শুধু একজন পেশাগত কর্মী হিসেবে নয়, সামাজিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবেও। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা সোজা কথায় বলতে গেলে এমন জনশক্তি তৈরি করে যারা ওষুধ আর অসুখ এ দুটোকেই শুধু চিনে। এর মূল কারণ সম্বন্ধে চিন্তা–ভাবনার, প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ বা ব্যবস্থা নেই। যাদের আমরা চিকিৎসক বলি, সামাজিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে তাদের অবদান এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জনসাধারণকে সৎপথে পরিচালনা, এর কোনটাই যতটুকু হবার ততটুকু হয় না।

বর্তমান চিকিৎসা–ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে শহরকেন্দ্রিক এবং বহুলাংশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মোটামুটিভাবে সবদিক দিয়ে আগে যেমন বলেছি ওষুধ আর অসুখ নিয়ে মেডিকেল কলেজগুলো বিরাট অট্টালিকার চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ। চাকুরি–জীবনে এবং পেশাগত জীবনে শহর থেকে গ্রামে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখলে অনেকেই শংকিত হয়। ফলে সাম্প্রতিককালে গ্রামে–গঞ্জে আমরা যে চিকিৎসার সুযোগ দেয়ার প্রয়াস নিয়েছি তা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা হাসপাতাল, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চিকিৎসা কেন্দ্র প্রত্যেকটি যেন চিকিৎসা দেয়া নয়, পাওয়ার উপযুক্ত। হয়তো বা সরকারী তালিকায় আধ–ডজনখানেক ডাক্তারের নাম আছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কোথায়ও বা কেউ আছে, আর কোথাও বা নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে — দায়ী কে? এক কথায় বলব, বর্তমান চিকিৎসা–ব্যবস্থা। ছোট্ট বেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম — "যেখানে স্নেহের বন্ধন নেই, প্রাণের টান নেই, সেখানে কথায় কথায় আবদার করলে শুনবে কে?" আজকে আমরা যাদের চিকিৎসক হিসেবে শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছর বছর তৈরি করছি, গ্রামের সাথে তাদের সম্পর্ক কি? শহরে

পরিবেশে লালিত হয়ে গ্রামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। নানা উপজেলা এবং থানা চিকিৎসাকেন্দ্রের কথা একটু আগে যা বলেছি, সেখানকার সীমিত সুযোগ-সুবিধা চিকিৎসকদের অনীহার অন্যতম কারণ হলেও প্রধান কারণ নয়। এটা এমন একটা পরিবেশ, যেটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ; একেবারে অজানা, অচেনা। দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে এখানে এমন একটা পরিবেশে আসার কিংবা কাজ করার কোন সুযোগ-সুবিধা বা পাঠ্যক্রম নেই। শিক্ষাকালীন সংস্পর্শ একটা সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এটা থেকে তারা বঞ্চিত। সাম্প্রতিককালে অনেক উন্নয়নশীল দেশে চিকিৎসা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এতে করে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় জনশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। শুধু মেডিকেল গ্রাজুয়েট তৈরি না করে বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসক তৈরি করে তারা তাদের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য-কর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, পরবর্তী পর্যায়ের সহকারী চিকিৎসক, সেবিকা, নানা ধরনের কৌশলীর মাধ্যমে চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করেছে। চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণকালে উপজেলা কিংবা গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় জড়িত করার ফলে সৃষ্ট সম্পর্ক পরবর্তীকালে ভয়-ভীতি, কিংবা অনীহা সৃষ্টি করেনা। বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থায় অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা এখনও দানা বেঁধে উঠেনি। তবে যে কিছুসংখ্যক দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং সরকার এ বিষয়ে কিছুটা ওয়াকিফহাল এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। আশা করব সমস্যা সমাধানের পর্যায়ে থাকতে থাকতেই আমরা যেন এর একটা সুরাহা করি।

৩. বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকতেই হবে। এটা কোন দ্বিমতের অপেক্ষা রাখেনা। উন্নয়নশীল দেশের কোন সরকারের পক্ষে চিকিৎসা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয়া সম্ভব বলে আমি মনে করিনা। তবে বর্তমান বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসাব্যবস্থা, বাংলাদেশে যেটা প্রচলিত, তার সফলতা কতটুকু নিরপেক্ষভাবে তা বিচার করে দেখতে হবে। শুধু মুনাফা লাভের আশায় নার্সিংহোম প্রতিষ্ঠা ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাতে পারে, কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবস্থায় তেমন অবদান রাখতে পারে বলে মনে হয়না। সমকালীন চিকিৎসা ক্ষেত্রে এগুলো সরকারী প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কিছু সংখ্যক সরকারী চিকিৎসকের দৃষ্টি এদিকে যেন তুলনামূলকভাবে বেশি। এটা স্বীকার করতে হবে, এটা একটা আর্থিক আকর্ষণ। চিকিৎসা ব্যবস্থায় এর অবদান কতটুকু তা ভেবে দেখার মত। যে শক্তি এবং দক্ষতা অসহায় দরিদ্র রোগীদের জন্য ব্যবহার করা উচিত তা নীতি বহির্ভূত হয়ে স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান রোগীর জন্য কেউ ক্লিনিকে ব্যবহার করে, তাহলে নিজ কর্মক্ষেত্রে অপরাধমূলক অবহেলার দোষে দোষী সে। বর্তমানে এমন একটা পরিস্থিতিই বিরাজ করছে।

শুধু তাই নয়, বরং বৃদ্ধির দিকে। এমন একটা অব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতেই হবে। আবার বলি, বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে সমস্যা মোকাবেলার সমাধান খুঁজে নিতে হবে। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত রাতারাতি হাজার হাজার ডাক্তার তৈরি করা যাবে না। যদি তাও হতো সামাজিক, পারিবারিক এবং আর্থিক কারণে তার সুষম বন্টন সম্ভব হতে পারে না। কোনদিনও হবে না। আমাদের নতুন করে ভেবে দেখতে হবে। চিকিৎসা-ব্যবস্থায় নিয়োজিত বিরাট জনশক্তিকে উপযুক্ত করে কাজে লাগাতে হবে। গ্রাম পর্যায়ে যে যেখানে আছে সেখানে কাজের সুবিধা করে দিতে হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত করতে হবে। এদিকে আমরা ভাগ্যবান — গ্রামে গ্রামে আমাদের অসংখ্য মসজিদ রয়েছে। প্রত্যেকটি মসজিদে একজন করে ইমাম আছে। স্বল্পশিক্ষিত হলেও কেউ অশিক্ষিত নয়। এই সকল ইমামকে কাজে লাগাতে হবে। বিগত এক বছর ধরে ইসলামিক মেডিকেল মিশন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগে গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসা-ব্যবস্থায় ইমামদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। ২/৩ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক আরোপিত এবং ওষুধনীতি-স্বীকৃত গ্রাম পর্যায়ে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সম্পর্কে ইমামদের প্রশিক্ষণ দেয়া এই কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তী পর্যায়ে প্রাথমিক স্কুল এবং গ্রামের অন্যান্য চিকিৎসকদের এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্বন্ধে ইসলামিক মেডিকেল মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তবে গ্রাম পর্যায়ে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সহজে বুঝা যায় এবং প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় এমন সব ওষুধ নিয়ে "গ্রাম পর্যায়ে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ" নামে একটা বইও প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত যাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা সীমিত হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বিস্তৃত। কর্মক্ষেত্রে তাদের বর্তমান পরিস্থিতি উৎসাহজনক বলতে হবে। মনে হয় জনগণের আস্থাভাজন এসব ইমাম নতুনভাবে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ফলে জনগণের মনে ধর্ম সম্পর্কে একটা নতুন ধ্যান-ধারণা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। মসজিদ শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য নয়, ইমামগণের দায়িত্ব শুধু নামাজ পরিচালনা হতে পারেনা, দৈনন্দিন মঙ্গলময় কর্মকাণ্ডে মসজিদের ব্যবহার এবং ইমামগণের অংশগ্রহণ এই নতুন কার্যক্রম জনগণের সামনে প্রতিফলিত করে। তা ছাড়া ইসলাম একটা সেবামূলক ধর্ম — তাও প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অনেক উন্নয়নশীল দেশে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে তাদের ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সেটা সম্বন্ধে অবহিত হলেও কার্যকর কোন ব্যবস্থা এতদিন গ্রহণ করা হয়নি। অথচ সেবার মূলমন্ত্র হিসেবে

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার কোন তুলনা হয়না। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ইমাম এবং মসজিদের অন্তর্ভুক্তি ইসলাম ধর্মেরই বিশেষ দিক প্রতিফলনে শুধু বিরাট সহায়ক হবে না, জাতীয় স্বাস্থ্য–ব্যবস্থায়ও অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৪. শুধু বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলোকে আলাদাভাবে ধরে নিলে তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। ব্যক্তিগতভাবে সকল ওষুধ কোম্পানীকেই আমি একসাথে বিচার করতে চাই। দেশী হোক আর বিদেশী হোক এগুলো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ব্যবসার দিকেই তাদের নজর। ব্যতিক্রমধর্মী জনসেবায় নিয়োজিত ওষুধ কোম্পানী ২/১ টা যে নেই এমন বললে ঠিক হবে না।

কোম্পানীর বলিষ্ঠ প্রচার মাধ্যম চিকিৎসা ক্ষেত্রকে প্রভাবান্বিত করে। বিভিন্ন রকম প্রচারের মাধ্যমে, বাজারে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানীর নানা চেষ্টার নামে অপচেষ্টার ফলে জনসাধারণ থেকে শুরু করে চিকিৎসক সমাজ পর্যন্ত সকলেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধরনের প্রলোভনের মাধ্যমে চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন লেখায় উৎসাহিত করা, শিক্ষিত জনসাধারণ এবং প্রশাসনকেও প্রভাবিত করা এগুলোর অন্যতম কাজ। ফলে অসংখ্য দরিদ্র ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ অসহায়ভাবে অযৌক্তিক ব্যবস্থাপত্রের শিকার হয়ে পড়ে। এতে তাদের মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষতি হয়। এ জন্য দায়ী শুধু ব্যবসায়ী মহল নয়, যারা ব্যবস্থাপত্র লেখেন তাঁরাও। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসা যাতে জনসাধারণের কল্যাণে আসে সেটা নিশ্চিত করা চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব। সীমিত আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপত্র একটি সামাজিক সংঘাত। এর প্রতিবিধান করা একটা জাতীয় কর্তব্য।

৫. সরকারী ডাক্তারদের সাধারণ প্র্যাকটিস প্রসঙ্গে বিভিন্ন ফোরামে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। সীমিতসংখ্যক বিশেষজ্ঞকে শুধু হাসপাতালে রোগী দেখায় সীমাবদ্ধ রাখলে বাইরের অগণিত জনসাধারণ, যারা হাসপাতালের সুযোগ–সুবিধা নানা কারণে গ্রহণ করতে পারে না, তাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখার বিষয়। উন্নতমানের কিংবা বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিকিৎসকের সংখ্যা বেসরকারী পর্যায়ে নিতান্ত সীমিত। অনেক ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। রাজধানী ঢাকা এবং তার আশপাশ বিচার করলে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবেনা। ঢাকার বাইরে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া উচ্চ শিক্ষিত এবং উপযুক্ত চিকিৎসক নেই বললেই চলে। বাইরের রোগী দেখা যদি আইনের মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে পরিস্থিতি জটিল হবে নিঃসন্দেহে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারী চিকিৎসকগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিসে

নিয়োজিত থাকলে হাসপাতালে চিকিৎসা-ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটে। আমি বলবো, ব্যাঘাত ঘটছে কিন্তু না-ঘটানো সম্ভব। ভেবে দেখতে হবে, আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালন করছি। সময়মত হাসপাতালে আসা, রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন সম্ভব হবে না? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের চিকিৎসকদের হাসপাতালে চাকুরির নির্দিষ্ট সময়ের তুলনায় কাজ তেমন বেশি নেই। আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করি না বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্র্যাকটিসই যেন সব খেয়ে দিচ্ছে। তবে স্বীকার করতে হবে সীমাহীন বাইরের প্র্যাকটিস যে-কোনো শিক্ষকের তথা চিকিৎসকের কর্মক্ষমতার উপর একটা চ্যালেঞ্জ — যা শুধু কর্মক্ষমতার উপর নয়, কর্মক্ষেত্রে নিয়মের উপরেও। সে জন্য দেখা যায় অনেকে সময়মত হাসপাতালে আসেন না, কেউ কেউ মাঝখানে উধাও হন, আবার অনেকে পরে এসে আগে যান, সন্ধ্যাবেলায় জরুরী ভিত্তিতে ডাক পড়লে সবাইকে যে সবসময় পাওয়া যায় তাও বলা যায় না। প্র্যাকটিস যদি এত সমস্যায় জর্জরিত হয় তাহলে সমাধান কি? আগেই বলেছি, বিভিন্ন ফোরামে এটা আলোচিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা সুপারিশ ছিল, তার নাম Institutional কিংবা Geographic Practice. উন্নত দেশের মত যদি সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৬ টা পর্যন্ত হাসপাতালে থাকার নিয়ম করা হয়, হাসপাতালে যদি দুপুরের খাবার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে দুপুরে ১ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত খাওয়া, বিকেল ৪ টা থেকে ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত নাস্তার বিরতি দিলে এবং ২ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত হাসপাতালের সীমারেখায় নির্দিষ্ট নিয়মে প্র্যাকটিস-এর ব্যবস্থা করলে সুযোগ-সুবিধা অনেক। এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া জুনিয়র চিকিৎসকদের অর্থ উপার্জনসহ বেশ কিছু সুবিধা হবে। সময়মত হাসপাতালে পাওয়া যাবে। বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা থাকবে। হাসপাতালের ফান্ড-এ অর্থ জমা হবে। গবেষণার সুবিধা হবে। রোগীকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

৬. চিকিৎসা বাজেটে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটা বৈষম্য থাকার কারণ আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির (Modern Medicine)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কর্তৃপক্ষের অবহেলা। হোমিওপ্যাথিসহ অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। এগুলো যে বিজ্ঞানভিত্তিক নয় তা মোটেই বলা যাবেনা। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির (Alternative medicine)-এর ব্যবহার রয়েছে, চীনের আকুপাংচার আজ অনেক উন্নত। মূলত এজন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সুনজরের অভাব, অজ্ঞতা, অবজ্ঞা এবং কুসংস্কারই বেশি কাজ করছে। তবে ওষুধনীতিতে সবগুলো পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তির ফলে এগুলোর

স্বীকৃতি হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কাজ করার জন্য তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের বদ্ধমূল সন্দেহ দূরীভূত করতে হবে। নিজ নিজ পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রমাণ করার জন্য দক্ষতা, যোগ্যতা ও গবেষণার দিকে বেশি জোর দিতে হবে। এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৭. আমাদের দেশের প্রচলিত বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে একটা কনসালটেটিভ কমিটি থাকতে হবে। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদী ও হেকিমী শাস্ত্রের দায়িত্বশীল চিকিৎসকদের নিয়ে এ কমিটি হবে, যাতে করে বিভিন্ন পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় কার্যক্রমে প্রত্যেকটি পদ্ধতির প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। এবং এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিসহ অন্যান্য পদ্ধতির ওষুধগুলোর কমপারেটিভ স্টাডি করা প্রয়োজন।

৮. জনগণের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত চিকিৎসা–ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন সম্ভব।

অগ্রপথিক ২৯-১-১৯৮৭ সংখ্যা হতে মুদ্রিত।

বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সাপ্তাহিক রোববারের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারের জবাবে ডাঃ নুরুল ইসলাম

১। আপনি কি নিজেকে বুদ্ধিজীবী মনে করেন?

২। বুদ্ধিজীবী সমাজকে জাতির বিবেক হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজ কি জাতির বিবেক হিশেবে কাজ করতে পারছে?

৩। আমাদের জাতীয় সমস্যাবলি সম্পর্কে আপনি কতোটা চিন্তা-ভাবনা করেন এবং এগুলোর সমাধান সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোনো প্লান-পরিকল্পনা আছে কি?

৪। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিজীবী সমাজ কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং অবদান রাখতে পেরেছেন বলে কি আপনি মনে করেন। এ-সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৫। আমাদের মতো একটি অনুন্নত দেশে বুদ্ধিজীবীদের যথার্থ ভূমিকা কি হওয়া উচিত? এবং এই ভূমিকা কিভাবে পালন করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

৬। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মতাদর্শগত পার্থক্যকে আপনি কিভাবে দেখেন? এই মতপার্থক্য নিরসনের কোনো উপায় আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

৭। আমাদের সমস্যা যেখানে অভিন্ন এবং সমাধান সকলেরই কাম্য, সেখানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের শিবিরাশ্রয়ী মতামত এবং ক্ষুদ্রস্বার্থ কি অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করছে না? এই জটিলতার অবসান কিভাবে সম্ভব?

৮। জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হওয়া উচিত?

জাতীয় অধ্যাপক (ডাঃ) নুরুল ইসলাম

উত্তর ঃ

১। আমার পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে। আপনি যদি এ প্রশ্ন করে থাকেন তাহলে এর জবাব দেয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে শিক্ষিত চিকিৎসক কিংবা সমাজসচেতন ব্যক্তিকে যদি আপনি বুদ্ধিজীবী মনে না করেন, তাহলে আমিও সে তালিকা থেকে বাদ পড়বে। যে হিশেবে ধরুন না কেন, আপনার প্রশ্নমালার জবাব দিতে চেষ্টা করবো ব্যক্তিগত মতামত হিশেবে।

২। বুদ্ধিজীবী সমাজ জাতির বিবেক। শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ জীবনের অপরিহার্য অংশ।

বিবেক মানুষকে সৃষ্টি জগতে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে। কথাগুলো অতি সত্য। এতে কোনো কৃত্রিমতা নেই ; কারণ সত্য চিরন্তন। কিন্তু তাই বলে বিনা বাধায় প্রতিটি সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কোনো কথা নেই। বুদ্ধিজীবী সমাজ জাতির বিবেক হিশেবে কাজ করতে কোনো–না–কোনো সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হবে এটা সহজেই অনুমান করা যায় এবং এটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

৩। জাতীয় সমস্যাবলি বলতে আপনি যদি সব জাতীয় সমস্যাকে বুঝান তাহলে এককভাবে সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে সঠিকভাবে চিন্তা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমিও সেই হিশেবের আওতায়। শিক্ষা এবং চিকিৎসা এ–দুটোর সাথে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমি নিজেকে এতদসম্পর্কীয় সমস্যা থেকে আলাদাভাবে দেখতে পারি না। একটি বিশেষ সমস্যাকে আবার সম্পূর্ণরূপে অন্য কোনো সমস্যা কিংবা সমস্যাবলি থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা যায় না। সে যাই হউক, আপন পেশাগত সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা–ভাবনা অপরিহার্য। এগুলোর সমাধান সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে না হলেও বিভিন্ন পত্র–পত্রিকার মাধ্যমে সভা–সমিতিতে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। সুযোগ পেলে পরিকল্পনা কাজে লাগানো সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্বীয় কার্যক্রমের আওতায় চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধনীতি একটা বাস্তব বৈজ্ঞানিক এবং বৈপ্লবিক পরিকল্পনা। দেশ–বিদেশে এর প্রতি অভিনন্দন সফলতার ইঙ্গিত বহন করে।

৪। তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে আপনার চতুর্থ প্রশ্নের কিছুটা ইঙ্গিত মেলে। রাজনৈতিক দিক বাদ দিলেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানে সময় এবং সুযোগ পেলে বুদ্ধিজীবী সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং অবদান রাখতে পারেন। জাতীয় ঔষধনীতি তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ নীতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা এবং অবদান বিচার করতে গেলেই দৃষ্টান্তমূলক তেমন কিছু হয়তো আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

যে সংগ্রাম ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তা পর্যবসিত হয় সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়। স্বীকার করতে হবে বুদ্ধিজীবীদের সদিচ্ছার এবং সক্ষমতার

অভাব নেই। কিন্তু যে শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বলিষ্ঠ চিন্তার আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পাবে, যে সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো কার্যকর করা সম্ভব। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোতে তা কতোটুকু সম্ভব তা তলিয়ে দেখতে হবে। আমার স্বীয় চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগাতে কতো বাধার সৃষ্টি হয়; বিশেষজ্ঞ অবিশেষজ্ঞের ব্যবধান কতোটুকু এগুলো বিশ্লেষণ করলেই সমস্যা কতো জটিল সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

৫। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত জনসধারাণ অতি সহজ-সরলপ্রাণ। অনেকাংশে এরা বুদ্ধিজীবীদের অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করতে প্রয়াসী। আদর্শ নাগরিক হিশেবে, সমাজসচেতন ব্যক্তি হিশেবে পার্থিব এবং পারলৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তাদের মাধ্যমে জনসাধারণ অনুপ্রাণিত হবে। সত্য এবং ন্যায়ের পথে চলতে উৎসাহিত হবে। এ ভূমিকা পালন করা কিভাবে সম্ভব তার জবাব দেয়া কঠিন। তবে সুযোগ এবং সুবিধা পেলে সার্থকতার প্রথম পদক্ষেপ ঐকান্তিক ইচ্ছা। আমার দেশের বুদ্ধিজীবীদের এর কোনো অভাব আছে বলে আমি মনে করি না। তবে সুযোগ এবং সুবিধা কোথায়? রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণে তাঁদের কোনো ভূমিকা নেই। শাসন ব্যবস্থায় তাঁদের কোনো অধিকার নেই বললে চলে। নীতিমালা প্রণয়ন এবং তার কার্যকরণ যতোদিন বুদ্ধিজীবীদের আওতার বাইরে থাকবে ততোদিন তাঁদের সদিচ্ছা শুধু একটা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হিশেবে থাকবে। বাস্তবে পরিণত হবে কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সফলতার চেয়ে নিষ্ফলতা অনেক বুদ্ধিজীবীর আশা-নিরাশার সৃষ্টি করেছে।

৬। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মতাদর্শগত পার্থক্যকে আমি কিছুতেই অস্বাভাবিক মনে করি না, বরং এ-পার্থক্য না থাকাটাই প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত। বিভিন্ন রূপ যেমন সৃষ্টির মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, বিভিন্ন মতও তেমনি এর একটা বৈশিষ্ট্য। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে বিশ্বাসীদের (মোমিনদের) মতান্তর আল্লাহর রহমতস্বরূপ। একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বিচার করবার, বিশ্লেষণ করবার সুযোগ দেয়। বিভিন্ন সড়ক দিয়ে যেমন একই গন্তব্যস্থলে পৌছা সম্ভব, আদর্শগত পার্থক্য থাকলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো তেমনি সম্ভব। বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য নিরসনের প্রথম পদক্ষেপ হিশেবে আমি যেটা মনে করি সেটা হলো সঠিকভাবে তাঁদের লক্ষ্য নিরূপণ করা। উদ্দেশ্য যখন যেখানে এক, মতাদর্শগত পার্থক্য সেখানে দেয়া এবং নেয়ার মাঝখানে বিলীন হয়ে যাবে এবং বিবিধের মাঝখানে সেখানে মহামিলন হবে।

৭। আগের প্রশ্নোত্তরে এর কিছুটা জবাব মিলে। বুদ্ধিজীবী সমাজ যেদিন সমস্যা সম্বন্ধে অভিন্ন মত পোষণ করবে, সমাধানের জন্য আগ্রহী হবে, শিবিরাশ্রয়ী মতামত এবং ক্ষুদ্রস্বার্থ সেখানে শক্তিশালী রূপ নিতে পারবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সাময়িক জটিলতার অবসান হবেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, শিবিরাশ্রয়ী ভিন্ন মতামত এবং ক্ষুদ্রস্বার্থ বহিঃশক্তির আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা, অর্থের প্রলোভন, বিভিন্ন আশাতীত সুযোগ-সুবিধা প্রদান অনেক ক্ষেত্রে একই শিবিরে ব্যবধান সৃষ্টি করে। নিজকে সমাজের উপরে কিংবা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সহায়তা করে। আদর্শ স্বার্থের সংঘাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শিবির তথা দলের সাম্প্রতিক ভাঙন কিংবা কোন্দল এর সাক্ষ্য বহন করে। এই জটিলতার অবসান সম্ভব হবে সেদিন, যেদিন আমরা সততাকে সম্বল করে একই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্রিয় হবো। কথায় বলে, সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্বে মিথ্যা সাময়িকভাবে বিজয়ী হতে পারে, কিন্তু সত্যের জয় বিলম্বে হলেও অবধারিত।

৮। সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর একমাত্র উপায় আত্মশুদ্ধি এবং চারিত্রিক সংগঠন। এ দুটোর সমন্বয়ে বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় বৃত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রশাসনে অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মনে করি। তবে বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতিবিদদের থেকে কিছুটা আলাদাভাবে দেখতে হবে। নিজ-নিজ ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে ভিন্ন-ভিন্ন অবদানের মাধ্যমে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌছানোর সক্রিয় প্রচেষ্টা জাতির উন্নতির সহায়ক হবে। একে অপরকে ঘৃণা কিংবা অবহেলার চোখে দেখলে হবে না। পরস্পর পরস্পরকে সম্পূরক হিশেবে গ্রহণ করবে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে নয়, এই প্রচেষ্টায় বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের সফলতার অপরিহার্য অংগ হিশেবে নিজেদের মধ্যে সততা এবং একাগ্রতা জাগিয়ে তুলতে হবে। এতে একতার সৃষ্টি হবে। এই একতা সফলতা আনবেই।

পুনর্মুদ্রণ ঃ রোববার, ৫ম বর্ষ ২৪ তম সংখ্যা ঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং।

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী না বাংলা

প্র ঃ রাষ্ট্রভাষা মানে কি?

উ ঃ রাষ্ট্রের যেটা মুখ্য ভাষা সেটাই রাষ্ট্রভাষা।

প্র ঃ রাষ্ট্রভাষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম-এর মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

উ ঃ রাষ্ট্রভাষাই সে দেশের উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হবে। এবং সে শিক্ষা পেতে হলে তাকে অন্য ভাষাও জানতে হবে। অর্থাৎ কোন একটা দেশ বা জাতি শুধু একটা ভাষা নিয়ে চলতে পারে না। সে দেশ যত উন্নতই হোক না কেন? কিছুদিন আগেও যুক্তরাজ্য শিক্ষা কমিশন খুব জোর দিয়ে বলেছে তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফরাসী ভাষা শিখতে হবে। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে কোন্‌টি দ্বিতীয় ভাষা হওয়া উচিৎ। ট্রেড, ট্যুরিজম, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন সাইন্স — এগুলোর জন্যে কোন্ ভাষা বেশি প্রয়োজন। ব্যবসার জন্যে অন্যতম শক্তিশালী দেশ জাপান — তারা ইংরেজীকে অন্যতম প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ইন্টারন্যাশনাল রিলেশানেও ইংরেজী প্রধান ভাষা। রাশিয়াতেও দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী। চীনেও এখন খুব ইংরেজী শিখছে।

এক সময় ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের ভাষা। এখন এটা একটা শেখার ভাষা। এখন তো আর মুসলিম যুগের ইংলিশ নয়। এটা এমন যুগের ভাষা, যখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা, জানার সুযোগ, আসা-যাওয়া লেন-দেন বেড়ে গেছে।

প্র ঃ বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বা হচ্ছে এর ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ ঃ আমার মনে হয় বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে, মায়ের ভাষা বলে যদি আমরা শ্রদ্ধা দেখাই — মুখে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রেখে যদি তার পুষ্টি সাধন করতে না পারি তবে এ ভাষা রক্তহীনতায় ভুগবে। রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি যদি ইংরেজীতে অনুবাদ না হতো তবে নোবেল পুরস্কার পেত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যদি ইংরেজী না শিখতেন তবে সনেট এদেশে আসতো না। সুতরাং বাংলার সাথে সাথে একই গুরুত্বে ইংরেজী শেখা উচিৎ।

প্র ঃ এক্ষণে বাংলা ভাষা উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারে কি?

উ ঃ আমি মনে করি, ইংরেজীর প্রতি আমাদের যে বিদ্রুপ ভাব, হালকা সম্পর্ক, তা আন্তর্জাতিকভাবে আমাদেরকেও হালকা করে তুলবে। শিক্ষার দিক থেকে, এমনকি সাহিত্যের দিক থেকেও। তাই একটা আন্তর্জাতিক ভাষাকে যদি কেউ অবহেলা করে তবে আমাদেরকেই অবহেলা করা হবে। গ্রাম্য শিক্ষা বাংলায় হতে পারে। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় বাংলার পাশাপাশি যদি অন্য একটি ভাষা না শিখি তবে আমরা পিছিয়ে পড়বো।

প্র ঃ গত ১৫ বছরে এদেশে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কি কি হয়েছে?

উ ঃ আমি জানি না। তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা হয়েছে তা সীমিত। গ্রাম্য ডাক্তার বা পারিবারিক চিকিৎসার জন্য বাংলা বই প্রয়োজন। কিন্তু উপযুক্ত ডিগ্রীপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ক্ষেত্রে ইংরেজী অপরিহার্য। ইংরেজী বই-পুস্তক, সাময়িকী-র সাথে যদি সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তাহলে জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমরা অনেক পেছনে পড়ে থাকবো। সমকালীন অগ্রগতির সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে চাই তবে দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকী এবং পুস্তক অপরিহার্য।

প্র ঃ বিশ্ববিজ্ঞান ও মননচর্চায় বাংলা ভাষার অবদান কি?

উ ঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অবদান সীমিত। কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানই সীমিত। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের যদি আন্তর্জাতিক ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে তবেও নিত্য নতুন সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বার্থেই বিজ্ঞানে উন্নত যে-দেশ, সেদেশের ভাষা শেখা অপরিহার্য।

প্র ঃ বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বিবেচনা করলে, এটা কি উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে, নাকি তৎকালীন পাকিস্তানীদের রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য হয়েছিল?

উ ঃ আসলে একটা রাজনৈতিক রূপ তো নিয়েছে সত্যিই। তখন উর্দুর প্রতি বিশেষ বিতৃষ্ণা আসে, যেহেতু উর্দুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন এদেশের লোক উর্দুকে যেমন পরিত্যাগ করতে শিখেছে তেমনি বিদেশী ভাষার চাপ হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতি মায়ামমতা বেড়েছে। আমি স্বীকার করি, ভাষা আন্দোলন একটা রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে। তার

ফলশ্রুতিতে আজ বাংলা ভাষার অভ্যুদয়। সে পর্যায় এখন আমরা পেরিয়ে গিয়েছি। আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অধিবাসী। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। এ ভাষার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আছে। বরং এ ভাষা উৎকর্ষের হাতিয়ার হিসেবে আমরা নিতে পারি। আগে যেমন বলেছি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভাষার প্রসার সম্বন্ধে আমরা যদি অবহিত না হই, বিদেশী ভাষা সম্পর্কে আমরা যদি অজ্ঞ থাকি, একটা সীমিত গণ্ডির ভেতর নিজেদের আবদ্ধ রেখে বাংলা ভাষাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিফলিত করতে পারবো তা গভীরভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। স্বীকার করতে হবে উচ্চতর শিক্ষা গবেষণা ও প্রকাশনায় আমরা দুর্বলতার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমরা যেন দিন দিন সম্বলহীন হয়ে পড়ছি।

অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথাই যদি ধরে নেই, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ইংরেজী ভাষার দুর্বলতার কারণে আমাদের কিছু চিকিৎসক সুযোগ পেয়েও উচ্চশিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি ভাষার দুর্বলতার কারণে। এক কথায় আমি বলবো, যখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত দেশ ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, নিজেদের ভাষা আন্তর্জাতিক হলেও আরও একটি, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দু'টি আন্তর্জাতিক ভাষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে, আমরা তখন নিজেদেরকে ঘরমুখো করে পেছনে ফিরে যাচ্ছি। সৎ সাহসের সেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিলে আমরা কোথায় হারিয়ে যাব ভবিষ্যত তার প্রমাণ দেবে।

প্র ঃ ব্যাপক জনসাধারণের মেধাগত যোগ্যতা ছাড়া জাতীয় চেতনাবোধ জাগ্রত করা কি সম্ভব?

উ ঃ আমার মনে হয় না বেশি লোক মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সুযোগ মেধার সৃষ্টি করতে পারে, মেধা সব সময় সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনা।

সবশেষে ডাঃ নুরুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে আমরা যে পরিমান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এটা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে, যেন স্কুল পর্যায়ে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী এবং বাংলা সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষালাভে সমর্থ হয়, যাতে দু'টো ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বুঝতে পারে।

সাপ্তাহিক মেঘনা-এর সাথে সাক্ষাৎকার। ১১-২-১৯৮৭ সংখ্যা হতে মুদ্রিত।

রোগ
রোগী
চিকিৎসক ঃ আজকের চ্যালেঞ্জ

আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে কোলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই। তার মাত্র কয়েকদিন আগেই এখানে প্রথম আগমন। বিরাট এলাকা জুড়েই এ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আই.এসসি. (বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষায় যারা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছে তারাই এখানে ভর্তি হয়। কৃতকার্য প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অর্জিত নম্বর নামের পাশে লেখা থাকত। যে ছেলে প্রথম স্থান অধিকার করে তার নামও এখানে ছিল। তারপর মেধা অনুসারে একের পর এক।

ভর্তির টাকা জমা দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম আমরা দুজন — আমি এবং কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আই.এসসি.-তে এক সাথে পড়া বন্ধু ওমর আহমদ জামাল। রিত্তশালী খোজা পরিবারের ছেলে।

কলেজ অফিস থেকে বেরিয়ে আসার সময় বাঁদিকে বিরাট এলাকা জুড়ে মেইন হাসপাতাল, ডানদিকে জরুরী বিভাগ, হাসপাতালের দোতলা পর্যন্ত বিরাট সিঁড়ি। সামনে বড় বড় থাম। বিরাট গাম্ভীর্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ ভবন। ভিতরে রাস্তা দিয়ে দু'একটা মোটরগাড়ী আনাগোনা করছিল। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুবর জামাল বিরাট আকৃতির থাম এবং চলন্ত গাড়ীর দিকে লক্ষ্য করে বলল, "ইসলাম, আমরা যখন ডাক্তার হব কি মজার ব্যাপার হবে। এ ধরনের দালানে কাজ করার সুযোগ পাব। আর, বড় বড় গাড়ীতে করে কত লোক আমাদের কাছে আসবে।"

তারপর চিকিৎসা শিক্ষা জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পড়াশুনা শেষ করি। দু'বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রথম এম বি বি এস, এক বিরাট ধাক্কা। আমরা ছিলাম সর্বমোট ২২ জন মুসলমান ছাত্র। পাস করি মাত্র ৫ জন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পালা। যারা এম বি বি এস পরীক্ষায় সফল হতে পারেনি তারা সবাই চলে আসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে। আমরা পাস করা পাঁচজন রয়ে গেলাম।

১৯৫০ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে পরীক্ষা পাসের পর বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ নিতে হলো ছয় মাস। তার পরেই রেজিস্ট্রেশন-এর জন্য ছয় মাসের ট্রেনিংকে বলা হত পি.আর.সি.এ. ট্রেনিং। হাসপাতালের নানা বিভাগে হাতে-কলমে কাজ করতে

হত। পেশাগত জীবনের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সারা জীবন ধরে একজন সাধারণ এম বি বি এস ডাক্তার হিসেবে চালিয়ে যাব, না বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করবো। চিকিৎসক (ফিজিসিয়ান) শৈল্যবিদ কিংবা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত এখানেই। সামাজিক চাহিদা, পরিবারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, শৈল্যবিদ না হয়ে চিকিৎসক (ফিজিসিয়ান) হওয়ার। শৈল্যবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে মেলা। পরে অবশ্য টাকা হয়ত বেশি আসে।

এরপর সরকারী চাকুরিতে যোগ দেই ১৯৫২ সালে। মেডিকেল কলেজে ভর্তির পর পর প্রথম অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার সাথে এখানে কোন মিল নেই। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম ডাক্তারি পাস করা আর তাকে কাজে লাগানো এ দুইয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান।

বিদেশে শিক্ষা

চাকুরি পেতে কোন বেগ পেতে হয়নি। পাস করা ডাক্তার ছিলাম আমরা মাত্র কয়েকজন। সেই হিসেবে চাকুরি ছিল সবার জন্য নিশ্চিত। কেউ স্থায়ী পদে আর কেউবা হয়ত অস্থায়ী পদে। এনাটমী, ফিজিওলজী, ফার্মাকোলজি, সাইকিয়াট্রি এগুলোর জন্য বৃত্তিও ছিল প্রচুর। অনেকে এগুলো গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করতো। ভাবতো এতে ভবিষ্যত নেই, অন্তত আর্থিক বিবেচনায় এবং সামাজিক দৃষ্টিতে। সে যাই হোক, এ সময় চাকুরিতে যোগ দেয়ার আগেই স্কলারশীপ বা বৃত্তির দরখাস্ত করার নিয়ম ছিল। পাস করার পর বক্ষব্যাধিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের ভবিষ্যত গড়ে তুলব ভেবেছিলাম। ঠিক সে কারণেই সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে এনাটমিতে চাকুরি পেয়েও কোলকাতা মেডিকেল কলেজে বক্ষব্যাধিতে ট্রেনিং নিয়েছিলাম ছয় মাস। সময়মত তা কাজেও লেগেছিল। চাকুরিতে যোগ দেবার আগেই ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ে টি.ডি.ডি. করার জন্য সরকারী বৃত্তি পাই। শেষ পর্যন্ত টি.ডি.ডি (বর্তমানে ডি.টি.সি.ডি) এবং এম.আর.সি.পি. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরি। এম.আর.সি.পি. পাসের আগে উচ্চতর ডিগ্রীকে মনে হত একটা অসাধারণ সফলতা, কর্মজীবনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতা। উচ্চশিক্ষা লাভের পর শিক্ষক হিসেবে যখন যোগ দেই ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারি, জানার চেয়ে জানানো, বলার চেয়ে করানো এবং চাওয়ার চেয়ে পাওয়া কত কঠিন।

উচ্চ শিক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে

উন্নত দেশের শিক্ষা একদিকে শেখার সুযোগ দেয় কিন্তু অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশে তার প্রয়োগে রয়েছে অনেক বাধা। আমার অভিজ্ঞতা ১৯৫৪–৫৬ সালের, আজ থেকে তিন দশক আগের। বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষার সুযোগ–সুবিধা যুগের মাপকাঠিতে পশ্চিমা দেশগুলোতে তখন সীমিত থাকলেও আমাদের তুলনায় ছিল অনেক। বায়োকেমিস্ট্রি, হিস্টোপ্যাথোলজি এবং অন্যান্য ল্যাবরেটরী টেস্ট তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। পরীক্ষা–নিরীক্ষার ফলে কিছু কিছু নতুন রোগও ধরা পড়ছে। তবুও আমরা রোগের ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। রোগীকে পরীক্ষা করার পর লক্ষণসমূহের বিশ্লেষণ এবং তার উপর ভিত্তি করে রোগ নির্ণয় ইত্যাদি ছিল ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। ওষুধের সংখ্যা ছিল সীমিত। তবুও দেশে ফিরে দেখি কত ব্যবধান। বায়োকেমিস্ট্রি, হিস্টোপ্যাথোলজির কোন অস্তিত্ব নেই। ল্যাবরেটরীতে শুধু মলমূত্র, রক্ত পরীক্ষা আর দু'একটা বিশেষ পরীক্ষা, এমনকি, হৃদরোগের সামান্যতম পরীক্ষা–ই.সি.জি.–এর ব্যবস্থা সব হাসপাতালে ছিল না। ঢাকা মেডিকেল কলেজে হৃদরোগ বিভাগ ছিল, পদ ছিল না। একদিকে ভিন্ন পরিবেশে অনেকটা সুযোগ–সুবিধার মাঝখানে বিদেশের উচ্চতর শিক্ষা জ্ঞানের দিক দিয়ে আমাকে অনেক দূর এগিয়ে নিলেও সামগ্রিকভাবে বিচার করতে গেলে এর সীমাবদ্ধতাও ছিল। এমন অনেক রোগ যেগুলো এদেশের প্রতিদিনের সমস্যা, বিদেশে প্রশিক্ষণকালে সেগুলো দেখারও সুযোগ হয়নি। ম্যালেরিয়া, কালজ্বর, টাইফয়েড, ডিসেন্ট্রি ইত্যাদি সেদেশে যারা শিক্ষক তাঁদের কাছে ধরতে গেলে অজানা। ট্রপিক্যাল মেডিসিনের হাসপাতালেও অনেক সময় এ ধরনের রোগী মোটেই পাওয়া যায়না। তবুও বৃটিশ কলোনীতে, ডাক্তার পাঠাতে হলে তাদের কিছু শিক্ষা দেবার জন্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। মোটকথা, বৃটেন বা পশ্চিমা দেশগুলো তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলো প্রবর্তন করেছিল সেগুলো আমাদের দেশে কতটুকু কার্যকরী সেটা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট সহজেই ধরা পড়বে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি — মাঝারি ধরনের বড় প্লীহা নিয়ে তখন আলাপ চলছিল, বিলাতে প্রথম সম্ভাবনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল পলিসাইথিমিয়া। এ রোগ আমাদের দেশে খুব কমই দেখেছি এবং বিলাতে যাবার আগে একটিও দেখিনি। সামান্য কিছু হয়ত শিক্ষকের কাছে শুনেছিলাম। রোগীর সংস্পর্শে না আসার কারণে তাও মনে ছিল না। আমার দেশে এক্ষেত্রে প্রথম সম্ভাবনা হিসেবে ম্যালেরিয়া কিংবা কালজ্বর না বললে বিরাট ভুল হবে। এমনি আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

রোগ যেমন অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর, আরও ভিন্নতর আমাদের রোগী। তিন দশক আগে পশ্চিমা তথা উন্নত দেশ এবং আমাদের মাঝখানে যা ব্যবধান ছিল এখন তা আরও বেড়ে গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে একদিকে যেমন রোগ নির্ণয়ের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং পরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি ওষুধের সংখ্যাও বেড়ে গেছে অনেক। সামাজিক, আর্থিক, পারিপার্শ্বিক, এমনকি নৈতিক পরিবর্তনও এখন লক্ষণীয়।

পেশাজীবনের গোড়ার দিকে

পেশা জীবনের গোড়ার দিকে যখন ফিরে যাই মনে হয় চিকিৎসা সহজতর ছিল। রোগ নির্ণয় ব্যয়বহুল ছিলনা। স্বল্প ওষুধের মাঝখানে প্রেসক্রিপশনে জটিলতা ছিলনা। অনেক রোগের ওষুধ ছিলনা। কারণও জানা ছিলনা অনেকক্ষেত্রে। রোগীর সংখ্যাও ছিল আনুপাতিক হারে কম। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। হাসপাতালে সিটের অভাব, ডাক্তারখানায় ওষুধের অভাব, রোগীর তুলনায় ডাক্তারের অভাব। অন্যদিকে নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব। তদুপরি সামাজিক কাঠামোর অনেক পরিবর্তন।

ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক ঃ তখন আর এখন

আগে সর্ম্পক ছিল রোগী আর ডাক্তারের। এ দুয়ের মাঝখানে কোন ব্যবধান ছিলনা। সরাসরি আলাপের মাধ্যমে একে অপরকে জানবার, চিনবার এবং বুঝবার সুযোগ পেত। পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠত সেটা ছিল বন্ধুত্বের, বিশ্বাসের, নির্ভরশীলতার। বিগত ত্রিশ বছর এ সম্পর্কের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। নানা কারণে ডাক্তার এবং রোগীর মাঝখানে ব্যবধান এখন দিনদিন বেড়ে চলছে। একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার এবং রোগীর মাঝখানে রয়েছে তাদের সহকারী চিকিৎসকবৃন্দ, যাদের উপর রোগী সম্পূর্ণ আস্থাশীল নয় অথচ নির্ভর করতে হয়। এখানে সরাসরিভাবে কথা বলতে সে দ্বিধাবোধ করে, রোগের ইতিহাস সে খোলাখুলিভাবে বলতে চায় না। অনেক কিছু বললেও সে সবকিছু বলে না। "নতুন ডাক্তার" অনেক রোগীর এ ধারণা এখানে প্রতিবন্ধক। কৃত্রিম ব্যবধানের চিকিৎসক সম্পূর্ণ সহায়ক হতে পারে না। আগের যে মধুর সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

আমরা জানি, এমন অনেক রোগ আছে যেখানে ওষুধ প্রয়োজন হয় না। অথচ মধ্যস্থলে অবস্থিত সহকারীদের দেওয়া কাহিনী শুনে রোগীকে যদি বলেন, চিকিৎসার

প্রয়োজন নেই, তাহলে সে বিশ্বাস করবে কি করে? পরের মুখে শুনা কথায় আপনি যে রায় দেবেন সেটাকে একটা সহমর্মী হিতৈষী বলে সহজ সরল রোগগ্রস্ত সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে কি করে? ক্ষেত্রবিশেষে এমন পরিস্থিতি অপরিহার্য হলেও এটা নিয়মিত ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করা কতটুকু সমীচীন হবে ভেবে দেখতে হবে।

অপ্রাসঙ্গিক, তবুও শুনতে হয়। একজন রোগী তার রোগ নিয়ে আসে উপশমের আশায়। রোগ নির্ণয়ে কতটুকু বলার প্রয়োজন তা তার জানা নেই এবং সেই কারণেই অনেক সময় এমন সব বর্ণনা দেয় যেগুলোর সাথে আদৌ সম্পর্ক থাকতে পারে না। টি.বি. রোগী রক্তমিশ্রিত কাশকে অনেক সময় অন্যান্য আঘাতজনিত কারণ বলে মনে করে। প্যারালিসিসকে মনে করা হয় কারও অভিশাপের ফল। এ ধরনের আরও অনেক কিছুর সম্পর্ক বিবেচনা করে রোগী যখন রোগের কাহিনী বলে চিকিৎসককে তা ধৈর্য ধরে শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। সামান্য অবহেলা, রোগের ইতিহাস শুনবার মাঝখানে টেলিফোন কিংবা ভিন্ন আলোচনা, এদিক-সেদিক তাকানো রোগীর মনে প্রভাব বিস্তার করে।

অনেক রোগ আছে যেগুলো দেখলেই কারণ বুঝা যায়। চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতেই অনেক রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। রোগের ইতিহাস পরীক্ষা-নিরীক্ষার এখানে প্রয়োজন নেই। তবে সেটা রোগ নির্ণয়ের জন্যে, রোগ চিকিৎসার জন্যে নয়।

সহানুভূতি যেখানে সম্বল

একটা ক্যান্সার রোগী, স্বল্প সময়ে যার মৃত্যু অবধারিত, সেও আসে বাঁচবার আশায়। চিকিৎসক হিসেবে আপনি যদি তার আগাগোড়া ইতিহাস না শুনেন, সোজাসুজি বলে দেন এ রোগ সারবার নয়, তাহলে সে মরবার আগেই মরে যাবে। কিন্তু সব ধীরস্থিরভাবে শুনে সহানুভূতির সাথে সবকিছু বুঝিয়ে দেন, রোগের প্রকৃতি জেনেও শান্তভাবে সেটাকে সে গ্রহণ করবে। একটা মর্মান্তিক পরিস্থিতিতেও সে তৃপ্তি পাবে।

অন্যদিকে একটা সহজ রোগের কথা ধরা যাক। কোথাও একটা ফোড়া হয়েছে। রক্ত এবং পুঁজ পরীক্ষা করে তার প্রকৃতি জেনে নিলাম। সেখানেও যদি কোন রোগী বলে অমুখ আত্মীয়ের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার পর কিংবা অমুক তারিখ অনিদ্রার ফলে আমার এ রোগের সূত্রপাত হয়, তাহলেও শুনতে হবে নিতান্ত মনোযোগ দিয়ে। এরকম একটা হাস্যকর বর্ণনায় আপনি যদি হেসেই ফেলেন তাহলে চিকিৎসক হিসেবে আপনার উপর সে রোগীর বিশ্বাস কিছুতেই থাকতে পারেনা। সত্য হোক

মিথ্যা হোক, বেদনার সুরে যে কথা বলে তার সাথে আপনি যদি সহানুভূতির সাথে সমবেদনা প্রকাশ না করেন, আপনার প্রেসক্রিপশন যতই সঠিক হোক না কেন, দুদিন পরেই সে ভিন্ন ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে যাবে। সে ডাক্তার সহানুভূতির সাথে সবকিছু জেনে শুনে যদি একই ওষুধ ভিন্ন নামে, এমনকি এক নামেই দেয়, ফল এক হলেও আপনি রোগীর ভক্তি হারালেন, আর অন্যজন সে সুযোগ নিল।

মনে পড়ে চিকিৎসা জীবনের শুরুতে আঠার উনিশ বছরের একটা মহিলা রোগী আমার ওয়ার্ডে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার বাম হাত অবশ। বহির্বিভাগে রোগ নির্ণয়ের জায়গায় লিখা হল সুন্দর একটি ইংরাজী শব্দ — মনোপ্লেজিয়া — বাম হাত অবশ। এটা কিন্তু রোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় রোগ নির্ণয় নয়। যা হোক, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হল। এক্সরে, রক্ত পরীক্ষা, মলমূত্র, সবকিছু। কিছুতেই হিসেব মেলে না। এটা ওটা কত ওষুধ দেই। কিন্তু হয় না। সবাই উদগ্রীব। মেয়েটির কি হবে? স্বামী যদি তালাক দেয়? তার ভবিষ্যত?

মনে মনে ঠিক করলাম, একদিন তার কাছে বসে সমস্ত কাহিনী শুনব। আশেপাশে কেউ ছিল না, শুধু একজন সহকারী হাউজ ফিজিসিয়ান ছাড়া। কবে বিয়ে কি করে হল, শ্বশুর বাড়ীতে কেমন লাগে, শাশুড়ীর সাথে কেমন সম্পর্ক সবকিছু আমাকে খোলাখুলিভাবে বলতে বললাম। মাঝে মাঝে মাথায় হাত দিয়ে তাকে অভয় দিলাম — সব গোপন রাখা হবে। আমার দিকে তাকিয়ে সে হয়ত বুঝতে পারল আমি তাকে ভাল করবার উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, আমি তার হিতৈষী। কাহিনী বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। বলল, বাপের বাড়ীতে যত আদর-যত্ন সে পেত এখন তা পায় না, স্বামী আদর করে ঠিকই। যেটা তার জন্যে সবচেয়ে কষ্টকর সেটা হল প্রায় আধ মাইল দূর থেকে প্রতিদিন সকালে কলসী করে পানি আনা। পানি আনতে আনতে তার বাঁ হাত অবশ হয়ে গেছে। খোদার কাছে সে মোনাজাত করেছিল এরকম কষ্টের চেয়ে তার হাত অবশ হওয়াই ভাল। তাতে সে রেহাই পাবে। তার কয়েকদিন পর থেকেই তার হাত অবশ। ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল। এটা একটা মানসিক অবস্থার শারীরিক প্রকাশ। পরের দিন শ্বশুর-শাশুড়ীকে ডেকে পাঠালাম। খুব শান্তভাবে বুঝিয়ে দিলাম এমন একটা কাজ তার সহ্য হচ্ছে না, তার থেকে রেহাই পেলে সে আস্তে আস্তে ভাল হয়ে যাবে। আমারা সামান্য কিছু ঔষধ দিলেও তার আসল চিকিৎসা এমন একটা অবস্থা থেকে তার অব্যাহতি। তাঁরা দুজনেই রাজী হলেন। মেয়েটিকে অভয় দিয়ে বললাম, সে শীগগীরই ভাল হয়ে যাবে, আর তাকে কলসী করে পানি বয়ে আনতে হবে না। তিন চারদিনের মধ্যেই সে সেরে উঠল। সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করলে, বন্ধুসুলভ পরিবেশে সব কাহিনী জানতে না পারলে এমন

একটা রোগীর চিকিৎসা হত টেবলেট, ইনজেকশান, সেলাইন, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদি। শারীরিক মানসিক, আর্থিক কষ্ট দীর্ঘায়িত হত। রোগের উপশম হতনা।

বর্ণনার সীমাবদ্ধতা

শুধু বর্ণনা শুনে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়না। পরের মুখে শুনার বিপদ আরও অনেক বেশি। রোগীর বর্ণনা, প্রকৃতি, কথা বলার ভঙ্গি, চোখ-মুখ এবং চেহারার মাধ্যমে অনেক কিছু ধরা পড়ে। চিকিৎসকের আচরণ, চাহনি, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকি বসার ভঙ্গি সবকিছুরই কিছু না কিছু প্রভাব আছে।

রোগীর বলার ভাষা আলাদা হতে পারে। দেশের ভিতরে আঞ্চলিক ভাষা আর বিদেশে অন্য ভাষায় ভাব আদান-প্রদান এ বাধার সৃষ্টি করে। প্রায় প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় বিদেশে অনেক রোগী হয়ত ঔষধ পেয়েছে ঠিকমত, রোগ নির্ণয় সঠিক হয়েছে, তবুও তারা দেশে চলে আসে এমন চিকিৎসকের কাছে যার সাথে তাদের হয়ত অনেকের পরিচয় অনেকদিনের অথবা যার সম্বন্ধে তারা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছে। অন্যদিকে আঞ্চলিক প্রভাব নেহাৎ কম নয়। এটা কোনদিক দিয়েই রাজনৈতিক নয়। নিজের ভাষায় কথা বলতে না পারলে অনেকে মনে করে সব কথা বলা হল না এবং সব যদি বলা না হয় ডাক্তার রোগ নির্ণয় করবে কি করে?

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক চিকিৎসকদের প্রভাব অন্যান্য যত কারণেই হউক না কেন ভাষা অন্যতম প্রধান কারণ বলে আমি বিশ্বাস করি। আমার নিজ অঞ্চল থেকে রোগী যখন ঢাকায় আসে, আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার সাথে সাথেই তাদের চোখে-মুখে কেমন একটা সন্তুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে না জেনে যদি শুদ্ধ ভাষায় কথা শুরু করি, রোগীর সঙ্গীকে বলতে শুনি, "পরিষ্কারভাবে আমাদের ভাষায় কথা বল, উনি আমাদেরই দেশের লোক।" দেশ বলতে এখানে বাংলাদেশ নয়, একটা অঞ্চল। সেটা আমার নিজ অঞ্চল এবং সেই ভাষা আঞ্চলিক ভাষা।

দুবাই, আবুধাবী থেকে যত রোগী আসে প্রত্যেকেরই মুখে একই কথা, "ওরা আমাদের কথা বুঝে না তো, তাই সব কথা খুলে বলতে পারি না। আর ওরাও কি বলে বুঝি না, সে কারণে হয়ত আমার অসুখটা ঠিকভাবে ধরা পড়েনি।" এসব দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষা উন্নতমানের। এক্স-রে, ল্যাবরেটরী পরীক্ষা অনেকটা পরিচ্ছন্ন। এনডোসকপি আমাদের অনেক অনেক আগে থেকেই এরা শুরু করে। তবুও কেন এমন হয়? রোগীর সামান্য কয়েকটি কথা যা উল্লেখ করা হল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মান সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিলাম তাতে এর জবাব মিলে।

শুধু ঔষধে চিকিৎসা হয় না

ডাক্তার আর রোগীর শুধু সোজাসুজি সম্পর্ক নয় বরং খোলাখুলি আলাপ, পরস্পরের উপর পরস্পরের বিশ্বাস, সামাজিক পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে যে চিকিৎসক রোগীর সামনে নিজেকে একজন সহানুভূতিশীল সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণ করতে না পারেন শুধু ওষুধ সেখানে কার্যকরী হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। একটা রাসায়নিক ব্যতিক্রমের জন্য আর একটা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা হতে পারে তবে তাকে যথার্থ চিকিৎসা বলা যায় না। যেমন রোগ এবং রোগীকে আলাদাভাবে নেওয়া যায়না। একটার সাথে আরেকটার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। চিকিৎসক এবং রোগীর মাঝখানে যেখানে যন্ত্রপাতি এবং সহকারীবৃন্দ বিদ্যমান, সরাসরি চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক যেখানে থাকেনা, চিকিৎসা সেখানে ব্যাহত হয়। দেশীয় ওষুধ হয়ত এ কারণেই অনেকক্ষেত্রে কার্যকরী হয়, আধুনিক চিকিৎসা যেখানে বিফল প্রমাণিত হয়েছে। রোগী এবং চিকিৎসকের এখানে সরাসরি সম্পর্ক। এটাই সফলতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এখন আমরা জানি সব অসুখে ওষুধ লাগেনা। ঔষধ লাগবেনা কথাটা বলা যত সহজ রোগীকে গ্রহণ করানো তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। চিকিৎসককে সহৃদয়তার সঠিক পরিচয় দিতে হবে। প্রয়োজন না হলেও রোগীর সব কথা শুনতে হবে। গুছানো অগুছানো সব দলিলপত্র দেখতে হবে। অতি মনযোগের সাথে রোগীকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে দু'একটা অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষাও চালাতে হবে। অর্থাৎ এমন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে সমস্ত বিষয়টি পূর্বাপর বিবেচনা যে করা হয়েছে তার প্রমাণ দিতে হবে।

একটি প্রশ্ন এখানে এসে যায়। অত সময় কোথায়? কথাটা নেহাৎ অযৌক্তিক নয়। তবে এটা এমন একটা ব্যাপার যা করতেই হবে, তা না হলে যেটা সর্বজনীন প্রচলিত সত্য সেটাকে অগ্রাহ্য করে একটা রোগগ্রস্ত মানুষ কি করে ওষুধ খাওয়া থেকে নিজকে বিরত রাখবে? অনেক সময় আমিও যে সে সমস্যার সম্মুখীন হই না তা নয়। সমস্যাটার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। আমি বলি দু'একদিন সময় নিয়ে হলেও রোগের সমস্ত ইতিহাসটা যেন লিখে দু' একদিন আগে আমার হাতে দেয়া হয়। অবসর সময়ে আমি আগাগোড়া দেখে নেই কাহিনীতে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে সেটাকে চিহ্নিত করি। পরের দিন যদি তার সাথে কোন্ ওষুধের প্রয়োজন সেই লেখা প্রেসক্রিপশনটা সাথে দেই রোগী নিশ্চিত হয় যে খামখেয়ালীর সাথে নয় বরং সবকিছু বিবেচনা করে এটা লেখা হয়েছে।

অগ্রগতির আরেক দিক

পেশাজীবনের শুরুতে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল সীমিত। ওষুধপত্র, যন্ত্রপাতি প্রায় একই পর্যায়ের। বিগত কয়েক দশকে এসব দিকের অগ্রগতি হয়েছে প্রচুর। রোগ নির্ণয়ে এগুলো বহুলাংশে সহায়ক। অপপ্রয়োগ অন্যদিকে অসহায় রোগীকে একটা পরীক্ষাগারের বিশেষ প্রাণীতে পরিণত করে। মাঝে মাঝে দেখা যায় একই সাথে দশ পনরটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

কিছু প্রাণ-রসায়ন (Bio-chemical) আর কিছুটা রঞ্জন-রশ্মির সাথে সংযুক্ত একটা সাধারণ রোগের কথা ধরা যাক। সাধারণ বলতে এখানে রোগের প্রকৃতি বুঝাচ্ছি না। এর বিস্তৃতিকে বুঝাতে চাই। একদিকে যেমন এ সমস্ত রোগী নানা লক্ষণ এবং জটিলতা নিয়ে আসতে পারে অন্যদিকে হয়ত সেই জরীপে ধরা পড়েছে অথবা হয়ত নতুন চাকুরির মেডিক্যাল পরীক্ষায় প্রথমবারের মত জানা গেছে।

ঐখানে রোগটা হল উচ্চ রক্তচাপ। নানা কারণে এটা হতে পারে। তবে যেটা আসল কারণ শতকরা নব্বই জনের বেলায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সে কারণে এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে এসেনসিয়াল (Essential) অর্থাৎ অজানা কারণে উচ্চ রক্তচাপ। জানা কারণগুলোর মধ্যে কিডনি বা বৃক্কের রোগ প্রধান। নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করার পর এই বিশেষ অঙ্গের কারণে রক্তচাপ হয়েছে কি না তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে কোন দোষ না থাকলে কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ আই.ভি.ইউ. অর্থাৎ একটা রাসায়নিক পদার্থ ইনজেকশন দিয়ে মূত্রকোষ এবং মূত্রের নির্গমন পথের এক্স-রে পরীক্ষা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবুও অনেকে নিয়মিতভাবে এই উপদেশ দিয়ে থাকেন।

একটা ভাইরাসজনিত জণ্ডিস বা পাণ্ডুরোগে একটা ভাইরাসের জন্য এইচ. বি.এস.এস.জি. আরেকটা লিভারের এস.জি.পি.টি. আর হয়তো বা বিলিরুবিন এই তিনটি পরীক্ষাই যথেষ্ট ; অথচ হিসাব না করে যৌক্তিকতা বিচার না করে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার লম্বা ফর্দ দিয়ে দেই। এতে অনেকের আর্থিক বোঝা বাড়ে এবং প্রায় সকলেই মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। ভাবে, অসুখটা নিশ্চয় জটিল হবে তা না হলে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেন?

রোগ নির্ণয়ে বিগত এক যুগ এদিকে যেমন অতুলনীয় অবদান রেখেছে অন্যদিকে তেমনি অভাবনীয় সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আলট্রাসনোগ্রাফী এখন হাসপাতালে সীমাবদ্ধ নয়। বলতে গেলে যেখানে সেখানে, সি.টি. স্কেন এখন ঢাকা শহরে রাস্তার দু'পাশে দুটি। এন. এম. আর আগমনের প্রতিক্ষায়। তুলনামূলকভাবে

আলট্রাসনোগ্রাফী এবং রেডিওলজি খরচের দিকে কাছাকাছি। নতুনের প্রভাবে আলট্রাসনোগ্রাফী এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এর সীমাবদ্ধতা আছে। সেটা যতনা যান্ত্রিক তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন যারা এ মেসিনের পেছনে কাজ করে তাদের অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ব। স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অদক্ষ লোক যেমন একটা দামী ক্যামেরার সাহায্যে উচ্চমানের ফটো তুলতে সক্ষম হয় না, এটাও তেমনি। দক্ষতার অভাবে অপক্ক মতামত দিয়ে অনেকে চিকিৎসককে ভুলপথে পরিচালিত করে। কত ইকোজেনিক স্যাডো শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

সি. টি. স্কেন বিরাট ব্যয়বহুল। অনেক বিচার-বিবেচনা করে ধার্য করা হয়েছে এর একটা পরীক্ষা করতে প্রায় চার হাজার টাকা লাগে। সামান্য প্রাণ-রাসায়নিক পরীক্ষা, যেখানে বিশেষ অঙ্গের দোষত্রুটি ধরতে সক্ষম অথবা সাধারণ এক্স-রে যেখানে রোগের সন্ধান দিতে পারে চমকপ্রদ সি. টি. স্কেন করার নির্দেশ দিয়ে রোগীর আর্থিক অনটন সৃষ্টি করা কতটুকু যুক্তিসম্মত ভেবে দেখতে হবে।

আরেকটা উদারহণ ইকোকার্ডিওগ্রাম। কেউ যদি বলে স্টেথেসকপ-এর দিন চলে গেছে তাহলে এ অবদানের আবিষ্কারের কোন মনকষ্ট হবে কি না জানি না। আমি বলব এটা দুর্ভাগ্যজনক। রোগের ইতিহাস, সযত্ন শারীরিক পরীক্ষা, বিভিন্ন লক্ষণ উদঘাটন এবং সবগুলো পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসার যে রীতিনীতি তা চলতেই থাকবে, চালাতেই হবে। বিশেষ কেন্দ্রে অবস্থিত এ যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সবক্ষেত্রে নয়। আজগুবি বলেও যদি ভাবেন, সহৃদয় সরকার আমাদের জন্য যেন তার ধনের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। বড় বড় হাসপাতালে বহু যন্ত্রপাতি লাগাতে পারব। আমি বলব, এমনতর সাহায্য সুযোগের চেয়ে দুর্ভোগের কারণ। যন্ত্র পেলে, লোক কোথায়? যদি বলেন সবই পাব আমি বলব তাহলেও না। এই অর্থ নিয়ে আপনি যে রোগ নির্ণয়ের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করছেন সেটা শুধু সীমিত সংখ্যক লোকের বিশেষ জটিল রোগের জন্যে। এটা নিঃসন্দেহে অর্থের অপচয়।

ভেবে দেখতে হবে আমরা কোনটা চাই। কয়েকটা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে যেখানে চিকিৎসা সম্ভব নয় যে কোনরকমে রোগ নির্ণয়, নাকি অগণিত অসহায় রোগী যাদের সারিয়ে তোলা সম্ভব এমন রোগের চিকিৎসার সুযোগ দেখা।

সেদিনকার একটা ঘটনার কথা বলি। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অনেকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। একগাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজ, এক্সরের এক বিরাট বাণ্ডেল আর অনেকগুলো প্রেসক্রিপশন প্রত্যেকটাতে চার পাঁচটা করে ঔষধ। রোগ বর্ণনা দিতে গিয়ে ভদ্রলোক কোন এক সময় বলে ফেললেন, তার মুখটা বাঁ দিকে কেমন ভারী ভারী। নাকের দিকটাও কেমন যেন লাগে। এক্সরে করে

দেখা গেল বাঁ দিকের সাইনাস-এ কিছু একটা জমে আছে। এখানে পুজ জমেছে। সিরিঞ্জের মাধ্যমে এটা বের করে এন্টিবায়টিক দেয়ার পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ। তার এতদিনের শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা শুধু অসম্পূর্ণ রোগের ইতিহাস এবং এলোমেলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে। অপরিহার্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, নতুন নতুন ওষুধের আবির্ভাব চিকিৎসা জীবনে একটা চ্যালেঞ্জ। প্রচারপত্রের মাধ্যমে প্রত্যেকটা নতুন ওষুধ উন্নততর কার্যকারিতার দাবী রাখে। চিকিৎসক এখানে বিভ্রান্ত হয়। স্বল্পকালীন আলোড়ন সৃষ্টি করে চিরতরে বিদায় নিয়েছে এমন ওষুধের দৃষ্টান্তও মিলে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, কার্যক্রম এমনকি ওষুধের বাজারদর সবকিছুই ওষুধের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে। এক হিসেবে বলতে গেলে যে ওষুধ বহু পরীক্ষিত কালের গতিতে বিলুপ্ত হয়নি সেটাকেই বেছে নেয়া নিরাপদ। চমক লাগাবার উদ্দেশ্যে নতুন ঔষধের ব্যবহার অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি করে, সমাধান দেয় না।

এমন রোগ আছে যেখানে একটা চিকিৎসা করতে গেলে আরেকটা রোগের সৃষ্টি হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলোকে মেনে নিতেই হবে, যেমন একটা এস. এল. ই. রোগীর চিকিৎসা করতে হলে আমাকে প্রেডনিসোলন দিতে হবে এবং এর ফলে সে রোগীর যদি অন্য লক্ষণ (যেমন কুসিংগস) লক্ষণ প্রকাশ পায় সেটা গ্রহণ করতে হবে।

অনেক ক্যান্সার জাতীয় অসুখের চিকিৎসা করতে গেলে মাথার চুল পড়া থেকে শুরু করে চেহারারও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। রোগ এবং চিকিৎসার বিবেচনায় এ অবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই বলে একটা হাঁপানী রোগীর যেখানে অন্য ওষুধে দমন করা সম্ভব সেখানে অহেতুক অধিক পরিমাণে করটিসোন অধিক দিন ধরে দিয়ে রোগীর চেহারার পরিবর্তন, এমনকি অস্থির দুর্বলতা টেনে এনে রোগীকে অচল করে রাখা যুক্তিসঙ্গত হতে পারেনা।

আজকের চ্যালেঞ্জ

আজকের চিকিৎসক কয়েক দশক আগের চিকিৎসকের চাইতে একদিকে যেমন ভাগ্যবান অন্যদিকে তেমনি বিপন্ন। তিনি এখন অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা ; আবার অনেকের মতে নৈতিক সুস্থতাও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব বিলুপ্তির পথে হলেও মানুষে মানুষে সম্পর্ক দিন দিন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এককালে যেখানে ডাক্তার এবং রোগীর পরস্পরের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ, গভীর, এখন সেটা পরোক্ষ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। কিছু সংখ্যক সহকারী, অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নামী দামী যন্ত্রপাতি রোগ নির্ণয়ে এখন অনেকটা সহায়ক হলেও চিকিৎসা এখানে সঙ্কটের সম্মুখীন।

একজন রোগী তার রোগের লক্ষণ নিয়ে চিকিৎসকের সাহায্যের আশায় এগিয়ে আসলেও সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সে মুক্ত নয়। রোগের মূল কারণ হয়তো বা সেখানেই নিহিত। একটা জীবাণুজনিত রোগ মানুষের শরীরে শুধু জীবাণু প্রবেশের উপর নির্ভর করেনা, তার বিস্তারে অনুকূল অবস্থারও প্রয়োজন।

রোগ ও রোগীকে আলাদা করে দেখলে ভুল হবে। সামগ্রিকভাবে সমস্যার সমাধান না হলে ওষুধ যতই কার্যকরী হউক না কেন রোগ নিরাময় করতে পারেনা। বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হউক না কেন এবং প্রয়োগের ফলে চিকিৎসক এবং রোগীর যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সেটা যদি দুর্বল হয়, সফলতা ব্যাহত হবেই। একটা দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগী একজন চিকিৎসকের সহানুভূতিশীল চাহনি আর কোমল স্পর্শে যতটুকু সান্ত্বনা পায় কোন শক্তিশালী ওষুধ তা দিতে পারে না। রোগ নির্ণয়ে এবং চিকিৎসায় বিজ্ঞানের অবদান যেন চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কে ব্যবধান বৃদ্ধি না করে আজকের চিকিৎসককে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

একজন চিকিৎসকের দৈনন্দিন জীবনে নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান সহায়ক হতে পারে, স্থান দখল করতে পারেনা।

শহীদ স্মৃতি বক্তৃতা ঃ ২৪শে মার্চ ১৯৮৭
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ স্মরণিকা থেকে মুদ্রিত।

সকল গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন

মেঘনা ঃ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা কতটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন?

নুরুল ইসলাম ঃ যে কোন অপরিচিত এবং অজানা জিনিস যে কোনে লোকের কাছেই দু'ভাবে প্রকাশ পায়। কখনো ভয়ংকরভাবে, আবার কখনো স্বাভাবিকভাবে। যে কোন জিনিসই জানা না থাকলে চেনা হয়না, চেনা না থাকলে বুঝা যায়না। শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারটা তাই। শিক্ষা ও গবেষণাকে কিছুটা আলাদাভাবে দেখতে হবে। কোনটারই কোন বাউণ্ডারী বা সীমা থাকা উচিৎ নয়। শিক্ষার যেমন শেষ নেই, তেমন গবেষণারও শেষ নেই। তবে শিক্ষার একটা বিশেষ পর্যায়ে গবেষণার শুরু। অর্থাৎ শিক্ষা ও গবেষণা — দুটোর আলাদাভাবেই জন্ম ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। শিক্ষার শুরু থেকে বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষা থাকা বাঞ্ছনীয়। যখনই উচ্চতর শিক্ষায় যাবো তখনই ভিন্ন পরিবেশে যেতে হবে। একটা আলাদা দুনিয়ায় যেতে হবে। সেখানে একটা ভাষা জানতেই হবে। তাই দেশের জন্য মাতৃভাষা যতটুকু আদরের হওয়া উচিৎ তেমনি একটি আন্তর্জাতিক ভাষাও জানতে হবে।

মেঘনা ঃ এই আন্তর্জাতিক ভাষা বলতে কি ইংরেজি ভাষার কথা বলছেন?

নুরুল ইসলাম ঃ না, সে ভাষা যে ইংরেজি হবে এমন কোন কথা নেই। তবে আমি বাংলাদেশের জন্য ইংরেজিকেই প্রাধান্য দেব। এজন্য যে, দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বলতে যা বোঝায়, তাদের বেশির ভাগ লোক অন্য ভাষার চেয়ে ইংরেজি ভাষা বেশি জানে। সে যে কোন রাজনৈতিক কারণেই হোক না কেন, ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে এটাকে মেনে নিলে উচ্চতর শিক্ষায় এবং গবেষণায় এ ভাষাকে গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে দুটো ভাষা জানতেই হবে। একটা মাতৃভাষা বাংলা, দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক ভাষা। সেটা ইংরেজি। বরং এটাকে ইংরেজি ভাষা না বলে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা উচিৎ।

মেঘনা ঃ বাংলাদেশের ভেতরে যতটা গবেষণা করা সম্ভব, তা কি বাংলা ভাষা প্রয়োগে করা যেতে পারে?

নুরুল ইসলাম ঃ দেশের ভেতরে থেকে গবেষণা করতে গেলেও শুধুমাত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। অর্থাৎ গবেষণা করতে গেলে বাইরের কিছু জানতেই হবে। আর বাইরের কিছু জানতে হলেই বিদেশী একটা ভাষাও জানতে হবে। গবেষণার ইংরেজি শব্দ হলো রিসার্চ। সার্চ মানে অনুসন্ধান। রিসার্চ মানে বার বার অনুসন্ধান। সুতরাং বিদেশী একটি ভাষা না জানা থাকলে, বিদেশী বিষয়ও জানা সম্ভব নয়। আর বিদেশী কিছু না জেনে গবেষণাও ফলপ্রসূ হবেনা। হওয়ার কথা নয়। কারণ আমরা এখনো ওই পর্যায়ে যাইনি।

মেঘনা ঃ এখন চিকিৎসাবিদ্যায় পুরোপুরি বাংলা চালু করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

নুরুল ইসলাম ঃ এখন ছাত্ররা শুরু থেকেই যদি শুধুমাত্র বাংলা শিখে আসে, তবে বিদেশে কোন ডিগ্রী নিতে গেলেই সমস্যায় পড়বে। আমি মনে করি যে, কোন গ্রামীণ ডাক্তারকে ইংরেজি শেখানো চলবেনা। আবার পোস্ট গ্রাজুয়েটেও বাংলা থাকলে চলবেনা।

মেঘনা ঃ আপনি চিকিৎসাবিদ্যার যেসব বই বাংলা ভাষায় লিখেছেন, তা ছাত্রদের কতটুকু কাজে লাগছে?

নুরুল ইসলাম ঃ আমি মনে করি আমার এসব বই সবার জন্যেই কিছু না কিছু উপকারে আসবে। ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক সবার জন্যেই কাজে লাগবে। কারণ, যাদের উদ্দেশ্যে আমার বইগুলো লেখা, আমি মনে করি, বাংলা ভাষা তাদের সকলেরই ভাষা। শুধু ভাষা হিসাবে নয়, বুঝবার এবং উপলব্ধি করবার ভাষা হিসাবে। এখানে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভিত্তিহীন কতগুলো কুসংস্কার তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এবং গ্রামবাংলার, অগণিত অসহায়, অল্প-শিক্ষিত, দরিদ্র জনসাধারণের উদ্দেশ্যে।

মেঘনা ঃ ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসাবিদ্যায় এ ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলুন?

নুরুল ইসলাম ঃ বাংলা ভাষার যে আন্দোলন হয়েছিল, ওটা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি এবং সর্বস্তরে এ ভাষা চালু হওয়ার জন্যে। কিন্তু সর্বস্তরে এ ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা যেন শিক্ষা

বিজ্ঞান থেকে পিছিয়ে না যাই। সেটাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যখন যেখানে প্রয়োজন বিদেশী ভাষার সাহায্য নেব। আবার যখন প্রয়োজন আমাদের মাতৃভাষাকে উৎকৃষ্ট করবো। বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষা করতে পারবনা হয়ত। তবে বাংলা ভাষায় গবেষণাকে হয়তো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো। যদি তা সমৃদ্ধশালী হয়। বিজ্ঞানের দিক থেকে যদি আমরা সমৃদ্ধ হই, তবে বিদেশীরা তাঁদের প্রয়োজনেই হয়তো তাঁদের ভাষায় রূপান্তর করবে, অথবা বাংলা ভাষার ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

মোটকথা, বাংলাকে দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে নিতে পারি। কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যাবেনা। ভবিষ্যতে হয়তো হতে পারে। তবে খুব নিকট ভবিষ্যতে নয়। তাই বলে বসে থাকলেও চলবেনা।

শুধু বাংলা চর্চার সিদ্ধান্ত একান্তই আবেগতাড়িত। তা আমাদের সংস্কৃতি ও মননচর্চাকে দরিদ্র করবে।

বিদেশকে যদি আমাদের দেবার কিছু থাকে তা যে ভাষায়ই লিখি না কেন তাদের নিতেই হবে। আবার বিদেশ থেকে যদি নেবার কিছু থাকে, তা যে ভাষায়ই লেখা হোক না কেন, তা নিতে হবে। শুধু আবেগের বশে বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে অন্য ভাষাকে অবহেলা করে নানা দিক দিয়ে হয়তো আমরা পিছিয়ে পড়তে পারি। বিদেশী ভাষাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়াকে সাংস্কৃতিকভাবে আমি সংগত মনে করিনা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা যে উদ্দেশ্যমূলক, আমাদের পিছিয়ে ফেলার একটা অপ-প্রয়াস একথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ চীন, রাশিয়া এবং জাপানের কথা বলা যায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব এ সমস্ত দেশে বেড়েই চলেছে। তাতে তাদের জাতীয় ভাষার কোন অংগহানি হয়েছে বলে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে মনে হয় না। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ভাষা হিসেবে যদি ভিন্ন ভাষাকে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মনে না করে একটা আদান প্রদান কিংবা বুঝাবুঝির মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, তবে আমরা কেন পারবো না?

মেঘনা : সাহিত্যাঙ্গনেও আপনার বিচরণ রয়েছে। কোন কোন লেখকের লেখা আপনি পড়েছেন, এই মুহূর্তে কার কার নাম মনে পড়ছে?

নুরুল ইসলাম : আসলে লেখকদের লেখা পড়ার চেয়ে চিকিৎসক হিসাবেই আমার সংগে অনেক লেখকের পরিচয় হয়েছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, কবি জসিমউদ্দীন, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গনি হাজারী, অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন, সুফী জুলফিকার হায়দার, কবি শামসুর রাহমান, বেগম সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, কবি বেনজীর আহমদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, কবি মহাদেব সাহা — আমি তাঁদের চিকিৎসা করেছি। সুতরাং তাঁদের সংগে খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল, যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের সংগে এখনো আছে। কবি সানাউল হক তো আমার সেক্রেটারীই ছিলেন। এসব লেখক তাঁদের লেখা অনেক বই আমাকে উপহার দিয়েছেন। এই মুহূর্তে আর কারো নাম মনে পড়ছেনা।

সাপ্তাহিক মেঘনার সাথে সাক্ষাৎকার : ১৭-২-১৯৮৮ইং।

'আধুনিক'-এর তামাক ও ধূমপান বিষয়ক প্রথম জাতীয় সেমিনার, ১৯৮৮

স্বাগত ভাষণ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীপরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিকবৃন্দ এবং বন্ধুগণ —

আধুনিক-এর ইতিহাসে আজকের দিনটি নিতান্ত গৌরবের এবং আনন্দের। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে আমি এর অংশীদার। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আপনাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানবার সৌভাগ্যে আমি গৌরবান্বিত এবং সমভাবে আনন্দিত।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে তামাক বিরোধী আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে বিশেষ তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। জনগণের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এটা তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার অন্যতম স্বাক্ষর।

এখন আমি তামাক ও ধূমপান সম্বন্ধে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এতে এই সম্মেলনের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে।

তামাকের ব্যবহার বর্তমান জগতের প্রতি এক বিরাট হুমকি। বিশ্বে প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১০ লক্ষ লোক ধূমপানের ফলে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। হিসাবে দেখা যায় ২000 সাল নাগাদ এর সংখ্যা হবে দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০ লক্ষ। বিগত দশকে ফুসফুসের ক্যান্সার, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদরোগ ইত্যাদির সাথে ধূমপানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফুসফুসের ক্যান্সারে যত লোক প্রাণ হারায় তাদের শতকরা ৮৫ জন ধূমপানজনিত কারণে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদরোগের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ২৫ ভাগ ধূমপানজনিত কারণেই। আমেরিকায় মহিলাদের ধূমপান বৃদ্ধির সাথে ফুসফুসে ক্যান্সারের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ সালে একটা জরিপে দেখা যায় এই ক্যান্সার স্তনের ক্যান্সারের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ফুসফুসের ক্যান্সার যখন ধরা পড়ে তখন তা চিকিৎসার বাইরে। স্বল্প সংখ্যক যে কয়জনের অপারেশন সম্ভব, তাদের আয়ুষ্কাল অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর ।

শরীরের এমন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই যেটা ধূমপানের কুফল থেকে রেহাই পেতে পারে। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ থেকে পায়ে গ্যাংগ্রিন যে কোন ব্যাধি ধূমপানের কুফল হিসাবে দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে পেটের আলসার একটা সাধারণ ব্যাধি। এই ধরনের রোগীর সংখ্যা অনেক। ধূমপায়ী আলসার রোগী সময়মত চিকিৎসার সুফল লাভ করতে পারেনা। তাদের আলসার নিরাময় হতে অনেক বেশি সময় লাগে।

ধূমপানজনিত বিষক্রিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর ফলে মূত্রাশয়ের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ধূমপান করলে নবজাত শিশু ক্ষীণকায় হয় এবং প্রথম কয়েক মাসে বিভিন্ন ধরনের শ্বাসরোগের প্রবণতা থাকে। এ সমস্ত শিশুর মৃত্যুর হার বেশি। ধূমপান রক্তনালীকে সংকীর্ণ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ হ্রাস করে। স্ট্রোক থেকে মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের মধ্যেই বেশি। ধূমপায়ীদের মধ্যে 'ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন'-এর হারও অধূমপায়ীদের চেয়ে বেশি। সাম্প্রতিক একজন বিশিষ্ট যৌন বিশেষজ্ঞের জরিপে দেখা গেছে ধূমপায়ীদের মধ্যে পুরুষত্বহীনতার সংখ্যা অধূমপায়ীদের তুলনায় অনেক বেশি।

পরিবেশের উপর ধূমপানের কুফল কিছুদিন আগে পর্যন্ত অনুভূতি, বিতৃষ্ণা এবং সামান্য কিছু শারীরিক প্রভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। যেমন চোখ, নাক ও গলায় কিছু অস্বস্তি ভাব। ধূমপায়ীরা কোন সময় নিজেদের অপরাধী মনে করতেন না। কারণ তাদের ধারণা ছিলো ধূমপান পরিবেশকে দূষিত করে না।

সম্প্রতি ঐচ্ছিক বা প্রত্যক্ষ ধূমপায়ী এবং অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। অনৈচ্ছিক বা পরোক্ষ ধূমপায়ী কতোটুকু বিপদগ্রস্ত হবেন তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। যেমন আবাসিক পরিবেশেও ধূমপানের কুফল পরিলক্ষিত হয়েছে। ধূমপায়ী মাতা-পিতার শিশুদের মধ্যে বিবিধ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের প্রকোপ তাদের জন্মের প্রথম বছরে বেশি করে পরিলক্ষিত হয়।

গর্ভাবস্থায় ধূমপান জরায়ুর পরিবেশ দূষিত করে। ফলে নবজাতকের ওজন তুলনামূলকভাবে কম হয়। এমনকি জন্মের কিছুদিনের মধ্যে এ সমস্ত শিশুর মৃত্যুর হারও অনেক বেশি। যে সমাজে ধূমপায়ীদের সংখ্যা নগণ্য নয় অথবা যেখানে স্বল্প পরিসর স্থানে অনেক লোক জমা হয়, সেখানে ধূমপানের বিপদ একই পরিবেশের সবার বেলায় প্রয়োজ্য।

ধূমপান বিরোধী আন্দোলনের ফলে পশ্চিমা দেশগুলিতে যখন এর ব্যবহার কমতির দিকে, তৃতীয় বিশ্বের তামাক ব্যবসায়ীদের জোরালো প্রচার এবং দুর্বল বাধানিষেধের ফলে এর প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৭৩ সালে ১৯ বছরের উর্ধে আমেরিকানদের মাথাপিছু সিগারেটের ব্যবহার ছিল ২৯৭ প্যাকেট। ১৯৮৪ সালে তা নেমে আসে ১৭০ প্যাকেটে। ১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৫৬ মিলিয়ন পাউণ্ড

তামাক অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। এসব তামাক নানাভাবে তৃতীয় বিশ্বে চালান দেওয়া হয়। বস্তুত, উন্নয়নশীল দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সংকটময় এবং দুঃখজনক। প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৬০ জন পুরুষ ধূমপায়ী।

১৯৮৪ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বাংলাদেশকে অন্যতম বিশেষ ধূমপায়ী দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, বয়স্কদের মধ্যে এখানে শতকরা ৭০ জন পুরুষ ধূমপান করে। এই হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে পুরুষ ধূমপায়ীর সংখ্যা কমপক্ষে ২, ০০,০০,০০০ (দুই কোটি) এবং মহিলা ধূমপায়ীর সংখ্যা আনুমানিক ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ)।

বাংলাদেশে ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যুর হার নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও পৃথিবীর নানা দেশের তথ্য থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমেরিকায় ধূমপানজনিত রোগে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। যুক্তরাজ্যে মৃত্যুবরণ করে ১ লক্ষ লোক, জার্মানীতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ইতালীতে ৭০ হাজার আর অষ্ট্রেলিয়ায় ২৫ হাজার।

সারা বিশ্বে ২৫ লক্ষ লোক তামাকজনিত রোগে প্রতি বৎসর মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ প্রতি ১৩ সেকেণ্ডে ১ জন লোক প্রাণ হারায়।

সামগ্রিকভাবে জোর প্রচারে এবং নানা বিধিনিষেধের ফলে উন্নত দেশগুলোতে যখন ধূমপানের পরিমাণ শতকরা ১.১ হারে কমে যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বে এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ হারে। সাম্প্রতিককালে যুক্তরাজ্যে ১০ লক্ষ, আমেরিকায় ৪০ লক্ষ এবং কানাডায় ৫৬ লক্ষ লোক ধূমপান বর্জন করেছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দরিদ্র দেশের শিক্ষাগত এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী তামাক ব্যবসায়ীরা নানা প্রচার এবং প্রলোভনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে তাদের প্রভাব বিস্তার করেই চলেছে। একটি হিসাবে দেখা যায়, তামাক শিল্প বিজ্ঞাপনের পেছনে প্রতিদিন ২৭,০০,০০০ ডলার খরচ করে। বৎসরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০,০০০০০০ (এক বিলিয়ন) ডলার। প্রেসিডেন্ট কার্টারের শাসনামলে ফেডারেল ট্রেড কমিশনের চেয়ারম্যানের হিসাব অনুযায়ী এই অর্থের পরিমাণ দুই বিলিয়ন ডলার।

জনবহুল বাংলাদেশে বেকার সমস্যা প্রকট। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তামাক শিল্প যদি বিলুপ্ত হয় বেকারত্বের সংখ্যা বাড়বে। এই ধারণা ভুল। কর্মক্ষমতা হ্রাস, স্বাস্থ্যখাতে অধিক ব্যয়, তামাকজনিত অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি এবং সর্বোপরি অকাল মৃত্যু — এসব হিসাব করে দেখলে বোঝা যাবে তামাক ব্যবসায়ে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। স্বল্প ব্যয়ে এই ব্যবসায়ে অধিক আয় চোখে ধরা পড়ে। দীর্ঘকালীন দৃশ্য এবং অদৃশ্য ক্ষতির পরিমাণ তলিয়ে দেখা হয় না বলে তামাকের আসল রূপ অনেকের

চোখে ধরা পড়েনা।

"আধুনিকের" স্লোগান "ধূমপানে বিষপান" নিয়ে শুরু। আমরা এখন বলি তামাক ও ধূমপান এ দুই-ই বিষপান। তামাকের ব্যবহার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহুলভাবে প্রচলিত। এর ফলে মুখ গহ্বর, খাদ্যনালীর উপরিভাগ, এমনকি সাইনাসের ক্যান্সারের প্রকোপ এই অঞ্চলে অনেক বেড়ে গেছে। নস্যি, গুল এবং পানের সাথে তামাকের ব্যবহার — এসব ক্যান্সারের কারণ হিসাবে এখন প্রমাণিত। এই বদঅভ্যাস সম্বন্ধে আমরা যদি সতর্ক না হই এবং জনগণকে অবহিত না করি, তাহলে সহজ সরল জনসাধারণ ধূমপানের পরিবর্তে অধিকতর পরিমাণ তামাকের ব্যবহারে লিপ্ত হবে। তামাক ব্যবসায়ীরা এর সুযোগ নেবে।

ধূমপানের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে পশ্চিমা দেশগুলিতে প্রচার অভিযান যখন তুঙ্গে, বিচক্ষণ তামাক ব্যবসায়ীরা তখন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে ধূমপান ছাড়া তামাকের অন্যান্য ব্যবহারে উৎসাহিত করতে। এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভাতা দিয়ে তাদের প্রচার অভিযান চালাবার জন্য নিয়োগ করা হয়। সকলেই এখন সজাগ। ধোঁয়াবিহীন ধূমপান (স্মোকলেস টোবাকো) এখন আর নিরাপদ বিবেচনা করা হয় না। সেই হিসাবে আমাদের এই সেমিনার শুধু ধূমপানের উপরে নয়, তামাক এবং ধূমপান নিয়ে।

আর একটা বিশেষ দিক এখানে আলোচনা করা দরকার। ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য নয়। ১৯৮৪ সালে যুক্তরাজ্যের আবাসিক এলাকায় ধূমপানজনিত কারণে ৬২০০ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। নানা কারণে আমাদের দেশে ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ডের নির্ভুল হিসাব দেওয়া অতো সহজ নয়। ১৯৮৫ সালে ফায়ার ব্রিগেডের রিপোর্ট অনুসারে ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ডের কারণে ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই তথ্য শহর নিয়ে। গ্রামবাংলার কথা ভেবে দেখলে এর ভয়াবহতা কিছুটা অনুমান করা সম্ভব। এখানকার প্রতিটি ঘর এমনভাবে তৈরি যে এখানে অগ্নিকাণ্ড অতি সহজ ব্যাপার। জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি যেখানে সেখানে ফেলে দিতে গ্রামবাসীরা অভ্যস্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এর কোন একটা এমন জায়গায় পড়ে যেখানে আগুন লাগা সহজ তাহলে গ্রামকে গ্রাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উজাড় হয়ে যেতে পারে। সেখানে ফায়ার ব্রিগেড নেই। সব জায়গায় উপযুক্ত পানির ব্যবস্থা নেই। অগ্নিনির্বাপক কোন সংগঠন নেই। শহরেও ভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুরূপ দুঃখজনক ঘটনা মাঝে মধ্যে দেখা যায় বস্তি এলাকায় অথবা পাটের গুদামে। এ সমস্ত কারণে ক্ষতির পরিমাণ আমাদের হিসাবের খাতায় লেখা থাকেনা। পত্রপত্রিকা মারফত একটা আনুমানিক হিসাব প্রচার করা হয়। সেগুলোকে আংশিক সত্য হিসাবে ধরে নিলেও ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ড যে একটা বিরাট আর্থিক ক্ষতির কারণ

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তামাকও ধূমপানের কুফল এখন স্বীকৃত ; বিতর্কের উর্ধে। দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে কয়েকটি দেশে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার কয়েকটা এখানে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

(১) সুইডেনে ধূমপানের উপর যে সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে তার ২০% ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে হবে। এদেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

(২) ক্যানাডিয়ান বিমান কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

(৩) হাঙ্গেরী তার ইউরোপীয় ১০টি ফ্লাইটে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

(৪) শিকাগো এয়ার সমস্ত ফ্লাইটে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এই কোম্পানীর ২০০ কর্মীর জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ অফিসে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৬) ক্যানাডার প্রভাবশালী পত্রিকা টরেন্টে 'গ্লোব এণ্ড মেইল' তামাক বিষয়ক বিজ্ঞাপন বর্জন করেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার তামাক এবং ধূমপান বিরোধী কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান "আধূনিক" (আমরা ধূমপান নিবারণ করি) এই প্রশংসার দাবীদার। কয়েকজন নিঃস্বার্থ কর্মীকে নিয়ে গঠিত এই সংস্থা তামাক এবং ধূমপানের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সরকার এবং জনগণকে অবহিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর সুফল ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে।

(১) রেডিও এবং টেলিভিশনে ধূমপানের বিজ্ঞাপন এখন নিষেধ।

(২) স্কুলের অস্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে 'ধূমপানে বিষপান' প্রবন্ধ সন্নিবেশিত।

তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অতি অল্প সময়ে কার্যকরী করেন।

(৩) অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলে ধূমপান নিষেধ।

(৪) সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(৫) একটা দৈনিক (খবর) একটা সাপ্তাহিক (ঢাকা কুরিয়ার) তামাক ও ধূমপান বিষয়ক বিজ্ঞাপন বর্জন করেছে।

(৬) বঙ্গভবন এখন ধূমপান মুক্ত এলাকা। 'আধুনিকের' অনুরোধে মহামান্য রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত বাংলাদেশ সরকার "আধুনিক"-এর তামাক বিরোধী আন্দোলনের সাথে যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর আমাদের এই প্রথম জাতীয় সম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি। আজকে তাঁর উপস্থিতিতে 'আধুনিক'-এর তরফ থেকে আমি কয়েকটি সুপারিশ পেশ করতে চাই।

(১) যেহেতু ধূমপানে আকৃষ্ট করার অন্যতম হাতিয়ার বিজ্ঞাপন এবং নানা প্রচারকার্য, সেহেতু তামাক এবং ধূমপানের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হউক।

(২) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানে যেমন, হাসপাতালে এবং ডিসপেনসারিতে ধূমপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হউক। স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যহানিকর কর্মকাণ্ড কখনও সহায়ক হতে পারে না।

(৩) সকল যানবাহন ট্রেন, বাস, লঞ্চ ইত্যাদিতে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হউক। এতে শুধু নিজেদের স্বাস্থ্যহানি নয়, অধূমপায়ীদেরও অনেক দুর্ভোগ হয় এমনকি অনেক সময় সিগারেটের আগুনে বিরাট ক্ষতি হতে পারে।

(৪) ছাত্রদের সামনে শিক্ষকদের ধূমপান নিষিদ্ধ করা হউক। ছাত্ররা শিক্ষকদের স্বভাবতই অনুকরণ করে। তারা আদর্শ হিসাবে ছাত্রদের ধূমপানে নিরুৎসাহিত করার বিরাট শক্তি।

(৫) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তামাক বিষয়ক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হউক। এ বয়সে অনেকে ধূমপান শুরু করে।

(৬) তামাক চাষের জমিতে পর্যায়ক্রমে বিকল্প হিসাবে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হউক। এতে আমাদের খাদ্য ঘাটতির অনেকটা লাঘব হবে। অনেক আর্থিক ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এ ব্যবস্থার সুফল অনেক।

(৭) বঙ্গভবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সকল সরকারী অনুষ্ঠানে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হউক। এটা অর্থের অপচয় রোধ করবে।

(৮) অধূমপায়ীদের জীবনবীমার কিস্তির পরিমাণ ধূমপায়ীদের তুলনায় কম করা হউক। ধূমপানে আয়ু কমে। কাজেই এটা যুক্তিসঙ্গত।

(৯) চাকুরি এবং পদোন্নতি এই উভয় ক্ষেত্রে অধূমপায়ীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হউক। ধূমপান কর্মক্ষমতা কমায় ; যতো বোঝা বাড়ায়।

(১০) প্রত্যেক সিনেমা এবং নাটক ধূমপানবর্জিত হউক। বরং এতে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হউক।

(১১) সিগারেট কোম্পানী কতৃক আয়োজিত খেলাধুলা প্রতিযোগিতা এমনকি সামাজিক কর্মকাণ্ড যেমন বৃক্ষরোপণ নিষিদ্ধ করা হউক। এ সমস্ত কর্মসূচী নিতান্ত ভাওতাবাজী এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে ধূমপান বিরোধী আন্দোলন কিংবা আইনকানুনকে পাশ কাটাবার অনন্য ব্যবস্থা।

(১২) অধূমপায়ীর অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন প্রণয়ন করা হউক। ধূমপান প্রচলিত থাকলে অধূমপায়ীরা নিরাপদ হতে পারেনা।

(১৩) ধূমপানজনিত মৃত্যুর জন্য তামাক ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হউক।

(১৪) বর্তমানে তেজগাঁও আবাসিক এলাকায় প্রতিষ্ঠিত তামাকের কারখানা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা হউক। এর অবস্থান সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার স্বাক্ষর বলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

(১৫) ধূমপায়ী ইমামের পেছনে নামাজ মাকরুহ। ধূমপায়ী ইমামদের সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে নিরুৎসাহিত করা হউক। তারা আদর্শবিচ্যুত এবং মুসলিমদের ভুলপথে নিতে পারে। অন্যদিকে তাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণযোগ্য হলে সমূহ বিপদ। এ ব্যবস্থা সকল ধর্মীয় নেতাদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

উপসংহারে বলতে চাই, "আধূনিক" শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, সমগ্র জাতির কল্যাণে একটি প্রতিশ্রুতি।

এটা আমার, আপনার, সকলের। সমবেতভাবে জাতির কল্যাণে আমরা যদি ধূমপান নিবারণ করি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত হবে সুখের, স্বাস্থ্যের, মঙ্গলের। মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে "আধূনিক" হউক আমাদের অঙ্গীকার।

আইডিই বাংলাদেশ-এর ১২তম কাউন্সিলর সম্মেলন (৮ ও ৯ ই জুলাই ৮৮)-এ বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক এবং পেশাজীবী বন্ধুগণ,

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স-এর ইতিহাস আজকে আমরা কিছুটা অবগত হলাম। তাঁদের সমস্যা আমাদের সকলেরই প্রায় কিছু না কিছু জানা। আবার নতুনভাবে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আপনাদের প্রতিনিধির সাথে মাত্র কয়েক দিনের আলোচনায় আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমি এটুকু বুঝি, যে সমস্যা আপনাদের সামনে, যে সমস্যা নিয়ে আপনারা বারবার সরকার এবং জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, জানবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সে সমস্যাকে আমরা যদি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করি, তবে গরমিল বিশেষ কোন ক্ষেত্রে তেমন দেখিনা।

একটা বিষয় জানতে পেরে আমি অত্যন্ত খুশি এজন্য, যে কোন পেশা যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে, সেই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম, অন্যদিকে তেমনি সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি। প্রতিনিধিত্বশীল ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত। আজকের এই সম্মেলনে আগত সমগ্র দেশের প্রতিনিধিগণ আপনাদের শক্তি সম্পর্কে যতটুকু অবগত আছেন, তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করি আমি। আজকে এই সম্মেলনে আমি দু'একটা বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। প্রথমেই বলতে চাই, চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রের কথা। ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে আজ রেষারেষি — ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে। এটা জাতির জন্য ক্ষতিকর।

ডাক্তারদের মধ্যেও একই অবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলেছে এলএমএফ ডাক্তার এবং এমবিবিএস ডাক্তারদের মধ্যে। তারপর এই রেষারেষির ফলে এলএমএফ প্রথার বিলুপ্তি হয়। প্রথমে কনডেন্সড এমবিবিএস কোর্স করে ওদেরকে মেডিকেল কলেজগুলোতে সাড়ে ৩ বছরের কোর্সের সুযোগ দেয়া হত। এভাবে প্রায় সব এলএমএফ এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পায়। এভাবে আন্দোলন চালিয়ে এলএমএফ কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কারা আন্দোলন করলো? এলএমএফ ডাক্তাররা। ওরা

বললো, আমরা নিন্দিত ঘৃণিত, অবহেলিত হয়ে থাকতে চাই না। আমরাও মানুষ, আমরাও চিকিৎসা করি, আমরাও চিকিৎসক। সমাজ সেটাকে ঠিক সেইভাবে দেখল। দুটোর মধ্যে তফাৎ সৃষ্টি করলো, ভিন্ন চোখে দেখল, চাকুরির বেলায় বৈষম্য সৃষ্টি করলো, শেষ পর্যন্ত নিজেদের প্রচেষ্টায় এলএমএফ ডাক্তারদের আত্মবিলুপ্তি ঘটলো। যুগের সাথে সাথে, শুধু বাংলাদেশে নয় সারা দুনিয়ায় একটা জিনিস উপলব্ধিতে আসলো। সেটা হলো, শুধু এমবিবিএস চিকিৎসক দিয়ে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা চলতে পারে না। উন্নয়নশীল হোক, কিংবা উন্নত হোক। তারপর প্রচেষ্টা চালানো হলো মেডিকেল এসিস্টেন্ট, পল্লী চিকিৎসক, ভিলেজ ডক্টর নানা নামে। আজকে বর্তমান দুনিয়ায় সারা বিশ্বে এই বিষয় স্বীকৃত যে আপনাদের শুধু তথাকথিত ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ডাক্তার কিংবা উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ দিয়ে চলবেনা। প্রতিটি লোকের কাছে যদি আমরা চিকিৎসা পৌছে দিতে চাই, তবে আমাদের প্রতিনিধি যাতে প্রতিটি লোকের কাছে যেতে পারে তারই সুব্যবস্থা করতে হবে।

তাই বলা হয়েছে প্যারামেডিক্স, অক্সিলিয়ারী হেল্থ কোর্স, নানা দেশে নানা নাম। আমি বলি তারা চিকিৎসক। আমি বলি, যে চিকিৎসা করে সে চিকিৎসক। সেই হিসাবে আমরা গ্রামের অজ পাড়াগাঁয়ের সেই স্বল্পশিক্ষিত, এককালে কিছুদিন ধরে ডাক্তারের সাথে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, যে চিকিৎসা করতো, সেও চিকিৎসক। যে কম্পাউণ্ডারি পাস করে চিকিৎসা করছে সেও চিকিৎসক। একজন এলএমএফ ডাক্তারের সাথে কাজ করে, চিকিৎসা করে, সেও চিকিৎসক। আমিও চিকিৎসক। মানুষ হিসাবে যেমন আমরা সবাই মানুষ। বিভিন্ন শহরের, নানা গুণের নানা মানের — কিন্তু সবাই আমরা মানুষ। তেমনি চিকিৎসক বলতেও আমরা সবাই চিকিৎসক। সেই হিসেবে আমি বলবো যেই ধারণা চিকিৎসক সম্বন্ধে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল সেটার বিলুপ্তি ঘটেছে প্রয়োজনের তাগিদে। মানুষ সত্যকে বুঝতে পেরেছে বলেই সেই সুযোগ শুধু চিকিৎসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা আরো কিছুদূর এগিয়ে গেছি। পাড়াগাঁয়ের যারা মাতব্বর, মসজিদের যারা ইমাম, তাদেরকেও আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিয়োজিত করছি কিছুটা শিক্ষা দিয়ে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান একই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আজকের যিনি এলএমএফ ডাক্তার, আজকে যিনি নার্স, আজকে যিনি গ্রাম্য চিকিৎসক, আজকে যিনি পল্লী চিকিৎসক, আজকে যিনি মেডিকেল এসিস্টেন্ট, আজকে যিনি টেক্‌নিশিয়ান, তিনি কি সারা জীবন ধরেই তাই থাকবেন? সেটা হতে পারে না।

এগিয়ে যাওয়ার অধিকার প্রত্যেকের থাকতে হবে, যদি তার এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা থাকে। আজকে যে নার্স, তার যদি বিশেষ যোগ্যতা থাকে, ন্যূনতম

যোগ্যতা থাকে, সে যদি চায় ৫ বছর, ১০ বছর আমি সেবা কার্যক্রম চালিয়েছি, কিছুটা অর্থের আনুকূল্য সৃষ্টি করেছি, পরিবারের অন্ন সংস্থান করতে পেরেছি, আমি ডাক্তারী পড়বো। তার জন্য সুযোগ দিতে হবে। আজকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের সভায় এসে একথা বলছি না, আমরা সব সময়ই একথা বলে থাকি।

একজন টেকনিশিয়ান থেকে আরম্ভ করে যে কোন লোক এই পেশায় ঢুকবে, দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে পড়বার, জানবার এবং জানাবার জন্য। দুনিয়ার অনেক দেশে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, ইন্দোনেশিয়ায় গড়ে উঠেছে, ইজিপ্টে গড়ে উঠেছে, পার্শবর্তী দেশ থাইল্যাণ্ডে গড়ে উঠেছে। এগুলোকে বলা হয় ইনস্টিটিউট অব হেল্থ সাইন্সেস, মেডিকেল কলেজ নয়। সেখানে গ্রাম পর্যায়ে চিকিৎসক যেমন তৈরি করবে, তেমনি মাঝ লেভেলের চিকিৎসা দিতে পারে সে রূপ চিকিৎসক ও তৈরি করবে যারা উপরের দিকে যেতে পারবে, পাশেও যেতে পারবে, নিজেদের কর্মক্ষেত্রে আবার ফিরে আসতে পারবে, যদি সে যোগ্যতা থাকে, অর্থ থাকে, সামর্থ থাকে, ইচ্ছা থাকে। তার একটাকে বলা হয় ভারটিক্যাল এ্যাপটিচ্যুড, প্রমোশন ফেসিলিটিজ। আর একটা হলো হরাইজোনটাল এ্যাপটিচ্যুড। সোজাসুজি আই.এসসি. পাস করে একজন ছেলে যেমন এম. বি. বি. এস কোর্সে ভর্তি হতে পারবে, তেমনি পল্লী চিকিৎসা কোর্স পাস করে তার যদি ন্যূনতম যোগ্যতা থাকে, আই.এসসি. যে ডিভিশনেই হোক না কেন, পাস যদি করে থাকে, তাকে যদি আমি একটা মাপকাঠিতে ফেলে দিয়ে উপযুক্ত মনে করি এবং উপযুক্ত হলে সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেই, তবে সে জানবে তার কাজের মাধ্যমে যদি তার সফলতা, স্বাক্ষরতা প্রমাণ করতে পারে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ আসবে, তাহলে সে উৎসাহ পাবে। আর যদি জানে যেখানে তার চাকুরিতে প্রবেশ সেখানেই তার শেষ, এককথায় বললে সারা জীবন ধরেই এসিস্টেন্ট সার্জন, তাহলে সে কোনদিন উৎসাহ পাবে না, পুলকিত হতে পারবে না। যেমন এসিস্টেন্ট থেকে ইঞ্জিনীয়ার হতে পারলো না!

আমি মনে করি ভার্টিক্যাল মবিলিটির সুযোগ শুধু আপনাদের ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে নয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে থাকা বাঞ্ছনীয়। বরং না থাকাটা সামাজিক দিক দিয়ে, নৈতিক দিক দিয়ে একটা অপরাধ। আমাদের সকলের মধ্যে, উত্তম, মধ্যম এবং অধম আছে। যারা উত্তম তাদের সরাসরি সুযোগ দিতে হবে। যারা মধ্যম তাদেরকে উন্নীত করতে হবে। যারা অধম তাদের ভিন্ন পথ খুলে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। অবহেলা করে ফেলে দিলে চলবে না। অর্থাৎ যে-যে মাপকাঠিতে তৈরি তাকে সে হিসাবে সুযোগ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা নিয়ে যে সংঘর্ষ, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স এবং ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্সের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সে ব্যাপারেও আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি সাহেব ভাল করে বুঝবেন শিক্ষাবিদ হিসাবে। আমার এটা বেখাপ্পা লাগে। আমি মনে করি প্রতিষ্ঠান দুটোর মধ্যে সমন্বয়সাধন একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা এবং ক্ষমতা অর্জন করার পর একটা জিনিস সবাই স্বীকার করে যে, একা একা চলার চেয়ে আমরা যদি একসাথে চলি তবে অনেক বেশি শক্তিশালী হই, অনেক কিছু দিতে পারি, অনেক কিছু বুঝতে পারি। সেই হিসেবে প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বকীয়তা বজায় রেখে আমরা যদি নিজ নিজভাবে একত্রিত হই, সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাই, তবে অনেক কিছু করা সম্ভব। যেমন বাড়ি থেকে পাড়াগাঁ, গ্রাম থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে শেষ পর্যন্ত দেশ পর্যায়ে, এমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আরেকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ প্রতিষ্ঠানের কোন নাম থাকে না। আমি মনে করি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার এবং ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ারদের যত প্রতিষ্ঠানই থাকুক না কেন, প্রত্যেকের প্রতিনিধি নিয়ে, কোয়ালিশন গঠন করা যেতে পারে। অবশ্য প্রতিনিধি নেয়ার সময় সাবধান হতে হবে, কেউ যেন কাউকে দাবিয়ে না রাখতে পারে। জনতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র যাই বলুন না কেন, এ প্রতিষ্ঠানে যেন সেটা থাকে। কেউ যেন কারও উপর কিছু চাপিয়ে না দেয়। সেই হিসেবে ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ার এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারদের কোয়ালিশন গঠনের আমি পক্ষপাতি এবং সেই ধরনের যদি কিছু হয়, তাহলে আপনারা তাদের বুঝাতে পারবেন, তারাও আপনাদের বুঝাতে পারবে। সবাই মিলে অনেক কাজ করতে পারবেন।

পরিকল্পনা এদেশে কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থাকে। দৈনিক খবরের কাগজ যদি পড়েন এবং চোখ বুঁজে থাকেন, হয়তো মনে করবেন ৫ বছর পর এদেশকে আপনি চিনতে পারবেন না এমন পরিবর্তিত হয়েছে। আমার এক বন্ধু অনেক দিন ধরে বিদেশে থাকে, দেশে আসার আগে বলেছে, কি করে তোমার বাড়িতে যাব তা কি চিনতে পারবো? বললাম, কেন? সে বললো, কাগজে-কলমে যত পরিবর্তন দেখেছি, তাতে আগের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে গিয়ে চিনে উঠা মুশকিল হবে। অর্থাৎ কাগজে-কলমে আমরা যা দেখি, দিন দিন উন্নতির যে খতিয়ান দেখি, কাগজে ছবি দেখি, বক্তৃতা শুনি, তাতে মনে হয় যেন দেশটা বেহেশত হয়ে গেছে। তবে নিজেদের অবস্থা নিজেরা ঢেকে রাখতে পারি না বলেই আমরা দরিদ্রতম দেশ। এককালে ছিলাম অন্যতম দরিদ্র। এখন নিঃসন্দেহে দরিদ্রতম দেশ। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো আমাদের চেয়ে উন্নত। এই যে কাগজে কলমে এগিয়ে যাওয়া, এর সাথে আমাদের তথ্য দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, সত্য দিয়ে দেশকে পাল্টাতে যদি চাই, সবাইকে

সচেষ্ট হতে হবে এবং দেশের জন্য যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে সকল শক্তিকে সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। ঔষধ নীতি সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন, আমিও বলি। সরকারও গর্ব করে। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে দেখেছেন, এই একটা নীতি, সেখানে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। রাজনীতিবিদদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই, রেষারেষি নেই। বিরোধী দলগুলো মঞ্চে উঠে কিছু বলে না, বলতেও পারে না। যদি তাই হয়, তবে এর পেছনে অন্তর্নিহিত শক্তি কি? এর বৈশিষ্ট্য কি? বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে সরকারী পর্যায়ে তার পর্যালোচনা, সকলের সামনে তা তুলে ধরা। বিরোধীপক্ষের মতামত গ্রহণ করে রিভিউ কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পর্যালোচনা, স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সে পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ এবং শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা এই সফলতার কারণ। অদক্ষ ভিন্নমতকে যদি আপনি অবহেলা করে দূরে ঠেলে দেন, তবে অনেক অমূল্য মত আপনি পেতে পারেন না। বরং তাদেরকে ভিন্নভাবে রেখে ভিন্নমতের সৃষ্টি করবেন আপনি অনেক সময় অহেতুক কারণে। কাজেই নানা মত খুঁজে একটা অভিন্ন পথ বের করতে হবে। ঔষধ নীতি সেই শিক্ষাই দেয়। যাঁরা পারদর্শী তাদের মতামত নিতে হবে। যারা ভিন্নমত পোষণ করে তাঁদের মতামতও শুনতে হবে। অতপর দু'লক্ষ্যকে একই জায়গায় এনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেটা সত্য সেটা নির্ধারণ করতে হবে। সত্য নির্ধারিত হওয়ার পর ভিন্ন মত থাকবেনা। তাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করে আমাদেরকে কাজে ও কর্মে প্রয়োগ করতে হবে। অনুরূপ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে, সচিব পর্যায়ের শাসকদের নিয়ে, রাজনীতি পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের নিয়ে এবং প্রশাসনের দিক দিয়ে রাষ্ট্রপতি অথবা অন্য কাউকে দিয়ে যদি আমরা পরিকল্পনা করি তবে ফলপ্রসূ হবেই। পরিকল্পনা প্রমাণের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাস্তা দিয়ে যদি চলতে থাকেন তাহলে বুঝবেন। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা এয়ারপোর্ট থেকে বংগভবন। রাস্তার পরিকল্পনা, ফুটপাতের পরিকল্পনা, বাজারের পরিকল্পনা, সব পরিকল্পনা। যে কোন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিদেশী অতিথি এয়ারপোর্ট থেকে বংগভবনে, যদি শাহবাগ হয়ে ফিরে যায়, বলবে বাংলাদেশ একটা বেহেশ্‌ত। কিন্তু সেই লোককে যদি একবার চট্টগ্রামের এয়ারপোর্ট থেকে শহরে নিয়ে যান, যদি সিলেটে নেন? (দুটো জায়গার কথা বলছি এজন্য যে তারা উপার্জন করে অনেক বেশি, পায় কম, দিন দিন রুগ্ন দুর্দশায় ভুগছে। আমি চট্টগ্রামের বাসিন্দা, সেইজন্য সিলেটের নামও নিলাম)। তাদের দুর্গতি যদি দেখেন তবে মনে হবে বাংলাদেশের সমস্ত আয়, সমস্ত রাজস্ব, সমস্ত শক্তি, সমস্ত পরিকল্পনা যেন একটা রাস্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা এর বাইরে যেতে পারিনা।

তার জন্য দায়ী কারা? একদিকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনারা, অন্যদিকে সরকার। তাই দায়িত্ব যেটা সে সম্পর্কে সজাগ হতে হবে।

আপনারা বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কথা বলেছেন। একটা দুঃখজনক পরিস্থিতি হলো, আপনাদের অনেকের অভিজ্ঞতা আছে, নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যদি বলি বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে কয়টি ইনস্টিটিউট আছে? আপনি মাথা উঁচু করে গর্বের সাথে বলতে পারবেন, আমাদের ঢাকাতেই ৮–১০টি ইনস্টিটিউট আছে। ইনস্টিটিউট অব চেস্ট ডিসিজ, ইনস্টিটিউট অব হার্ট ডিজিজ, ইনস্টিটিউট অব অর্থপেডিকস এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশনস, ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার ইত্যাদি। আর যদি বলেন, ওয়াশিংটনে কয়টি ইনস্টিটিউট আছে? বলবেন একটি আছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ। এই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের বাজেট বাংলাদেশের মোট বাজেটের চেয়ে বেশি। এর এক একটা ফ্লোরে এক একটা বিভাগ অথচ আমাদের দেশে এইরূপ এক একটা বিভাগকে ইনস্টিটিউট নাম দেয়া হয়েছে। এর যে সুবিধা আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন। এর মেনটেনেন্স খরচ কত লাগবে। ল্যাবরেটরী কত বেশি লাগবে। অন্য লোকজন কত লাগবে। আমরা নিজের ইচ্ছামত ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করি। জাতিভিত্তিক কোন কিছু করি না বলেই আমাদের এই দুর্দশা। বিদেশী বিশেষজ্ঞ এসে বলে গেছে, একটা ইনস্টিটিউট করে সেখানে সবকিছু আপনারা প্রতিষ্ঠা করেন। ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিনে কি আমরা হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, নিউরোসার্জারি, অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলো সম্পন্ন করতে পারতাম না?

আপনি সেই দেশে বাস করেন যেখানে একটা ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিনের মত ইনস্টিটিউটের পাশে হোটেল নির্মিত হয়। একটিবার চিন্তা করে দেখেছেন, এটা জাতির ইতিহাসে কি কলংক নয়? একটা ইনস্টিটিউটের একপাশে হচ্ছে আবাসিক এলাকা, বিশেষ প্রভাবশালী কোম্পানীর মাধ্যমে, অন্যদিকে হচ্ছে একটা হোটেল — ফাইভ স্টার হেটেল। জাতির ইতিহাসে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যদি কলংকজনক কিছু থাকে তাহলে সেটা হলো একটা উচ্চাংগ ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসেনের পাশে একটা হোটেল প্রতিষ্ঠা। যারা ফাইভ স্টার হোটেলে থাকে তাদের কি গাড়ি থাকে না? তাদের কি পয়সার অভাব আছে? আমরা এয়ারপোর্ট থেকে আরম্ভ করে ঢাকার যে কোন জায়গায়, খোলা জায়গায় এটা কি প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম না? এই ইনস্টিটিউটকে আরও সম্প্রসারিত করার চেষ্টা কি আমরা করতে পারতাম না? কিন্তু কার কথা কে শোনে? কোন ইঞ্জিনীয়ার যদি এ উপদেশ দিয়ে থাকে, সে সমস্ত জাতির কাছে,

সর্বকালের জন্য নিন্দিত, ঘৃণিত এবং দায়ী থাকবেই। একটিবার চিন্তা করে দেখেন, যে প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষার জন্য, তার পাশে একদিকে হোটেল, আর একদিকে আবাসিক এলাকা। পরিকল্পনার কতটুকু অভাব, কি নিদারুণ তার পরিণতি, ভবিষ্যৎ তার প্রমাণ দেবে। আমি বলবো, ছোট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা না করে, সীমিত অর্থের অপচয় না করে, যে কোন ইনস্টিটিউটকে সব কাজের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে। এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট কেন সব স্তরের লোককে শিক্ষা দিতে পারবে না? মেডিকেল কলেজগুলো কেন গ্রাম ডাক্তারকে শিক্ষা দিতে পারবে না। এর ব্যবস্থা করতেই হবে।

হাজার হাজার একর জমি নিয়ে যদি আপনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় করেন, ছাত্রসংখ্যা যদি ৩ হাজার হয়, তবে এ লজ্জা কার? পুকুরের মাছ, ধানের চাষ কোথায় যায়? কার পকেটে যায়? যদি উৎপাদন না হয়ে থাকে কে অপরাধী? এগুলো চিন্তা করে দেখতে হবে? আমাদের কি খাদ্যের ঘাটতি নেই? আমাদের কি এভাবে জমি নষ্ট করার সুযোগ আছে? সেজন্য আমি মনে করি, আপনারা যদি সোচ্চার না হন, আপনারা দায়ী থাকবেন। সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ কিংবা শাসক যেই হোন না কেন, এবিষয়ে যদি এখনও চিন্তা না করেন, তবে আমরা এমন এক পর্যায়ে পড়বো, যখন মানুষে মানুষে রেষারেষি, মারামারি, খুনাখুনি হবে। রাস্তা দিয়ে আমরা এখনই চলতে পারি না, ভবিষ্যতে লোকজন কিভাবে চলবে? ৩ তলা ৪ তলা বাড়ি থাকবে কিনা সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আপনাদের কিছু কিছু জিনিস সম্পর্কে আমি ভিন্নমত পোষণ করি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? ভিন্নমত তো থাকবেই। যতগুলো দাবী করেছেন তার সবগুলো যে নির্ঘাত সত্য এবং প্রতিষ্ঠিত, সেটা নাও হতে পারে। না হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেটা মেনে নিয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যা প্রতিনিধিত্বশীল হবে, পর্যালোচনার মাধ্যমে বেশিরভাগ দাবী, যেগুলো যুক্তিসংগত, সেগুলো বিবেচনা করতে হবে, দেশের খাতিরে, জনগণের খাতিরে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের খাতিরে। আমি হয়তো অনেক বেশি বলে ফেলেছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথির কাছে আমি ক্ষমা চাইবো। কারণ আমি মনে মনে যা বিশ্বাস করি, অনেক দিন ধরে বলে এসেছি, সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তবে আপনারা হতাশ হবেন না। সত্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। একদিন অবহেলিত গ্রাম্য চিকিৎসক এখন আর অবহেলিত নয়। আপনারাও সেরকম থাকতে পারেননা। থাকবেননা।

কারিগর, ১৬শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৯৫।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের ১৪তম বার্ষিক সম্মেলন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ

আজকের সভার সভাপতি, বিশেষ অতিথি, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও সাংবাদিক বন্ধুগণ —

এই মহতী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মনোনীত করে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি।

মানবদেহের শারীরিক অসুস্থতার মতো সামাজিক ও মানসিক অসুস্থতা সমাজদেহের স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। আজ আমাদের সমাজের সর্বত্র এ অসুস্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংবাদপত্রের সামগ্রিক অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় সম্পূর্ণরূপে বিকশিত ক্যান্সার রয়েছে সমাজদেহে। আমরা সেই দেশে বাস করি, যেখানে বিশেষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সাংবাদিকদের কাজ করতে হয়। সংবাদপত্রের নীতি রাতারাতি পরিবর্তিত হয়। পাঠক হিসাবে প্রশ্ন জাগে — রাতারাতি কিভাবে সংবাদপত্রের নীতিমালা ও আদর্শের পরিবর্তন হয়? একই মালিকানায় বারবার সংবাদপত্রের চরিত্রের পরিবর্তনও আমরা লক্ষ্য করছি। সংবাদপত্রে যখন সত্যকে মিথ্যারূপে প্রকাশিত দেখি তখন সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই। যখন দেখি ঘটনা ঘটল একভাবে, আর প্রকাশিত হল ভিন্নভাবে অথবা একই খবর যখন বিভিন্ন পত্রিকায় ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় তখন ব্যথিত হই।

জাতীয় উন্নয়নে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ভূমিকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সাংবাদিক সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে। সংবাদপত্রকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সংবাদপত্র শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র সংবাদপত্র শিল্পে নয়, আমাদের সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণের জন্য সর্বক্ষেত্রে সর্বমহলের কাছে গ্রহণীয় একটি নীতিমালা থাকা উচিৎ। সরকারের চরিত্র যাই হউক, সাংবাদিকতার সুষ্ঠু নীতিমালার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের উপর সাংবাদিকদের চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে হবে। নীতিমালার মাধ্যমে সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হওয়া উচিত। আবার যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তির হাতে কলম দিয়ে তাকে সাংবাদিক বানানোও ঠিক হবে না। একই পেশার সাংবাদিকরা অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ থেকে বঞ্চিত। একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে তা হচ্ছে। সাংবাদিকদের সামগ্রিক স্বার্থে পেশাগত কল্যাণে একটি নীতিমালা প্রণয়ন অপরিহার্য। যাঁরা নীতিমালা প্রণয়নে উপযোগী তাঁদেরকে নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব

দিতে হবে ; আর তা বাস্তবায়নে যাঁদের দক্ষতা রয়েছে তাঁদেরকে সেই দায়িত্ব দিতে হবে। বিএফইউজে ও ডিইউজে-কে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটা করা হলে সংঘাত ও অসন্তোষ থাকবেনা। সত্য ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে নীতিমালা প্রণীত হলে সরকার ও জনগণ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। যেমন, ঔষধনীতির ব্যাপারে সরকার ও জনগণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এমনকি বিরোধীদলের কোন নেতাও এর বিরুদ্ধে কিছু বলেননি।

সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ও নীতি যদি দেশসেবা হয়ে থাকে তবে প্রক্রিয়া যত ভিন্ন হউক না কেন আমাদের মধ্যে কোন বিভেদ বা সংঘাত দেখা দেবে না। আমরা একই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবো। কেননা সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামে সত্যের বিজয় অনস্বীকার্য।

২৭-১-১৯৮৯ ইং

আমরা এখনো সেকেলে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি
দৈনিক ইনকিলাবের সাথে সাক্ষাৎকারে ডাঃ ইসলাম

ইনকিলাব ঃ অনেক মনে করেন ডাক্তারী এখন আর মানবিক পেশা নয়, বর্তমানে এটি বাণিজ্যিক পেশায় পরিণত হয়েছে। আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ সব সময় সব ধারণা সঠিক হয় না। অবশ্য সব সময় সব ধারণাকে ভুলও বলা যায় না। ডাক্তার এবং রোগীর সম্পর্ক একটা বিতর্কমূলক প্রশ্ন। প্রশ্নটা আজকের কিংবা কয়েক বছর আগেরও নয়। আমার মনে হয় এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তবে হ্যাঁ, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ডাক্তার এবং রোগীর সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়েছে। আজ থেকে একশ পঞ্চাশ বছর আগের কথা চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তখন রোগীর সংখ্যা ছিলো খুব কম, চিকিৎসকের সংখ্যাও ছিল খুব কম। ওষুধের সংখ্যা ছিলো আরো কম। তবে একটা কথা স্বীকার করতে হবে, শুধু মানুষ নয়, প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণী বেঁচে থাকতে চায়। আমি মনে করি, বেঁচে থাকার একটা স্পৃহা জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি প্রাণীর বেলায় একথা প্রযোজ্য এবং সে হিসেবে জীবনের ওপর কোন বাধা-বিপত্তি, কোন আক্রমণ কিংবা আঘাত আসলে সেটাকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসছে। আমি বলতে চাই, মানুষ সৃষ্টির পরে যদি রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে, সে রোগের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও মানুষ জীবনের শুরু থেকে করে আসছে এবং যুগে যুগে মানুষ তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে গেছে। আবার যদি গোড়ার দিকে ফিরে যাই তাহলে বলবো, তখন রোগী কম ছিলো, চিকিৎসকও কম ছিলো, তবু রোগের চিকিৎসা হতো। কিন্তু তখনকার দিনের রোগের চিকিৎসা ও বর্তমান দিনের রোগের চিকিৎসার মধ্যে তফাৎ ছিলো এবং এ তফাৎ ছিলো অপরিহার্য। যখন ওষুধ ছিলোনা তখন চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক ছিলো একটা মানুষের সাথে আরেকটি মানুষের সম্পর্ক। একজন চিকিৎসকের সংস্পর্শে এলে চিকিৎসক তাঁর একটি কোমল হাত যত্ন এবং আদরের সাথে রোগীর কপালে কিংবা গায়ে লাগাতো, তাঁর একটিমাত্র কথা রোগীকে উৎসাহ দিতো, তাঁর একটা অভয়বাণী রোগীকে মনের ভয়, সন্ত্রস্ত ভাব দূরীভূত করতো, এসব ছিলো রোগ থেকে পরিত্রাণের বিশেষ উপায়। এমনকি,

বর্তমান যুগেও আমরা বলতে পারি, শুধু ওষুধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয় না। চিকিৎসকের ওপর রোগীর বিশ্বাস এবং রোগীর প্রতি চিকিৎসকের আকর্ষণ, স্নেহ-মমতা রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। এমনকি, অনেক উন্নত দেশেও শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ রোগীর ওষুধের প্রয়োজন হয় না। নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে সাহস কিংবা নিশ্চয়তা, যারা উপদেশ দিতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে সৎ উপদেশ, যারা সাহায্য-সহানুভূতি যোগাতে পারে তা গ্রহণ করে এখনো অনেক রোগের চিকিৎসা হয়। তখন ওষুধ ছিলো না, ছিলো এগুলো, রোগী কম ছিলো, সেজন্য চিকিৎসকেরা অনেক সময় দিতে পারতো, তারা সময়ের সৎ ব্যবহার এভাবে করতো। কিন্তু বর্তমানে রোগীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে ওষুধের সংখ্যাও বেড়ে গেছে হাজার গুণ। কিন্তু চিকিৎসকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাড়েনি। ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে — অনেক রোগী, অনেক ওষুধ, কিন্তু চিকিৎসক অল্প। এই যে একটা বেসামাল অবস্থা এর ফলশ্রুতিতে আগে যেখানে ঘন্টা না হলেও যে বেশ কিছু সময় চিকিৎসক দিতে পারতো এখন সেটা কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন ক'এক মিনিটের মধ্যে বেশ কয়েকটি রোগীর চিকিৎসা উন্নয়নশীল দেশের চিকিৎসকরা করে থাকেন।

কিন্তু আমাদের দেশের চিত্রটা অন্যরকম। একজন ডাক্তারকে হয়তো এক হাতে প্রেসক্রিপশন লিখতে হচ্ছে একজন রোগীর জন্য। একই সাথে অন্য একজনের সাথে তাঁকে কথা বলতে হচ্ছে। এটা কিন্তু ডাক্তার ইচ্ছে করে করছেনা, পরিস্থিতি তাঁকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে গেছে, যাকে পরিহার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক কথায় বলতে গেলে, সময়ের ব্যবধানে চিকিৎসক ও রোগীর মাঝখানে ব্যবধানও বেড়ে গেছে, উভয়ের সম্পর্কের প্রতি এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং নতুন নতুন ওষুধের অপপ্রয়োগও সেখানে বেড়ে গেছে। অল্প ওষুধে যেখানে চিকিৎসা হবে সেখানে অধিক ওষুধ এসে রোগী এবং চিকিৎসকের মাঝখানে ব্যবধানও অনেক বেড়ে গেছে। তবে তাই বলে যে এখনো অনেক নিবেদিতপ্রাণ, সমাজসেবী, রোগীর প্রতি সহমর্মী চিকিৎসক নেই, একথা বললে চিকিৎসকদের প্রতি অবিচার করা হবে। বলতে পারেন তাঁদের সংখ্যা সীমিত।

ইনকিলাব ঃ একথা থেকে আমরা কি ধরে নেবো আপনি রোগীর প্রতি চিকিৎসকের মানসিক ভূমিকাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন?

উত্তর ঃ শরীর এবং মনের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। রোগ ও রোগীকে সমষ্টিগতভাবে চিকিৎসা করতে হবে। রোগের ওপর মনের প্রভাব সর্বকালে স্বীকৃত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা প্রমাণিত। আত্মবিশ্বাস রোগ নিরাময়ে নিঃসন্দেহে সহায়ক, কিন্তু এ বিশ্বাস সৃষ্টির মূলে চিকিৎসকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে চিকিৎসক একজন অভিনেতা নয়, অভিভাবক। চিকিৎসকের ওপর রোগীর সম্পূর্ণ আস্থা থাকলে রোগের উপশম সহজতর হয়।

ইনকিলাব ঃ কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের চিকিৎসকের ফি বাড়ানোর প্রবণতার সাথে তুলনা করলে মানবিক দিকটি ক্রমশ গৌণ হয়ে যাচ্ছে না?

উত্তর ঃ সকল চিকিৎসকের পারদর্শিতা সমান নয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরে চিকিৎসক আছে, সে হিসেবে তাদের ফি-ও ভিন্ন। সকল চিকিৎসকের ফি একরকম হতে পারেনা। এটা শুধু চিকিৎসকের বেলায় নয়, সকল পেশা, এমনকি সকল ভোগ্য সামগ্রির বেলায়ও প্রযোজ্য। তবে চিকিৎসকের ফি এবং পারদর্শিতা যতো বেশি হোক না কেন, কোন অসহায় দরিদ্র রোগীকে টাকার মাপকাঠিতে ফেলে বঞ্চিত করা নীতিগত হতে পারেনা। কোন অসহায় দরিদ্র রোগী আর্থিক অপারগতার কারণে পারদর্শী চিকিৎসকের চেম্বার থেকে বিতাড়িত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। এ রকম ঘটনা যদি কোথাও ঘটে থাকে আমি বলবো তা নৈতিকতা-বর্জিত, মর্মান্তিকও বটে।

ইনকিলাব ঃ এমবিবিএস পাস করলে আমাদের দেশের অধিকাংশ ডাক্তারের মনে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি এসে যায়, ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও গবেষণার ফল অবগত হওয়ার জন্যে যে পঠন-পাঠন দরকার তা থেকে তারা বিমুখ হয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ এমবিবিএস ডাক্তার বলতে আপনি যদি সমস্ত এমবিবিএস ডাক্তারদের কথা বুঝান তাহলে আমি বলবো, চিকিৎসক সমাজের প্রতি অথবা নতুন পাস করা চিকিৎসক সমাজের প্রতি আপনি কিছুটা কঠোর মনোভাব পোষণ করেছেন। আর যদি কোন কোন এমবিবিএস ডাক্তারদের কথা বলেন (আপনি অবশ্য অধিকাংশ বলেছেন) তা হলে

আমার বক্তব্য, শুধু চিকিৎসক কেনো, যে কোন পেশার, যে কোন বিদ্যার লোক যদি মনে করে, সে সব কিছু জেনে গেছে তা হলে তাঁর জানার ওখানে শেষ। প্রকৃত অর্থে জানাজানির শেষ হয় না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই শিখবার। আগের অভিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয় প্রতিদিন ; বিশেষত চিকিৎসকের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রযোজ্য। দিন দিন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এখনো অনেক রোগ আমাদের চিকিৎসার বাইরে, অনেক রোগ সম্পর্কে আমরা অবগত নই। কিন্তু দেশে-বিদেশে মানুষেরা বসে নেই। কোথাও না কোথাও গবেষণা হচ্ছে। আজকে যে রোগের ওষুধ নেই, কালকে বা পরশু হয়ত শুনলাম সে রোগের ওষুধ বেরুচ্ছে, বেরুবার সম্ভাবনা আছে। যদি কেউ পাস করার পর চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আর কিছু জানার আগ্রহ না রাখেন, কারো যদি সে আগ্রহ না থাকে, আমি মনে করি ক'-এক মাসের মধ্যে ক'-এক বছর সে পিছিয়ে যাবে। আপনি হয়তো জানেন চিকিৎসা-গবেষণামূলক বিভিন্ন জার্নাল প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। তার মানে হলো প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন কিছু শিখবার আছে। যদি না শেখেন, জানবার চেষ্টা না করেন তাহলে পিছিয়ে থাকবেন। এটা শুধু এমবিবিএস ডাক্তারদের বেলায় নয়, যে যতো বড় পদে অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, জানাজানি, পড়ালেখা যদি অব্যাহত না রাখেন তাহলে মানের গুণে কিছুদিন চালিয়ে গেলেও জ্ঞানের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়বেন এবং এ পিছিয়ে পড়া একদিন না একদিন ধরা পড়বে। সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এটা এক ধরনের অপরাধ।

সব দিক থেকে বিচারের মাপকাঠিতে একথা সত্য, যে চিকিৎসা প্রচলিত আছে তাতে রোগীর সর্বোত্তম চিকিৎসা যাতে হয় সেটা করাই ডাক্তারের উচিত। ডাক্তার হয়েও আমার অজ্ঞতার কারণে তা যদি আমি না করতে পারি তা আমার অবহেলার শামিল। আর এই যে চিকিৎসা জগতে অবহেলা এ যদি আমি নিজেও করে থাকি এটা আমার জন্যেও অপরাধ। তবে হ্যাঁ, বর্তমান সমাজব্যবস্থাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী বলে আমি মনে করি। আমাদের দেশের কথা বাদই দিলাম। অনেক উন্নয়নশীল দেশ আছে যেখানে উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারদেরও নানাভাবে যাচাই করে নেয়া হয়। তাঁদের শিক্ষকতার মান কতটুকু, কি পরিমাণ আছে, গবেষণার দিক থেকে তাঁরা কি পরিমাণ অবদান

রেখেছে — এসব বিচারের মাপকাঠিতে তাঁদের চাকুরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তেমনি যারা সরকারী চাকুরে নয়, প্রাইভেট চিকিৎসক, যাঁদের আমরা প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার বলি তাদের নানা ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিদেশে এঁদের শিক্ষা দানের জন্য প্র্যাকটিশনার রি-ফ্রেসার কোর্স-এর ব্যবস্থা আছে। এ কোর্সের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করা হয়। এ অবগতির জন্যে তাদের (প্রাইভেট প্রাক্‌টিশনারদের) বছরে একবার, দু'বার ও তিনবার করে এ কোর্স সমাপ্ত করতে হয় এবং এ কোর্সের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের মান যাচাই করা হয়। আমাদের দেশে সে ব্যবস্থা তো নেই। কেউ একটা ডিগ্রী লাভ করলে নামের পাশে সেটা বসিয়ে দিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করে, সে যদি অপরাধও করে তার কোন শাস্তি হয় না। শুধু চিকিৎসকের বেলায় নয়, সব কিছুর বেলায় এটা সত্য। আইনের বেলায় কেউ যদি না জানে তার দুর্ভোগ পোহাতে হয় আইনজ্ঞদের নয়, যারা আইনের আশ্রয় নেয় তাঁদের। তেমনি, চিকিৎসকের বেলায় কেউ যদি পিছিয়ে থাকে তার দূর্ভোগ পোহাতে হয় রোগীদের। এটা দুর্ভাগ্য যে, চিকিৎসার দোষে যদি কেউ প্রাণ হারায়, চিকিৎসার দোষে কারো যদি অঙ্গহানি ঘটে, আর্থিক, মানসিক কিংবা শারীরিকভাবে কেউ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে ক্ষতিপূরণ আমাদের দেশের লোক দাবী করতে জানেনা, যদি কেউ করে তাহলে উপরন্তু সে নিজে ভোগান্তির শিকার হন। আর গ্রামে তো কথাই নেই, কেউ যদি চিকিৎসকের দোষে প্রাণও হারায় তবু মনে করে এটা ভাগ্যের লিখন।

ইনকিলাব ঃ আপনি কি এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, প্র্যাকটিসের কোন রকম পূর্বমান বিচারের ব্যবস্থা নেই বলে ডাক্তারের ভুলই রোগীর মারা যাওয়ার কারণ?

উত্তর ঃ আইনের মাপকাঠিতে শুধু চিকিৎসক নয় প্রত্যেক লোককেই যাচাই করে নেয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। একটা বিশেষ মানের না হলে তাদের সে মানে বানাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যারা মিশ্র মানের তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। যোগ্যতার ভিত্তিতে যার যেখানে আসন তাকে সেখানে রাখতে হবে। সব রকম গলদ দূর করে সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি এগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে অপারগ, অজ্ঞ, কৃত্রিম পেশাদার লোকেরা নিরলস ও যোগ্য

লোকদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াবে। এমনিতে যারা নিরলস ও নিবেদিত তারা ভুক্তভোগী। যারা ফাঁকি দিয়ে সমাজের প্রতি অবিচার করে কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসতে পারে তারাই সমস্ত সুযোগ–সুবিধার অধিকারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা খারাপ এবং এটা যাঁরা ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের নিরুৎসাহিত হবার কারণও বটে। তবু আমি মনে করি তাঁরা জানার আগ্রহ নিয়ে সৎভাবে সাধনা করে যাবে। কিন্তু তাঁদের উৎসাহিত করা, স্বীকৃতি প্রদান, সুযোগ–সুবিধা দেয়া সামগ্রিকভাবে সমাজ এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ইনকিলাব ঃ দেশের সিংহভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন, এঁদের টাকায় যারা ডাক্তার হয়ে বেরোন তাঁরা কিন্তু গ্রামের মানুষকে বঞ্চিত করে শহর আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসেন। এটি কি নৈতিক অপরাধের মধ্যে পড়ে?

উত্তর ঃ চিকিৎসক কেন? সব শিক্ষাই তো জনগণের অর্থে সম্পন্ন হয়। চিকিৎসকদের সম্বন্ধে এটা বারবার বলা হলেও আমি মনে করি প্রত্যেকের উচিত জনগণের উপকার এবং কাজে আসা।

ইনকিলাব ঃ চিকিৎসকের নৈতিক দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে কি বেশি নয়?

উত্তর ঃ অবশ্যই চিকিৎসকদের নৈতিক দায়িত্ব অধিক বলে আমিও মনে করি। কিন্তু পাস করে চিকিৎসক গ্রামে যেতে চান না, এ জন্যে চিকিৎসককে শুধু দায়ী করলেই চলবে না। এর জন্য দরকার বর্তমান চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। আমরা এখনো সেকেলে চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছি, এটা দুঃখজনক।

কমিউনিটি বেইসড মেডিক্যাল এডুকেশন অর্থাৎ সমাজভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বর্তমান দুনিয়ার উন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশে চালু হয়েছে। আমাদের পাশের দেশ ভারতসহ নেপাল, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এমনকি পাকিস্তানেও এ ব্যবস্থা চালু আছে। উন্নত দেশের মধ্যে ইউরোপীয় দেশসমূহ, কানাডা ও আমেরিকায় গ্রামভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এসব দেশে চিকিৎসা–শিক্ষারত ছাত্রদের চিকিৎসা জীবনের শুরু থকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গ্রামে কিংবা কোন একটা বিশেষ গোষ্ঠীর কমিউনিটির মাঝখানে গিয়ে কাজ করতে হয় এবং কাজ করতে করতে শেখারও ব্যবস্থা আছে। অথচ আমাদের দেশে পাস করার পরও এরকম ব্যবস্থা নেই। আমাদের দেশে পাস করার পর ডাক্তারেরা বড় চাকুরি করে বড় আরামে বড় বড় শহরে থাকেন। এ অবস্থায় যদি তাঁকে গ্রামে

বদলি করা হয় — যে গ্রামের মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা সীমিত, হঠাৎ তাঁকে এমন একটা পরিবেশে ফেলে দিলে এটা তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হবে। তাছাড়া মনে করুন, আমার সাথে আমার গ্রামের যে সম্পর্ক আমার ছেলেমেয়ের সাথে সে সম্পর্ক নেই। আমি গ্রামে মানুষ হয়েছি, গ্রামের প্রতি আমার ভালোবাসা বা অনুভূতির যে আকর্ষণ সেটুকু যদি আমার ছেলেমেয়েদের না থাকে তাহলে কিন্তু দোষ দিতে পারবো না। আমি যদি ওদের জীবনের শুরু থেকে গ্রামে গিয়ে কিছু কাজ করার, কিছুদিন থাকার, লোকজনদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার অভ্যাস গড়ে তুলি এবং আমার যে অনুভূতি সে অনুভূতির অংশীদার করতে পারি, তাদের দিকদর্শন দিতে পারি, তাহলে গ্রামের প্রতি তাদের ভালোবাসা আমার সমপরিমাণ না হলেও গ্রাম সম্পর্কে তাদের যে অনীহা ও ঘৃণা সেটা অনেক পরিমাণে কমে যাবে। এই যে শহর এবং গ্রামের ব্যবধান তার জন্যে আমি মনে করি উক্ত পর্যায়ের শহরবাসী দায়ী। এবং একই দোষে দোষী আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। এবং একই কথা আবারও বলতে হয় যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করলে কিছু হবে না। আমি সে দিনের আশায় আছি, যে দিন গ্রামভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবে, চিকিৎসা-শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রামে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে, পাস করার পর সে যাতে গ্রামকে নতুন করে না দেখে। আরো একটা দিক আছে — হাসপাতাল, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, সমস্ত সুযোগসহ যদি গ্রামে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে শিখবার যেমন সুযোগ পাওয়া যাবে, শিখবার সাথে সাথে কিছু দেয়ারও সুযোগ হবে। পল্লী চিকিৎসার উন্নতি সেদিন হবে যেদিন আমরা শহুরে চিকিৎসাকে গ্রামে নিয়ে যেতে পারবো। এ ব্যবস্থা যত শিগগির হবে ততো মঙ্গল।

ইনকিলাব ঃ আপনি মাসে, কিংবা বছরে, কোন সময় গ্রামের লোকদের চিকিৎসার জন্যে ওখানে যান কি?

উত্তর ঃ বছরে অন্তত দু' ঈদে দু'দিন আমি গ্রামে কাটাতে চেষ্টা করি। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে রোগীর ভিড় যতই হোক না কেনো তাঁদের কিছুটা উপদেশ পরামর্শ দিতে পারলে আমি তৃপ্তি পাই।

ইনকিলাব ঃ বর্তমান স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে আপনার কি মত?

উত্তর ঃ স্বাস্থ্যনীতি যে রকম হওয়া উচিত ছিলো তা হয়নি। আমি নিঃসন্দেহে বলবো এটি ত্রুটিপূর্ণ।

ইনকিলাব ঃ সরকারের ঔষধ নীতি সম্পর্কে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ ঔষধ নীতির সফলতা সম্পর্কে আমাকে আলাদাভাবে বলতে হবে না, কারণ এটা দেশ-বিদেশে স্বীকৃত। তবে আমি মনে করি, বর্তমান পর্যায়ে ঔষধ নীতি কিছুটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এ বিষয়ে যদি সজাগ দৃষ্টি না দেয়া হয় তাহলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমি মনে করি, কিছু কিছু লোক নিতান্ত দেশপ্রেমিক হিসেবে নয়, দেশপ্রেমিক সেজে দেশকে প্রতারিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। যেমন — কেউ কেউ বলেছেন, ওষুধের দাম এতো হতে হবে। একটা বিশেষ দামের নিম্ন পর্যায়ে যদি আমরা একটা জিনিষকে নিয়ে যেতে চাই, যে কোন প্রতিষ্ঠানের যে কোনো সামগ্রীর ওপর দামের যদি সামঞ্জস্য না থাকে সে প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে না। এটা হচ্ছে এক নম্বর দিক। দু'নম্বর, গুণগত মানের দিক থেকে অনেক ক্ষতি হতে পারে। আমরা ওষুধের দাম কমাতে কমাতে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছি, কোন কোন কোম্পানী বাধ্য হয়ে সে ওষুধ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে হয়েছে কি? সে ওষুধের চাহিদা আছে। ক্কাজেই সে ওষুধ অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্ন পথে, নিয়মবহির্ভূত উপায়ে এদেশে এসে যাচ্ছে। আমাদের এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।

ইনকিলাব ঃ অনেকে মনে করেন, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় এ দেশে ওষুধ শিল্প গড়ে উঠতে পারছেনা। আপনার কি মত?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। অনেকে বলেন, বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এদেশে যাতে ওষুধ শিল্প গড়ে না ওঠে সে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমি মনে করি, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর অস্তিত্ব এ দেশে থাকা প্রয়োজন।

ইনকিলাব ঃ 'প্রয়োজন' কথাটা একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর ঃ প্রয়োজন এ কারণে — তাদের সাথে আমরা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের শিল্পকে গড়ে তোলার সুযোগ পাবো। উন্নত মান বজায় রাখার জন্যে আমরা নৈতিক ও বাধ্যতামূলক উন্নতির পথ অনুসরণ করতে সক্ষম হবো।

ইনকিলাব ঃ সমমানের একই ওষুধের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ণয় কি সম্ভব ?

উত্তর ঃ না, আমরা যদি ওষুধের দাম এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাই তবে নিশ্চয়

ওষুধ শিল্পে যারা নিয়োজিত তারা নিরুৎসাহিত হবে, ওষুধ শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হবে ; এ বিষয়ে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে। আমি মনে করি, বিভিন্ন দামের ওষুধ বাজারে থাকতে হবে, সে দামের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকতে পারে বটে। সব ওষুধের একই দাম — এ ধরনের একটা কল্পনা, যা কল্পনা নয়, পরিকল্পনা, আমাদের দেশের সমূহ ক্ষতির জন্যে আন্তর্জাতিক চক্রবল হিসেবে কাজ করছে। এ চক্রের সাথে জড়িত দেশেরও কিছু লোক নেই, এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনা।

ইনকিলাব : বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর উন্নতমানের ওষুধ শিল্পের কাছে আমাদের দেশের দুর্বলতম ওষুধ শিল্প প্রতিযোগিতায় যে পিছিয়ে থাকবে এটা কি নির্ধারিত সত্যের মতো নয়?

উত্তর : দেশীয় কোম্পানীগুলো যতোটা সম্ভব গুণগত মান বজায় রেখে তার শক্তি ও সামর্থ্যের আওতায় প্রতিযোগিতা করবে। আসলে বহুজাতিক কোম্পানীর যেসব ওষুধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেসব ওষুধ তৈরি করেও দেশে অনেক ওষুধ শিল্প গড়ে উঠতে পারে। মূলত দেশে ওষুধ শিল্পের বিকাশের জন্যে এটা করা হয়েছে।

ইনকিলাব : একই ওষুধ দেশী-বিদেশী দুটো বাজারে চালু রাখার যুক্তি কি? এ ক্ষেত্রে মানুষ দেশী ওষুধ কিনতে কি আগ্রহী হবে? মানে বিদেশীটি কি বন্ধ করে দেয়া যায় না?

উত্তর : উন্নতমানের বিদেশী কোম্পানী দেশীয় কোম্পানীর মান উন্নয়নে সহায়ক। এটাকে প্রতিযোগিতা হিসেবে ধরে নিতে হবে, প্রতিবন্ধকতা হিসেবে নয়।

ইনকিলাব : ধুমপানের কারণে কি কি রোগ হতে পারে?

উত্তর : কাশি হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, যা কর্মক্ষমতা হরণ করে একজন লোককে পঙ্গু করে তোলে, এক পা দু'পা হাঁটতে পারে না, এতো বড় মর্মান্তিক দৃশ্য ; এছাড়া আরো নানা ধরনের অঙ্গহানি হতে পারে, এসব কিছুর অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান। সুতরাং আমরা বারবার বলেছি, বলতে থাকবো, ধূমপান বিষপানের শামিল। বিষ যেমন মানুষের উপকারে আসতে পারে না, আসবেও না, ধূমপানও মানুষের কোন উপকার বয়ে আনতে পারেনা। শুধু একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যেটি লাভবান হয় সেটি তামাক কোম্পানী বা ব্যবসায়ী, আর কেউ নয়। সরকার মনে করে — তাদের কাছ থেকে অনেক ট্যাক্স লাভ করে

রাজস্ব বাড়ে কিন্তু অন্যদিকে কর্মক্ষমতা হারিয়ে জনশক্তিকে অক্ষম করে দেয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের ও সরকারের যে ক্ষতি সেটা এ আয়ের চেয়ে অনেক বেশিগুণ — সেটা হিসেব করে দেখেনা। আসলে টাকাটা সহজে হাতে আসে তো, সে জন্যে মনে হয় এটা আয় আর প্রাণগুলো যে নিঃশেষিত হয়ে যায় এটা সামগ্রিকভাবে চোখের সামনে ভেসে উঠেনা। কিন্তু এটা নিঃশব্দ মহাশত্রু এবং আমি মনে করি, এটা জাতির জন্য কলংক।

ইনকিলাব ঃ শুনেছি আপনি এক সময় চেন স্মোকার ছিলেন কিন্তু কিভাবে ছেড়ে দিলেন?

উত্তর ঃ আমি ধূমপায়ী ছিলাম, শুধু ধূমপায়ী নয়, ভীষণভাবে ধূমপায়ী ছিলাম। দিনে ৬০ থেকে ৮০ টি পর্যন্ত সিগারেট খেতাম। তখনকার দিনে আমার কোন ছাত্র আমাকে হাতে সিগারেট ছাড়া দেখেনি। কিন্তু একদিন ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল কিভাবে শুনুন।

১৯৬২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর আমার বিয়ে হয়। পরের বছর নাফিল্ড ফেলোশীপ নিয়ে বিলাত যাই। এ সময় ধূপানের বিরুদ্ধে চারদিকে প্রচার। ১৯৫৫ সালে বিলাতে টি. ডি. ডি. পড়ার সময় ধূমপান বিরোধী অভিযান শুরু। মাঝখানের সাত বছরে অভিযান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ডাক্তারদের মধ্যেও ধূমপানের অভ্যাস হ্রাস পেয়েছে। যেখানে সেখানে ধূমপান নিষিদ্ধ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে আলাপ–আলোচনা হচ্ছে। সিগারেটের উপর ট্যাক্স বেড়েছে।

আমার সহধর্মিণী আনোয়ারা এসব দেখেশুনে আমাকে বলত, ধূমপান যখন এত ক্ষতিকর ডাক্তার হওয়ায় আমার তা বর্জন করা উচিত। আগে থেকেই মনে মনে সে অভ্যাস থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলাম। সহধর্মিণীর সৎ উপদেশের প্রভাব মনে মনে উপলব্ধি করে ধূমপান থেকে রেহাই পাবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করতে শুরু করি। প্রথমে একটা সিগারেট কেটে দু'ভাগ করে খেতে থাকি। এতে কাজ হয় না। তারপর সকালে শপথ নিই দুপুর পর্যন্ত ধূমপান করব না। কিছুদিন পরে সময়টা বাড়িয়ে আবার শপথ নিই সারাদিন ধূমপান করব না। ফল হয় একই। কিন্তু যে মাত্র সময় শেষ, তখন একটার পর একটা খেতে থাকি। সারাদিনের বরাদ্দ দু'তিন ঘণ্টায় শেষ করি। প্রতিদিন মনঃস্থ করি পরদিন থেকে ধূমপান আর করব না। সেদিন আর আসে না। আগামীতে থেকে যায়। প্রতিদিন উপলব্ধি করি কি অন্যায় করছি।

জেনেশুনে কি গর্হিত কাজ করছি অথচ পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। এভাবে মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটতে থাকে।

একদিন সকালে নামাজ সেরে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পরপর তিনবার শপথ নিলাম সিগারেট আমার জন্য হারাম, জীবনেও ধূমপান করব না। এবার চরম পরীক্ষা। একদিকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে নেশার টান। শেষ পর্যন্ত বিবেক আর ধর্মবিশ্বাসই জয়ী হল।

ইনকিলাব ঃ যাঁরা বোঝে সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারছেনা, তারা কিভাবে সিগারেট খাওয়া ত্যাগ করতে পারেন?

উত্তর ঃ 'আধুনিক'-এর পক্ষ থেকে কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করা যেতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি।

সাম্প্রতিককালে সুয়ংগাম-এর মতো একটি ওষুধ বেরিয়েছে। নিকোটিনের যে আসক্তি সে আসক্তিকে আস্তে আস্তে কমিয়ে আনে এ ওষুধ। যখন ধূমপান করার জন্য অসম্ভব প্রবণতা জন্মে সে সময় এ ওষুধটি যদি জিহ্বার নিচে রাখা হয় তাহলে ধূমপানে যে আগ্রহ তা কমে আসে।

ইনকিলাব ঃ আপনার মতে, ধূমপানে তামাক ব্যবসায়ীদের শুধু লাভ হয়, অন্যদিকে জনশক্তিকে কর্মক্ষমতাহীন করে ফেলে। কিন্তু দেশী ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সিগারেট ঠিকই উৎপাদন করে যাচ্ছে। সুতরাং সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রির আইনগত অধিকার যেখানে স্বীকৃত সেখানে হাত বাড়াতে সিগারেট পাওয়া যাবে। এরকম অবস্থায় সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা কি সম্ভব?

উত্তর ঃ সিগারেট বন্ধ করার নানা উপায় আছে। জনগণকে সিগারেটের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবগত করে তুলতে হবে। বিদেশী কোম্পানীর অর্থের লোভে যারা তামাক চাষ ও ব্যবসার সাথে জড়িত সে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। আমরা কি কোন বিদেশী কোম্পানীকে বলবো, তুমি বিষ তৈরি করে খোলা মাঠে বিক্রি করো বা জনগণকে উপহার হিসেবে বিনামূল্যে বিতরণ করো? আমরা কি সে বিষ গ্রহণ করবো ? যদি না হয়, তাহলে ধূমপানের অপর নাম আমরা যে বিষপান বলেছি সে বিষপানে আমাদের উৎসাহিত করবে কেনো? কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে যখন তাদের লোকসান হচ্ছে, ধূমপানের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, তখন তারা এ ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এটা ওষুধের

বেলায়ও সত্য। নিজেদের দেশের নিষিদ্ধ ওষুধ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিক্রি করে বা উন্নত দেশগুলোতে সিগারেটের চাহিদা যখন ক্রমাগত কমে আসছে এবং লোকসান দিচ্ছে তখন তাদের ব্যবসা জিইয়ে রাখার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেশি করে বেছে নিয়েছে। এখানেও তামাক ব্যবসায়ীদের প্রতি তারা এমনভাবে লোভ বাড়িয়ে তুলেছে, তামাক ব্যবসায়ীদের এমন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে সিগারেট কোম্পানীগুলো — তারা অন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তৈরি না করে শুধু তামাক চাষই করছে, এটা আইনের মাধ্যমে বন্ধ করা উচিত। সরকার এ ব্যাপারে কেনো নীরব তা বুঝতে পারছিনা। যদি তামাক ব্যবসায়ীরা নানাভাবে সরকারের আইনের কাঠামোকে শিথিল করতে সক্ষম হন সেটা দেশের জন্যে মঙ্গলজনক হতে পারেনা। এটা খুব দুঃখজনক। বঙ্গভবনে যাকে আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম দেশে সে বিষ চাষাবাদের কোনো বিধি-নিষেধ নেই। এ দুই বিপরীত পদক্ষেপের আমি কোনো সামঞ্জস্য দেখি না।

ইনকিলাব ঃ তামাক চাষ এবং সিগারেট শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের জন্যে আগে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে কি সিগারেট উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া সম্ভব ?

উত্তর ঃ আমরা বলছি না, রাতারাতি কিছু করুন। তামাক চাষীদের কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা করে এদের দিয়ে খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়ে আস্তে আস্তে তামাক চাষ এদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে হবে এবং করা সম্ভব।

ইনকিলাব ঃ 'আধূনিক' সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ শুরুতে বলে রাখছি, আমাদের 'আধূনিক' কিন্তু আপনাদের সে শব্দগত আধুনিক নয়। আপনাদের আধুনিকের অর্থ হলো মডার্ন। আর 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি' — একথার সংক্ষেপ হলো আমাদের 'আধূনিক'। আমি অনেক পরে এগিয়ে এসেছি। সারা দুনিয়া জুড়ে ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে আসছে। এক যুগ, দু'যুগ নয়, অনেক যুগ ধরে এ আন্দোলন চলছে। কারণ ১৯৫০ দশকের শুরুতে ধূমপানের বিষক্রিয়া প্রমাণিত হয়। তার পর থেকে এর বিরুদ্ধে অভিযান সারা দুনিয়াতে শুরু হয়, আন্তর্জাতিক সম্মেলনও হয়েছে অনেক। আমরা শুরু করেছি দেরিতে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা দেরিতে হলেও 'আধূনিক'-এর স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এটা

আমাদের অনেক উৎসাহ যুগিয়েছে। একথা আমরা বলবো, এ পর্যন্ত সরকার বেশ ক'টি উৎসাহজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আভ্যন্তরীণ বিমানপথে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করাসহ বঙ্গভবনকে 'ধূমপান নিষিদ্ধ এলাকা' ঘোষণা করা হয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রপতি তাঁর রাষ্ট্রপতি ভবনে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন কি-না আমার জানা নেই। আপনাদের মাধ্যমে যে জিনিসটা জনগনের মধ্যে তুলে ধরতে চাই — ধূমপান এমন একটা জিনিস যা তিলে তিলে মানুষের সর্বনাশ করে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই যা ধূমপানের বিষক্রিয়া থেকে রক্ষা পায়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুসফুস। ফুসফুসে ক্যান্সারের অন্যতম কারণ ধূমপান। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে, আমেরিকা এবং পশ্চিমা ক'টি দেশে মেয়েদের মধ্যে ধূমপান বেড়ে গেছে। এককালে ওঁদের ব্রেস্ট ক্যান্সার ছিলো সবচেয়ে বেশি, এখন দেখা যাচ্ছে ফুসফুসের ক্যান্সার সেটাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ধূমপানের ফলে ফুসফুসের ক্যান্সারের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের পরিমাণ আগের মতো থাকলেও ফুসফুস ক্যান্সার কিন্তু হচ্ছে বেশি এবং এ রোগ এক নাম্বার হিসেবে পরিণত হচ্ছে।

ইনকিলাব ঃ দেশে নামগোত্রহীন ওষুধ কোম্পানীগুলো অনেক রকম ওষুধ প্রতিদিন বাজারে ছাড়ছে — যেমন ভিটামিন সিরাপ, কফ সিরাপ এমন হরেক রকম ওষুধ। এগুলোতে সাধারণ মানুষের প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আছে। এসম্পর্কে আপনার মত কি?

উত্তর ঃ নিম্ন মানের যে কোন কিছু বাজারে থাকা প্রশাসনিক দুর্বলতার প্রমাণ। আইনের সঠিক প্রয়োগ না হলে আইন যতই বলিষ্ঠ হোক না কেন আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড চলতে থাকবে। নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ আইনের দিক দিয়ে দণ্ডনীয়। এ ক্ষেত্রে যারা আইন লংঘন করেও যখন শাস্তি না পায় তার জন্যে কে বা কারা দায়ী ভেবে দেখতে হবে।

ইনকিলাব ঃ রোজা রাখা কি স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী ?

উত্তর ঃ সবল ও শারীরিকভাবে সক্ষম মানুষের জন্যে রোজা রাখা ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া কতগুলো খাবার ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ — যেমন মদ্যপান, ধূমপান। এগুলো মেনে চললে অনেক রোগ থেকে রেহাই

পাওয়া যায়। নেশাযুক্ত ওষুধ মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। যে নেশাগ্রস্ত তার জন্যে পশ্চিমা দেশগুলো হৈ চৈ করছে, এমনকি সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে জটিল বিংশ শতাব্দীর প্লেগ মহাশত্রু এইডস, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ইনকিলাব ঃ আপনি দিনে কয় ঘণ্টা লেখাপড়া করেন?

উত্তর ঃ আমি সকালবেলা কোন রোগী দেখি না। অফিসের কাজ ও পড়ার কাজ করি, শুক্রবার ও রোববার কোন কাজ করি না। শুধু এগুলো করি।

ইনকিলাব ঃ আপনি জাতীয় অধ্যাপক ও শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসাবিদ। যে উদ্দেশ্য নিয়ে চিকিৎসা জীবন শুরু করেছিলেন বর্তমান সময়ে তা কতোটুকু সফল হয়েছে মনে করেন ?

উত্তর ঃ প্রশ্নটা খুব কঠিন। তবে চিকিৎসক জীবনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যদি পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে বলতে হয়, মানুষ যেটুকু আশা করে ততোটুকু সে হয়তো সব সময় পায়না। কিন্তু তবু আমার ব্যক্তিগত জীবনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী বিবেচনা করলে বলতে হয়, চিকিৎসক জীবনে আমার বিফলতার চেয়ে সফলতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এটাকে আমি জীবনের সার্থকতা বলে মনে করি এবং এখানে আমার সন্তুষ্টি।

সাক্ষাৎকার — মাহবুব আজাদ

পুনর্মুদ্রণ ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৯-২-১৯৮৯ইং।

একুশ এখনো অজানা

প্রশ্নাবলী

এক অমর একুশকে আপনি কিভাবে দেখেন?

দুই একুশে ফেব্রুয়ারী জাতীয় শোক দিবস কেন? জাতীয় ভাষা দিবস নয় কেন?

তিন শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার অগ্রগতি কোন্ পর্যায়ে? আপনার মতামত এবং সুপারিশ ব্যক্ত করুন।

চার বাংলা বর্ষপঞ্জিকে রাষ্ট্রীয় বর্ষপঞ্জি হিসেবে চালু করার বাধা কোথায়?

পাঁচ বাংলাদেশে উর্দু, ফার্সী এবং আরবী সাহিত্যচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করার সময় এসেছে কি?

ছয় আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে একুশের প্রভাব কতটুকু?

সাত একুশের চেতনা সাধারণ জনতাকে কতটা প্রভাবিত করেছে?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
জাতীয় অধ্যাপক

১। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। জাতির একটা গৌরবের দিনকে মনে করিয়ে দেয়। সমবেত প্রচেষ্টায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। একতা সবলতা আনে। সবলতা সফলতার পূর্বশর্ত। এককথায় বলতে গেলে নীতির পেছনে একতা নিঃসন্দেহে সার্থকতা বয়ে আনে। একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মনে হয় বাইশে ফেব্রুয়ারী থেকে আমরা একথা ভুলতে থাকি। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী থেকে আবার যেনো তাকে স্মরণ করতে থাকি। মাঝখানে কোথায় যেনো হারিয়ে যাই। একুশে ফেব্রুয়ারীকে আমরা একটি উৎসব হিসেবে গ্রহণ করেছি। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে নয়।

২ ঐক্য, শোক, সফলতা সবকিছু একুশে ফেব্রুয়ারীর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সামগ্রিকভাবে এর বিচার করতে হবে। একটু আগেই যা বলেছি তাতে বুঝা যাবে — মনে প্রাণে এ বিশেষ দিনটিকে আমি শোক কিংবা জাতীয় দিবস হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নই। বরং একটি স্মরণীয় শিক্ষা দিবস হিসেবে প্রতিফলিত করতে চাই। জাতীয় ভাষা দিবস পালন করে কোন ভাষার বিকাশ লাভ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিশেষ দিবসের চেয়ে বিশেষ চর্চা আমার কাছে ঢের বেশি কাম্য।

৩। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে নগণ্য নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। বিশেষ ক্ষেত্রে এ এগিয়ে যাওয়া কিছুটা বিপর্যয়েরও সৃষ্টি করেছে। অন্য শাস্ত্রের কথা না বললেও চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলি। উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে ভাষাগত কারণে বঞ্চিত হয়েছে এমন উদাহরণও কম নয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাকে আমরা যেমন কয়েক যুগ আগের তুলনায় ব্যাপকভাবে পেয়েছি, ইংরেজিকে অনেকটা হারিয়ে ফেলে দিন দিন যেন অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে যাচ্ছি। বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ থাকবেই। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে একটি বিদেশী ভাষাকে অবহেলা না করে যদি আদর করে কাছে টেনে নেই, সেটাকে মাতৃভাষার প্রতি বিরাগ কিংবা অবহেলা বুঝায় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তা জানবার, বুঝবার ও শিখবার প্রধান মাধ্যম সে ভাষাটা আয়ত্ত করতেই হবে। সেটা যে ভাষাই হোক না কেন। তবে বর্তমানে ইংরেজি সর্ববৃহৎ প্রচলিত ভাষা। এটি যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক ভাষা সেই হিসেবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের ইংরেজি জানা উচিত। ইংরেজিতে শিক্ষা দেয়া উচিত। পল্লী চিকিৎসক কিংবা গ্রাম ডাক্তারকে আমি যদি ইংরেজিতে শিক্ষা দিতে চাই সেটা যেমন পাগলামি, উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী চিকিৎসকদের আমি যদি ইংরেজিতে শিক্ষা না দেই সেটা হবে উদ্ভট পরিকল্পনা।

৪। আমি কোন বাধা দেখিনা। বরং বলা যায়, ২১ ফেব্রুয়ারীকে বাংলা তারিখে রূপান্তরিত করলে বিপর্যয় কোথায় তা বুঝি না।

৫। সব সাহিত্যচর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। তবে অন্য ভাষা চর্চায় অধিক উদ্যোগী হয়ে বাংলাচর্চাকে যেন অবহেলা না করি কিংবা ভুলে না যাই। বিশেষ কোন ভাষা নিয়ে গবেষণা করবার বিশেষ ক্ষেত্র ভাষা কিংবা বিভাগ কিংবা কিছু ব্যক্তি বিশেষ যে কোন দেশে যে কোন সময়ে থাকার কথা। সে হিসেবে বাংলাদেশে উর্দু, আরবী, ফার্সী এবং অন্যান্য বিশেষ বিদেশী ভাষায় অধ্যয়ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণা চলতে থাকাটাই স্বাভাবিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই হিসেবে বিশেষ বিভাগও রয়েছে। মনে রাখতে হবে এগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের। সামগ্রিক কিংবা জাতিগত ভিত্তিতে নয়। বাংলাভাষার সাথে এখানে প্রতিযোগিতা নেই।

৬। প্রবন্ধ রচনা, সংকলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবছর গোটা ফেব্রুয়ারী মাস যেনো একটা অসাধারণ মাস হিসেবে প্রকাশ পায়। বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র এবং আরো নানা

প্রকার প্রকাশনা এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গোটা মাসটাকে সম্পূর্ণ ভিন্নতররূপে আমরা দেখতে পাই। প্রায় তিন যুগের কাছোকাছি সময়ে প্রায় ছত্রিশটা মাস আমরা এমন জমজমাটরূপে কাটিয়েছি। এবারও একুশে ফেব্রুয়ারীর একই রূপ বললে হয়তো ভুল হবে না। একটা ব্যতিক্রম-ইসলামী ফাউন্ডেশন এ বছর প্রথমবারের মতো এ অনুষ্ঠানের অংশীদার। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে — আমরা কতদূর এগিয়েছি। নাকি কোন কোন ক্ষেত্রে স্থবিরতা এসেছে কিংবা পিছিয়ে চলেছি? গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচকের দৃষ্টিতে একুশের সমগ্র কার্যাবলীর মূল্যায়নের কোন প্রচেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অতীত শুধু বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতেরও দিক-নির্দেশক। শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে অতীতের পর্যালোচনা ভবিষ্যতে উৎকর্ষ লাভের উদ্দেশে বিলুপ্তির জন্য নয়। প্রতিটি প্রকাশনা এবং নানা কর্মকাণ্ড ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে সংরক্ষণের প্রয়াস জাতি হিসেবে আমাদের প্রগতির পথে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৭। সাধারণ মানুষের কথা যদি বলি, একুশের চেতনা তাদের প্রভাবিত করতে তেমন পারেনি। আবেগাশ্রিত জাতি হিসেবে আমরা এখানেও সম্পূর্ণ আবেগপ্রবণ। একুশ আসলেই শুধু মাতামাতি। বক্তৃতা, বিবৃতি, অনুষ্ঠানের ছড়াছড়ি। এসব জিনিস সাধারণ জনতাকে খুব কমই স্পর্শ করতে পারে। তাদের চিন্তা-চেতনায় অঙ্গাঙ্গিভাবে একুশকে আমরা এখনো সম্পৃক্ত করতে পারিনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা।

সাপ্তাহিক ফসল ৯ই ফাল্গুন ১৩৯৫ বাংলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৯-এ প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও বয়োজ্যেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, আমার পরম স্নেহের ছাত্র-ছাত্রী এবং বন্ধুগণ —

এই মহতী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মনোনীত করে কর্তৃপক্ষ আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার না হলেও শিক্ষকতা জীবনের সুদীর্ঘ সময়ে নানা কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। নিকট এবং দূর থেকে যা দেখেছি, দেশে এবং বিদেশে যা কিছু দেখবার সুযোগ হয়েছে, সর্বোপরি একই দেশের বাসিন্দা হিসেবে এ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমার যে অনুভূতি, আজকে আপনাদের সামনে সময়ের সীমারেখায় যতটুকু সম্ভব তা-ই তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

শুরুতেই বলি — যে প্রতিষ্ঠানের মহান উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে আজকে আমার উপস্থিতি তার কার্যক্রম শুরু হয় আমার জন্মের সপ্তবর্ষ আগে ১৯২১ সালে। জন্মলগ্নে নানা কারণে কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড

স্বভাবতঃই বিগত প্রায় ৭ দশকে এই প্রতিষ্ঠান সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা কারণে অনেক পরিবর্তনের সম্মুখীন কিংবা শিকার হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আপন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রেসিডেন্শিয়াল বা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর জন্ম। বস্তুত, অবিভক্ত ভারতের এটাই ছিল প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্দেশ্য ছিল আপন পরিবেশে একটা পরিবারের মতো শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রেখে ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি করা। শুধুমাত্র প্রক্রিয়ার অনুকরণের জন্য নয়, কর্মকাণ্ড এবং সুফলের ফলশ্রুতি হিসেবে যে বিশ্ববিদ্যালয় 'অক্সফোর্ড অব দি ইস্ট' অর্থাৎ 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে পরিচিত ছিল আজকে আমরা সকলে সেই প্রতিষ্ঠানেই উপস্থিত। এই সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে গুণের মাপকাঠিতে শিক্ষক নিয়োগের রীতিনীতি এখানে প্রচলিত ছিলো। এঁদের অনেকের নাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

'অ্যাফিলিয়েট'-এ রূপান্তর

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হয়ত বা প্রয়োজনের তাগিদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে কিছুটা পরিবর্তন আসে, রেসিডেন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর ঘটে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নতুন রূপ নিয়ে যে কার্যক্রম চলতে থাকে তার পর্যালোচনা করলে অবস্থার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব। তখন সীমিত জনসংখ্যা, ততোধিক সীমিত ছাত্র এবং কলেজের সংখ্যা, অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির বিস্তৃতি ঘটলেও মানের মাপকাঠিতে অসহনীয় ছিল বলা যায় না। সুনির্দিষ্ট বিচারের মাপকাঠিতে যাচাই করে অ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হতো। এতে গুণগত মান প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস ছিলো।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে

১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম। নতুন জাতি হিসেবে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো সীমাহীন। দিকে দিকে রাতারাতি অনেক প্রতিষ্ঠান জন্ম নিলো। একইভাবে জন্ম নিলো অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিজের চোখের সামনে পরিত্যক্ত বাড়িতে রাতারাতি কলেজ গড়ে উঠতে দেখেছি। শুধু সামনে বললে হয়তো ভুল হবে — আশেপাশে, নিকটে, বহুদূরে, শহরে, গ্রামে, সব জায়গায়। অনেকে বলবেন জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে অতীতে চাহিদার তুলনায় আমাদের সুযোগ-সুবিধা ছিলো সীমিত। এখানে আমার মত অভিন্ন। তবে স্বীকার করতে হবে চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টায় আমরা যদি মান রক্ষা না করি, মানের চেয়ে পরিমাণের দিকে অধিক নজর দেই তাহলে বিপদ অনিবার্য। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে আমরা এখন বিপদের সম্মুখীন। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে সরল মনে এই সুধী সমাবেশে তাই আজ দু'একটা কথা তুলে ধরতে চাই।

কত বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২টি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ, এর ছাত্রসংখ্যা ১,৫২,০০, আর শিক্ষক রয়েছে মোট ৫,৬৬৩ জন। অনেক সরকারী এবং বেসরকারী কলেজে অনেক পদ খালি, আবার অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। ফলে সাম্প্রতিককালে শিক্ষার হার কিছুটা বাড়লেও মান বাড়েনি, প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের মান সর্বনিম্নে। একথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যতই ব্যাপক এবং সবল মনে করিনা কেন ১৯০টি

অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্রের প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দিয়ে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা কল্পনার অতীত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ করি। হাজার হাজার ছাত্রভর্তির অনুমতি দেই। এমনকি কোন কোন কলেজে ছাত্রসংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার অধিক। তবুও তাদের বিশ্ববিদ্যালয় নামে স্বীকার করতে আমাদের বাধা কোথায় বুঝি না। পাকিস্তানে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০টি আর আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে একধাপও এগুতে পারিনি। এটা কোন মনোবৃত্তির পরিচয় জানি না, তবে শিক্ষার মান এতে ব্যাহত হচ্ছে নিঃসন্দেহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব

বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। শিক্ষা, গবেষণা এবং সামাজিক দায়িত্ব প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত। চিকিৎসক হিসেবে আমি বলবো — ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে যেমন জাতির সৃষ্টি, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের উপর সমগ্র জাতির সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। সুস্বাস্থ্য বলতে শুধু রোগ-বর্জিত দেহকে বুঝায় না। শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে বুঝায়। আবার কেউ কেউ আধ্যাত্মিক দিককেও সুস্বাস্থ্যের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতি। বলতে গেলে একটা জাতির ক্ষুদ্রতম অঙ্গ হিসেবে একটা নাগরিককে উপযুক্ত পরিবেশে উৎকৃষ্ট রূপ দিয়ে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ গুরুদায়িত্ব পালনে সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিগত কয়েক বছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে পড়ালেখা জানে এমন লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকারী পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৯-তে শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এঁদের কতজন উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োগ করতে পেরেছে, কতজন বেকার, কতজন ভিন্নপথ গ্রহণ করেছে তার সঠিক হিসাব দিতে না পারলেও এর সংখ্যা নগণ্য নয়, বরং ভয়াবহ। অন্যদিকে, আনুপাতিক হারে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রাজধানীর সরকারী কলেজগুলোতে শিক্ষকের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু নানা অজুহাতে অন্যান্য সরকারী এবং তারও অধিক বেসরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাব প্রকট।

শিক্ষাখাতে ব্যয়

শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ বাংলাদেশে পৃথিবীর সব দেশের চাইতে কম। আর্থিক অপ্রতুলতা শিক্ষক নিয়োগের অন্যতম বাধা হিসেবে দেখানো হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা কিছুটা বাড়ানো হয়েছে সত্য। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদেরকে এখনো উপযুক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। প্রশ্ন উঠে — এর জন্যে কে বা কারা দায়ী? আমি বলি — সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ই। জনশক্তির অভাব এ অজুহাতে অনুপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ যেমন শিক্ষার মান ব্যাহত করে, আর্থিক অভাবহেতু শিক্ষকের অভাব একইভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরত-ই-খুদার নাম মনে পড়ে। একবার নয়, বহুবার তাঁর সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক বাছাই কমিটিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়েছে। 'অনুপযুক্ত শিক্ষকের চেয়ে শূন্যপদ ভাল' — এই ছিলো তাঁর নীতি এবং শেষ পর্যন্ত এই নীতিই তিনি মেনে চলেছিলেন। নানা চাপের মুখে এ নীতি কতটুকু শিথিল হয়েছে তার পরিসংখ্যান আমি আপনাদের দিতে পারবনা। তবে এর প্রতিফলন অনেকেই আমরা অনুভব করি। সরকারী এবং বেসরকারী অ্যাফিলিয়েটেড কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

অশান্ত পরিবেশ

আপনাদের কাছে অনুরোধ আমাকে ভুল বুঝবেননা। ডাক্তার হিসেবে সুস্থদেহে রোগের আবিষ্কার আমার নীতি নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে রুগ্নতা সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এখন ব্যাপক রূপ নিয়েছে। মানের দিক দিয়ে যেমন শিক্ষার নিম্নগতি, শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে নয়, ছাত্রে-ছাত্রে, একদলের বিরুদ্ধে আরেক দলের সংঘর্ষ সর্ব পর্যায়ে একটা বিকট রূপ ধারণ করেছে।

অনুভূতির অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যেন চোখের সামনে হাজার হাজার বিষাক্ত জীবাণু দেখতে পাই। এরা সর্বনাশা, পরস্পর পরস্পরের সাথে মধুর সম্পর্কে এরা আঘাত হানে। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং প্রগতি যেন এদের মহাশত্রু। এই ভয়াবহ আক্রমণের ফলাফল প্রতিনিয়তই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে যেন দেখতে পাই। কখন, কিভাবে এদের আবির্ভাব এবং কোথায় এদের শক্তির উৎস সেটা হয়ত অনেকেরই জানা।

চিকিৎসক হিসেবে আমার দায়িত্ব রোগের ইতিহাস এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় এবং তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আপনার এবং আমার দায়িত্ব সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা। সমাজের বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দায়িত্ব অপরিসীম। শারীরিক সুস্থতা যেমন কোন বিশেষ অঙ্গকে হিসাবের বাইরে ফেলে রাখতে পারে না, বিশ্ববিদ্যালয়ও তেমনি তার কোন অঙ্গ সংগঠনকে রুগ্ন রেখে সুস্বাস্থ্যের দাবীদার বলে গণ্য করতে পারেনা।

ছাত্রদের ভূমিকা

শিক্ষাঙ্গনের দুঃখজনক পরিবেশে ছাত্রদের ভূমিকা নেই, এমন কথা বলা যাবে না। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থী সঠিক পথে চলবে -- এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সৃষ্টির শুরু থেকে ভিন্নপথ ও মতের সূচনা। এই গতিধারা চলতেই থাকবে। সঠিক পথের যারা সন্ধানী তাদের অগ্রগতিতে যদি বাধার সৃষ্টি হয়, বিপথগামীরা যদি সবল হয়, অন্যায়, অবিচার সেখানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবেই। সুযোগ সন্ধানীরা সততাকে এখানে দুর্বলতা হিসেবে এবং আন্তরিকতাকে অন্তঃসারশূন্য বলে জনসমক্ষে তুলে ধরতে নির্লজ্জভাবে এগিয়ে আসে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে লেখনীর নিঃশব্দ ছন্দের পরিবর্তে মারণাস্ত্রের বিকট ধ্বনি শুনতে পাই। গ্রন্থাগারে আগুন দেখি। আর গবেষণাগারের পার্শ্বেই দেখি জীবন-বিধ্বংসী বোমা।

বর্তমান পরিস্থিতি

স্মরণকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল শান্ত, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিলো সুমধুর, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিংবা শিক্ষক বলে পরিচয় দিতে সবাই গর্ববোধ করত। বর্তমানের পরিস্থিতি অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করবে। তরুণদের অনেকে হয়তো মনে করবে এসব কথা অতিরঞ্জিত, ইচ্ছাপ্রণোদিত গুণগান। বয়োজ্যেষ্ঠদের যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদেরকে সাক্ষী রেখে অকপটে আমি কথাগুলো তুলে ধরছি, কোন বিকৃত ইতিহাসের পাতা থেকে নয়। কথাগুলো বলার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। মনে দুঃখ পাই যখন দেখি সময়ের ব্যবধানে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে আমরা পরিবর্তিত রূপ দিই। মহাসত্যকে প্রকাশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হই। জাতির ইতিহাস এখন সঙ্কটের সম্মুখীন।

যে অশান্ত পরিবেশ এবং বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরলাম কে বা কারা তার জন্য দায়ী তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী আজ ভুক্তভোগী। পিতামাতা আজ উদ্বিগ্ন। শিক্ষা-জীবনের অতি মূল্যবান সময় আমরা হেলায় হারিয়েছি। এখনো হারাচ্ছি। এ অসহনীয় পরিস্থিতি কবে শেষ হবে, শান্ত পরিবেশে কবে আমরা ফিরে আসবো জানি না।

দায়ী কে

আমাদের উপলব্ধি করতে হবে কোন মহাশক্তি মনে-প্রাণে আমাদের মঙ্গল চায়

না — চাইতে পারে না। সবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আমরাও প্রতিযোগিতায় নামি — এটা তাদের কাম্য হতে পারে না। তাই তারা যে সাহায্যের হাত বাড়ায়, তা নির্ভরশীলতা জন্ম দেয়ার উদ্দেশ্যে। তাদের সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার অভাবে আমরা পড়ে থাকি পেছনে। বস্তুত আপাতদৃষ্টিতে পর্বত-পরিমাণ অনুদান কায়দা-কৌশলে ভিন্নপথ অনুসরণ করে উৎসস্থলে চলে যায়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাদার কিছু লোক দেশপ্রেমের আবরণে আমাদেরকে সম্মোহিত করে। নানা কৌশলে জাতীয় অগ্রগতিতে ছদ্মবেশে তারা এমন বাধার সৃষ্টি করে, খুঁটিয়ে বিচার না করলে মনে হবে এরা সবাই এ যুগের আত্মত্যাগী মহাপুরুষ। রাতের অন্ধকারে এদের আনাগোনা। দেশে ছিন্নবস্ত্র, বিদেশে ভিন্নরূপ। এ দেশের মাটিতেই এদের জন্ম। সময় এসেছে এদের খোলস মুক্ত করবার। নিজেদেরকে জানবার, বুঝবার।

ছাত্র রাজনীতি

ছাত্রদের রাজনীতি নিয়ে নানা প্রশ্ন, নানা বিতর্ক। আমি কিন্তু এটাকে কোন সমস্যা বলে মনে করিনা। ছাত্ররা যদি সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়, সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব থাকে, সে দায়িত্ব পালনে বাধা কোথায়? তারাই তো ভবিষ্যতের নাগরিক। সুযোগ্য হবার সুযোগ তাদের দিতে হবে। গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশ নিতে হবে। সমাজগঠন যে নীতিরই অংশ হইক না কেন ছাত্রদের আলাদা করে দেখলে চলবে না। মনে রাখতে হবে ধ্বংসের নীতি রাজনীতি হতে পারে না। সে নীতিতে আমি বিশ্বাস করি না।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস মহিমায় গৌরবান্বিত। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যে বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে কূচক্রীদের কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়েছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে দাঁড়িয়ে (ক) কিছু বলার এই সুযোগ আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। ইতিহাস আপন গতিপথে বিঘ্নিত হলেও শেষ পর্যন্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে। পবিত্র কোরানের বাণী 'সত্যের আবির্ভাবে মিথ্যার বিলুপ্তি' আমাদের প্রেরণা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়িত্ব

এ বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে যে সত্যকে তুলে ধরতে চাই সেটা শুধু আমার নিজস্ব অনুভূতি নয়, বর্তমান বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত। সমাজগঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিসীম দায়িত্ব নিতে হবে। এদের কার্যক্রম শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের

চত্বরে সীমাবদ্ধ হলে চলবে না। সুদূর পল্লী অঞ্চলের শিক্ষায়তন পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। এ্যাফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হিসেবে গ্রামবাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে দুর্নীতির কারখানায় পরিণত করলে সমগ্র জাতি দুর্দশাগ্রস্ত হবে। মোটকথা, প্রতিটি স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে মেনে নিতে হবে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সকল অঙ্গে পরিশোধিত রক্ত সঞ্চালনের।

আমাদের হৃদপিণ্ড যেমন দূষিত রক্ত গ্রহণ করে ফুসফুসের মাধ্যমে পরিশোধিত করে শরীরের প্রতিটি অংশে পুনঃসঞ্চালিত করে, বিশ্ববিদ্যালয়কেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে হবে। অ্যাফিলেয়েটেড কিংবা কনসটিটুয়েন্ট কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় — আপনি যে প্রতিষ্ঠানেরই হউন না কেন আপনার দায়িত্ব অভিন্ন। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের মাধ্যমে ভাব এবং জ্ঞানের আদান-প্রদান করতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'কম্যুনিটি বেইসড মেডিকেল এডুকেশন' এখন স্বীকৃত। শিক্ষক এবং ছাত্র কলেজের গণ্ডীর মধ্যে এখানে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রামে গিয়ে হাতে কলমে শিখে। গ্রাম থেকে চিকিৎসক শহরে আসে শিখবার উদ্দেশ্যে। এর ফলে গ্রামের লোকজন যেমন উন্নততর চিকিৎসার সুযোগ পায়, গ্রামের চিকিৎসকও শহরের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের এমনিভাবে আনাগোনা একদিকে যেমন পরস্পর পরস্পরকে জানবার সুযোগ দেবে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার মান বাড়বে সর্বস্তরে। এই প্রক্রিয়া চালু করতে আনুষঙ্গিক যা কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে দোষারোপ করলে সমস্যার সমাধান হবে না। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যা কিছু প্রয়োজন তা দিতে হবে।

ডিগ্রীধারী এবং সমস্যা

এক যুগ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যত ছিল বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। এতে আমরা গর্ববোধ করতে পারি না বরং মনে মনে লজ্জা পাই। কর্মজীবনে বিফলতা, চাকুরি জীবনে অনিশ্চয়তা অনেক মেধাবী ছাত্রকেও হতাশাগ্রস্ত করে এবং বিপথে চালিত করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ক্রমে ক্রমে পঙ্কিলতায় ভরপুর হওয়ার পথে। ওষুধে আসক্তি, বিভিন্ন ধরনের নেশা শুধু পরিচ্ছন্ন গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে নি — বিস্তৃতির পথে। সঙ্গদোষ, কৌতূহল ইত্যাদি নানা কারণে ওষুধে আসক্তি, এবং নেশাগ্রস্তের সংখ্যা কত

পরিবারের সুখশান্তি বিনষ্ট করেছে তার সঠিক সংখ্যা তুলে ধরতে না পারলেও বলা যেতে পারে এ সংখ্যা নগণ্য নয় এবং দিন দিন বাড়তির দিকে।

যদি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হয়, প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন পেশায় জনশক্তি তৈয়ার না হয় তা হলে একদিকে যেমন বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে চলবে, অন্যদিকে তার সংশ্লিষ্ট সমস্যা বহুগুণে বেড়ে যাবে। অপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপরূপে দেখা দেবে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে নিকটবর্তী দেশের সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবন তাদের কল্পনাতীতভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়েছে, আর আমরা শুধু অর্থহীন ডিগ্রীর মোহে এখনো আবদ্ধ।

গবেষণা

গবেষণা উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং গবেষণার পূর্বশর্ত উপযুক্ত পরিবেশ। শুধু উপযুক্ত পরিবেশ হলেই কিছু সংখ্যক লোক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে সত্য। আবার কেউ কেউ এই সুযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবেনা। এদের অনীহা পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রতিকূল। এদের দৃষ্টান্ত কোমল শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উৎসাহ জন্মাতে না পারলে পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে কোন পারদর্শিতা কিংবা কোন সুফল আশা করা যায়না। গবেষণাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ নীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন শিক্ষককে বর্জন কিংবা পরিহার করে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে যেতে হবে। গবেষণাকে বিসর্জন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণ শুধু দায়িত্বহীনতা নয় নীতি–বিবর্জিত এবং সমাজের প্রতি অবজ্ঞা বলে মেনে নিতে হবে। উন্নত দেশে গবেষণার প্রতি অবহেলার কারণে শিক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে পরিহার করার দৃষ্টান্ত মেলে। এ ব্যবস্থা আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হলেও এর সুফল সুনিশ্চিত।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অশান্ত পরিবেশের একাধিক কারণ রয়েছে। অধ্যাপনায় অবহেলা এবং গবেষণার প্রতি অনীহা অলস মনে বিশৃঙ্খল চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সফলতার প্রতিযোগিতার পরিবর্তে অবহেলাই যেন এখানে প্রাধান্য লাভ করে। আমরা যারা শিক্ষক, কতটুকু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি, তা অনুভব করতে হবে। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাবে' — মর্মবাণীর কতটুকু আমরা অনুসরণ করি তা ভেবে দেখতে হবে।

কমিশন আর কমিশন

বার বার 'কমিশন' করে আমরা 'কমিটমেন্ট' করি না, 'ওমিশনের' পথ ধরি। অতীতকে বিসর্জন দেওয়ার প্রবণতা যেনো বেড়েই চলেছে। আমরা ভুলে যাই বর্তমানের ভিত্তিমূল অতীত এবং ভবিষ্যতের গোড়াপত্তন বর্তমানের উপর ন্যস্ত। অতীতকে ভুলে না গিয়ে গঠনমূলক সমালোচকের দৃষ্টিতে এর বিচার করে যা কিছু গ্রহণীয় তা গ্রহণ করা শুধু উদার দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণ নয় — প্রয়োজনেরও তাগিদ।

উপসংহার

"মনোহর মূর্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে কোর না নির্ভর
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা করে হয়ো না কাতর।"

মনে রাখতে হবে "সময়ের সার বর্তমান"। যা করবার এখনই করতে হবে।
কবির ভাষায় আবার বলি ঃ

"বিশ্বাস আর সাহস নেই যার
যেওনা তাহার কাছে
নড়াচড়া করে তবু সে যে মরা
জ্যান্ত মরিয়া আছে।"

বিশ্বাস আর সাহস এ দুটো নিয়ে আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকা প্রকৃতির সনাতন ধর্ম। বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া থেকে সাহারা মরুভূমিতে সৃষ্ট জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে জীবনযাপন করে। পরিবেশ যতই প্রতিকূল হইক না কেন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের বেঁচে থাকার মত বাঁচতে হবে, সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক দিক দিয়ে পরনির্ভরশীল, পরজীবী হিসেবে নয়, স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে। জীবন থাকতেও আমরা যেন মরে না যাই। আজকের শপথ এগিয়ে চলার, আত্মশুদ্ধির, অনুশোচনার এবং পরিশোধনের ; পরিতৃপ্তির নয়।

এগার কোটি সন্তানকে শুধু বাঙ্গালী করে নয়, মানুষ করে তুলতে হবে। এ দায়িত্ব আপনার, আমার, সকলের।

এডাব সংবাদ-এর সাথে সাক্ষাৎকার
প্রসঙ্গ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

* আপনার মতে, আমাদের দেশে সার্বজনীন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় কি?

** যে কোনো কিছুতে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন ইচ্ছা, শক্তি ও সামর্থ্য। সেটাকে আমরা সাধারণত রাজনৈতিক সদিচ্ছা বলে থাকি। সদিচ্ছার সাথে আবার সামর্থ্যেরও প্রয়োজন। এরা পরস্পরের সম্পূরক। আমাদের সামর্থ্য বিচার করতে হবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। তা কেবল আর্থিক সামর্থ্য হলেই চলবেনা, জনশক্তিরও সামর্থ্য থাকতে হবে। এই জনশক্তিকে বর্তমান দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এখন স্বাস্থ্য জনশক্তি বলতে শুধু শিক্ষিত চিকিৎসককে বোঝায় না। চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন বা যাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারে, তাঁদের সকলকে বোঝায়। বলতে গেলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সকল কর্মীর পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যবহৃত জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। মোটকথা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জনশক্তিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। এখন আমরা হাসপাতালের চিকিৎসা ও কিছু ওষুধপত্রের মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। শুধু তা নয়, বহুলাংশে আমরা সরকারের উপর নির্ভরশীল। তবে সুখের কথা, বর্তমান সরকার বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন জানিয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্বাস করে না এমন লোকেরও অভাব নেই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অতীতের ভুল ধারণা এবং সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা সার্বজনীন স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল অন্তরায়। এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

* অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্য কতোটুকু?

** একটি ঘটনা দিয়ে শুরু করা যাক। আমি ১৯৫৪ সালে প্রথম যুক্তরাজ্যে যাই। তখন যুক্তরাজ্য ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান উভয় দেশের জনসংখ্যা ছিলো সাড়ে চার কোটি। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের লোকসংখ্যা ৬ কোটি ৬০ লাখ আর বাংলাদেশের ১১ কোটি। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আমাদের দেশে কতোটা এগিয়েছে তা বোঝার জন্যে এ উদাহরণই যথেষ্ট। এ

সময়কালে আমাদের লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

* বিগত একযুগে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর পেছনে ব্যয়কৃত অর্থের সঙ্গে অর্জিত সাফল্যের সঙ্গতি কতোটুকু?

** আগের হিশেব না পাওয়া গেলেও '৭২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৯শ' কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা খাতে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাফল্যের কথা কেবল বক্তৃতামালায় শোনা যায়, প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে। অথচ জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ মহাসত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্ধিত হারে জনগণের অস্তিত্বই তার প্রমাণ। ব্যয়ের সাথে যদি সাফল্যের তুলনা করা হয় তবে উদ্‌ঘাটিত হবে এ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি-না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা ভুল পথে চলেছি। দেশে এ ব্যাপারে প্রচারণার জন্যে গণমাধ্যমের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর পরিধি ও সফলতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সঙ্গত কারণে অনেকে মনে করে, পরিবার পরিকল্পনার সফলতা এখন শিক্ষিত জনসমাজে সীমাবদ্ধ। গণমাধ্যমের যেখানে প্রভাব নেই অথবা যেখানে এ সমস্ত উপদেশ কিংবা নির্দেশ পৌঁছাতে পারে না, ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ লোক যেখানে বাস করে, সেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনার বিফলতা সেখানে সবচে' বেশি। এর কারণ শুধু শিক্ষার অভাব নয়, আর্থিক সঙ্গতি লাভের আশা, শিশুদের অকাল মৃত্যু, অধিক শিশু জন্মদানে এদের উৎসাহিত করে। সীমিত সম্পদ অনেক শিশুর জন্মদানে আরো সীমিত হয়। তবুও এর বিষচক্র তারা বুঝতে পারে না। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর পেছনে ব্যয়কৃত অর্থ যদি তাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যয়িত হতো, তারাও সীমিত শিক্ষিত সমাজের মতো এগিয়ে আসতো। তা হলে বুঝতে হবে, অধিকাংশ মানুষকে অশিক্ষার অন্ধকারে ফেলে রেখে, স্বাস্থ্যহীনতার দুর্ভোগে ঠেলে দিয়ে পরিকল্পিত পরিবার সৃষ্টির ইচ্ছেটা নিছক কল্পনাই থেকে যাবে। সফলতা আনতে পারবেনা। তার প্রমাণ অতীতের ব্যয়কৃত অর্থ এবং সফলতার ব্যবধান। **আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, পরিবার পরিকল্পনায় ব্যয়কৃত অর্থের সিংহভাগ যদি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে খরচ করা হয় তবে আমরা গোটা জাতিকে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রেই এগিয়ে নিয়ে যাব না, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে আগামীদিনের জনগণকেও সুখী জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারবো।**

* প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে যে, এদেশে জন্মশাসন কর্মসূচীর অগ্রগতি মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। এর কারণ কি?

** তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরে তা আলোচিত হয়েছে।

* দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্যে স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করতে হলে আমাদের আশু করণীয় কি বলে আপনি মনে করেন?

** দু' হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্যে স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করা সত্যি সম্ভব নয়। তবুও সর্বস্তরে, এমনকি, প্রতিদেশেই এই কয়টি কথা প্রায় শুনে আসছি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ কথাগুলো বলা হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে মহৎ। তলিয়ে না দেখলে অনেকে হয়তো হতাশ হবেন। অবশ্য আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলে তা হবার কথা নয়। নিঃসন্দেহে 'দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্যে স্বাস্থ্য' আমরা নিশ্চিত করতে পারবো না। তবুও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ন্যূনতম সুযোগ–সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াস পেতে হবে। এতে অংশগ্রহণ করতে হবে সকলের। যে যেখানে থাকুক না কেন, সুস্বাস্থ্য যেমন প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার, এই অধিকারের সুযোগ দানে কিংবা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করাও তেমনি সকলেরই দায়িত্ব। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Health for all and all for health. শাসক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতা, সাধারণ মানুষ, আপনি যেই হোন না কেন, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করণীয় আছে। একজন কৃষককে যেমন উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করে পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করতে হবে, শিক্ষককে যেমন শিক্ষাদানের মাধ্যমে সকলকে সজাগ করে তুলতে হবে, শাসককে তেমনি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সহায়ক হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। মসজিদে, মন্দিরে উপাসনাকে শুধু অঙ্গভঙ্গিতে সীমাবদ্ধ না রেখে ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। কুসংস্কার এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি করতে হবে। এক কথায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অংশীদার সকলেই।

* জন্মশাসন কর্মসূচীর পূর্ণ সাফল্যের জন্যে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

** ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, আলাপ–আলোচনায় পরিকল্পিত পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারবে। এতদিন এসবকে অবহেলা করে দূরে ফেলে রাখা হয়েছে, কাজে লাগানো হয়নি। এখন ধর্মীয় নেতাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অলিতে গলিতে থাকা মসজিদের ইমাম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কমিউনিটি লিডারদের

নিয়ে তৈরি বিরাট জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত পরিবারের বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বিশেষ করে প্রতিটি মসজিদের ইমামকে যদি পরিকল্পিত পরিবার সম্বন্ধে সজাগ করা যায় এবং ইমামগণ এ বিষয়ে নামাজ শেষে যদি জনগণকে বোঝান তবে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃসন্দেহে এ কাজে এগিয়ে আসবেন। সাম্প্রতিককালে এদিকে কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে। এটাকে বহুলাংশে জোরদার করতে হবে।

* স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে বেসরকারী সংস্থাসমূহের বর্তমান অবদান কতোটুকু? ভবিষ্যতে তারা কতোটা অবদান রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

** সরকারী বা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্বাস্থ্য অথবা পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেদিনই সফলতা আনতে পারবে, যে দিন প্রতিষ্ঠান-কর্মীরা সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করবে। যদি কর্মীরা সৎ পথে থেকে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে, তখন কাজ অবশ্যই দ্রুততর হবে। ভুল তথ্য সাময়িকভাবে সন্তুষ্টি দিবে, কিন্তু সফলতা আনতে পারবে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বলি — বসন্তের টিকা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। যুগ যুগ ধরে খাতার পাতায় আমরা দেখেছি, এত হাজার লোককে টিকাদান করা হয়েছে। নিজের চোখে দেখা, তখন টিকাদাররা গাছতলায় বসে খাতায় হিসেব লিখে মায়না নিতো। দেখা গেলো, আমরা সুফল পাইনি। পরবর্তী পর্যায়ে যখন পূর্ণ উদ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় সঠিকভাবে তথ্য পরিবেশিত হলো, মাঠকর্মীরা এগিয়ে আসলো, তাদের তদারক করার জন্যে পূর্ণ উদ্যমে সবাই কাজ শুরু করলো, তখন সফলতাও আসলো। তেমনি পরিবার পরিকল্পনাও সফল করতে হলে যে তথ্য নানা জায়গা থেকে পাই, তা মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভুল তথ্য পরিবেশনকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ; সে সরকারী বা এনজিও কর্মী অথবা শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর সদস্য, যা-ই হোক, তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। তথ্যের সঠিকতা যাচাই করতে না পারলে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও দুর্ভোগ বয়ে বেড়াতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে আমাদের দেশের বিশেষ সফলতা হলো, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে ওআরএসকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। তার পেছনে আছে এনজিওসমূহের প্রশংসনীয় ভূমিকা। এতে সফলতা আসার কয়েকটি কারণ আছে। শুধু প্রচার নয়, সাথে সাথে তার কার্যকারিতাও এসেছে। অথচ পরিবার পরিকল্পনা বা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অন্যান্য সফলতা বিলম্বে আসে। সে জন্যে

এখানে সচেতনতার বেশি প্রয়োজন। আগামী দিনে এনজিওসমূহ তার কর্মীদের কাজের সঠিক তদারকী করতে পারলে সফলতা আসবেই। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা রাখতেই হবে। আমি তো আগেই বলেছি, সরকারের একার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এনজিওকে আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের ওপর দায়িত্ব যেমন বেশি করে দিতে হবে, তেমনি তাদের উপর সজাগ দৃষ্টিও রাখতে হবে। এনজিওকে বেশি করে দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে। এনজিও-র প্রতি সুবিচারপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা কয়েকটি এনজিও যদি খারাপ কাজ করে তবে তা সবার জন্যে বদনাম কুড়িয়ে আনবে। শিল্প থেকে স্বাস্থ্য, সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসতেই হবে। নইলে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়।

* গত কয়েক বছর ধরে বিএমএ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের অভিযোগ করে আসছে। একই সাথে স্বাস্থ্য বাজেট বাড়ানোর দাবী জানিয়ে আসছে। তাদের মতে, এছাড়া সবার জন্যে স্বাস্থ্য কিংবা উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

** ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে জনপ্রতি ব্যয় বরাদ্দ (উন্নয়ন ও রাজস্ব) বাৎসরিক ৩৬ টাকা (১.০৮ ডলার) এবং ওষুধ খাতে জনপ্রতি মাত্র সাড়ে তিন টাকা (১১ সেন্ট) । ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটেও একই অবস্থা বিদ্যমান। জাতীয় বাজেটের ৩% বরাদ্দ ছিলো স্বাস্থ্যখাতে। ভারতে এর পরিমাণ তিনগুণ, শ্রীলংকায় চারগুণ এবং বার্মায় দ্বিগুণ। বিএমএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্যে আমি কোনো ভুল দেখি না। বিএমএ-র দাবী অনুসারে স্বাস্থ্যখাতে বাজেটে ১০ শতাংশ বরাদ্দ করা উচিত। তবে তার পাশাপাশি সরকারের সামর্থ্যের কথাও ভাবতে হবে। জনগণকেও চিকিৎসা খরচের অংশীদার হতে হবে।। আমি মনে করি, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের দাবী একটা ভাওতা মাত্র। ঢালাওভাবে সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান কোনো দেশে কোনো কালে সম্ভব হয়নি। বিনা চিকিৎসায় কেউ প্রাণ হারাক, এটা যেমন কাম্য হতে পারে না, তেমনি সকলকে চিকিৎসার সমান সুযোগ দেওয়াও যে কোনো বিচারে সম্ভব হতে পারে না। সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোকে শুধু ব্যয়ের হাতিয়ার হিসেবে ধরে না নিয়ে কিছুটা আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করতে হবে। যারা সক্ষম, তাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে যারা অক্ষম তাঁদের বিনামূল্যে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কেবিন, পেয়িং বেড, পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ বিত্তবানদের

কাছ থেকে আদায় করে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে সরকারী হাসপাতালগুলোর নাজুক অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যাঙ-এর ছাতার মত নার্সিং হোম গড়ে উঠেছে। এগুলোর মান রক্ষার জন্যে কোনো কথা বলা হয় না। অথচ সরকারী পর্যায়ে আয় হিসেবে সামান্য পয়সা চাওয়া হলে তার বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। এটা কতোটা জনস্বার্থমূলক তা আমাদের অবস্থার নিরিখে বিচার করে দেখতে হবে।

* কিছুকাল পূর্বেও সদ্য পাসকরা ডাক্তারদের সরকারী চাকুরিতে আত্মীকরণ করে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা ছিলো। সম্প্রতি তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ কি দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্যে স্বাস্থ্য অঙ্গীকারের পরিপন্থী নয়?

** প্রতিটি পাসকরা ডাক্তারকে সরকারী চাকুরিতে আত্মীকরণ সম্ভবও নয়, ন্যায্যও নয়। পাস করার পর কেউ সরকারী চাকুরিতে, কেউ দেশে কিংবা বিদেশে উচ্চশিক্ষায় অথবা প্রাইভেট প্রাক্টিসে আত্মনিয়োগ করে জীবন শুরু করবে, এটা শুধু নিয়ম নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। আজকে না হোক, আগামী দিনে কিছু না কিছু ডাক্তারকে বেসরকারী কাজে নিয়োজিত হতেই হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগপত্র দেয়াকে আমি সমর্থন করি। এতে ডাক্তারদের গুণগত মান বাড়বে। ঢালাওভাবে চাকুরি দিলে একদিকে যেমন শিক্ষার মান অনেক নিচে নেমে যাবে, তেমনি ডাক্তারদের পেশাগত মানও নেমে যেতে বাধ্য। স্বীকার করতে হবে, চিকিৎসা-শিক্ষার মান শুধু স্তিমিত নয়, এখন অনেকটা নিম্নগতির দিকে। পাসের হার অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব এখনও প্রকট।

* বর্তমানে দেশের কতোভাগ লোক নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? এই প্রেক্ষাপটে দেশের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরবেন কি?

** কেউ কেউ বলে থাকেন, জীবনে একবারমাত্র চিকিৎসা পেয়েছি। এমন লোকের সংখ্যা ধরলে দেশের শতকরা ৩০ জন লোক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। আমি কিন্তু বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই। আমাদের দেশের শতকরা ১০ ভাগ লোক শহরে বাস করে আর ৯০ শতাংশ সুযোগ-সুবিধা শহরেই। অর্থাৎ হওয়া উচিত ছিলো ঠিক তার উল্টো। তাও যদি হয়ে থাকে, উপযুক্ত শিক্ষিত চিকিৎসকের সান্নিধ্যে আসা শহরের ১০ শতাংশের সকলের পক্ষেও আবার সম্ভব হয়ে ওঠে না। গভীরভাবে তলিয়ে

দেখলে ১১ কোটি লোকসংখ্যার আড়াই কোটি, বড়োজোর তিন কোটি লোক উপযুক্ত স্বাস্থ্য-সুবিধা পাচ্ছে বলে আমি মনে করি। এরচেয়ে বেশি লোক স্বাস্থ্য-সেবা পাচ্ছে মনে করাটা উদ্ভট কল্পনা। কারো কাছে শুনে বা মুরুব্বীদের পরামর্শে ওষুধ কেনা আদৌ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার আওতায় পড়ে কিনা জানি না। তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নানা স্তরের মাঠকর্মীদের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে আমি আমার হিসেবের বাইরে রাখতে চাইবোনা। এ ধরনের প্যারামেডিক্সদের ব্যবহার আমাদের দেশে অপরিহার্য। অনেক উন্নত দেশেও এদের ব্যবহার হয়ে থাকে। সেটা স্বীকার করে নিয়ে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। তার জন্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি দরকার সৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন। তারপর আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে চলা। এ বিষয়ে কিছুসংখ্যক লোকের অনীহা বেসরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বিকাশে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈরী ভাব থাকায় স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হতে পারেনি। এ মানসিকতা পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও উন্নতি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

* ইপিআই বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী সারা বিশ্বেই সাফল্যের শিখর স্পর্শ করতে চলেছে। বাংলাদেশে এর প্রকৃত অবস্থান কোথায়? আমাদের পিছিয়ে পড়ার কারণই বা কি? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আমরা কি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবো?

** এর আগে আমি কয়েকবারই বলেছি, প্রতিটি স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে আমরা যত বেশি জনশক্তিকে কাজে লাগাতে পারি, ততই আমাদের সুবিধে এবং প্রয়োজনও বটে। আরো বলেছি, সরকারের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে, আমাদের মতো দরিদ্র দেশে টিকাদান কর্মসূচী এমন একটি কর্মসূচী যেখানে সকলকে অংশ নিতে হবে। সরকারের একার পক্ষে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হতে পারে না। সেই হিসেবে আমি বলবো, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে নিঃসন্দেহে এগিয়ে আসতে হবে কিংবা তাদের কাজে লাগাতে হবে। তবে আমরা শুধু লিস্টিভুক্ত, সাইনবোর্ডসর্বস্ব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বোঝাচ্ছি না। ঐ রকম হাজার হাজার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। এরা সরকারী অনুদান হিসেবে ১ হাজার, ২ হাজার বা কয়েক হাজার টাকা পায়। কেমন করে তারা টাকা কাজে লাগায়, কি-বা করতে পারে, সেটা আমি ভেবে পাইনা। তবুও আমাদের এমন সব প্রতিষ্ঠান আছে যাদের অতীত কর্মকাণ্ড বিচার করলে ভবিষ্যতে তারা কতোটুকু অবদান

রাখতে পারবে, সে সম্বন্ধে আমরা একটা সঠিক অনুমান করতে পারি। আমি মনে করি, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিয়ে যদি দায়িত্ব দেয়া হয়, কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে তাদের সহায়তা করা হয়, এমনকি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের সীমারেখা আমরা নির্ধারণ করি, তাহলে আমরা এ কর্মসূচীতে অনেক সফলতা আনতে পারবো। ইমাম, ধর্মগুরু, কমিউনিটি লিডারস, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক — এঁদেরকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এঁদের পেছনে সামান্য অর্থব্যয় এঁদেরকে শুধু উৎসাহই যোগাবে না, এঁদের উপর জনসাধারণের যে বিশ্বাস আছে এবং এঁরা নিজ নিজ এলাকায় যে নেতৃস্থান অধিকার করে আছে, তার প্রভাবে টিকাদানে বিরাট সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাপড়ে লেখা দোয়া বাঁশে টাঙানোর দৃশ্য, কলেরা প্রতিরোধের উদ্দেশ্য, এখন সেটা আর আমরা দেখি না। কারণ জনসাধারণ এখন বুঝতে পারছে, শিক্ষার মাধ্যমে বসন্তকে আমরা নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছি। সেই সুসংবাদ এ সমস্ত সুপরিচিত ব্যক্তিদের কিংবা যাঁদের উপর জনগণের আস্থা আছে তাঁদের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দিয়ে যদি তাদেরকে টিকাদান কর্মসূচীতে আমরা নিয়ে আসি, তা হলে কর্মসূচী সফল হবেই। এক কথায় বলবো, সকল স্তরের সকল কর্মীকে কাজে লাগিয়ে দেশব্যাপী যদি আমরা এ কর্মসূচী গ্রহণ করি এবং সকল শক্তিকে সুচিন্তিতভাবে পরিচালিত করি তা হলে সফলতা পেতে পারবো। না হলে সেকালের বসন্ত রোগের টিকার মতো কাগজের খাতায় হয়তো আমরা দেখবো টিকাদান করা হয়েছে শতকরা ৮০ কিংবা ৯০ ভাগকে ; কিন্তু বাস্তবতা হবে ভিন্ন। বর্তমানে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে শতকরা ৩১%। অথচ ১৯৯০ সালের মধ্যে ৮৫% শিশুকে টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মাত্র এক বছরে আমরা কতোটাই বা এগুতে পারবো? এমন অবস্থায় কি করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব, আমি বুঝে পাই না। চিন্তাও করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আমাদের এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতেই হবে। যেহেতু আমরা অতীতে ভুল করেছি, সময়সীমা আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। কার্যক্রম বাড়িয়ে সকলকে কাজে লাগাতে হবে। ১৯৯০ সালের মধ্যে না হোক, ১৯৯৫ সালের মধ্যে আমরা সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবো বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু অতীতের ভুলগুলো যদি সংশোধন না করি তবে আমরা অতীতের অবস্থাতেই থেকে যাবো, এগিয়ে যেতে পারবোনা।

চিকিৎসা শিক্ষার নতুন দিক আই. এ. এইচ. এস.

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞায় স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা বোঝায়। সুস্বাস্থ্য প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকারের সুযোগ-সুবিধে দেয়া কিংবা সুব্যবস্থা করা সমাজের তথা রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব।

বিগত দু'দশকে দেশগুলোতে মানব কল্যাণে অধিকতর অর্থ বরাদ্দের ফলে সমাজের প্রতি স্তরে জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বেড়ে গেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সকল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভের ফলে সুষম রূপ নিয়েছে। '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য' স্লোগান উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামনে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সীমিত অর্থ ও সামর্থ এবং জনশক্তি এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু বাংলাদেশের হিসেব নিলেই এ সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এ দেশের জনসংখ্যা এখন ১১ কোটির উর্ধে। চিকিৎসকের সংখ্যা সরকারী হিসেবে এখন ১৬ হাজার। শুধু তাই নয়, জনসংখ্যার ৮০% ভাগ এখানে গ্রামে বাস করে, আর শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ৮০% ভাগ থাকে শহরে। এ অসম বণ্টনের ফলে আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠী চিকিৎসার সুব্যবস্থা থেকে প্রকৃতপক্ষে দূরে — বহুদূরে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা ধরার জন্য প্রখর বুদ্ধির প্রয়োজন হয়না। ১১ কোটি জনসংখ্যা, ৬৮ হাজার গ্রাম আর ১৭ হাজার চিকিৎসক, অনুপাত সহজেই অনুমেয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮টি। গড়ে প্রতি বছর চিকিৎসক তৈরি হয় ১৩০০ জন। প্রতি ৫০০০ জনগণের জন্য যদি একজন চিকিৎসক ধরে নেয়া হয়, তাহলে আমাদের প্রয়োজন ২২০০০ চিকিৎসকের। ইতিমধ্যে ২০০০ সালের মধ্যে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে দ্বিগুণ। মোট কথা, আমাদের চিকিৎসকের চাহিদা কোনদিনই পূরণ হবে না। অন্যদিকে চিকিৎসকের অসম অবস্থান সমস্যাকে গ্রামাঞ্চলে কেমন বিকট করে তোলে তার আভাস পূর্বেই দেয়া হয়েছে। এ সমস্যার মূল সূত্র এখন আর অজানা নয়।

পশ্চিমা চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা শহরভিত্তিক। শুধু শহরভিত্তিক নয়, শিক্ষাঙ্গনের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ। যে পরিবেশে এখানে চিকিৎসক তৈরি হয়, যেভাবে তারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, বাস্তব জীবনের সাথে তার কোন সঙ্গতি নেই। এখানকার শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক শহরের বাইরে নিজেদের শুধু অসহায়ই মনে করেনা, অচেনা পরিবেশ তাদের কাছে অস্বস্তিকরও। সীমিত সংখ্যক চিকিৎসকের

বাল্যকালে গ্রামের অভিজ্ঞতা থাকলেও কলেজ জীবনের শুরুতেই এর সমাপ্তি ঘটে। এসব কারণে গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিতান্ত ক্ষীণ। এমন আমরা বাস্তবে দেখি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিয়োগপত্রের খাতায় আমরা যত চিকিৎসকের নাম দেখি, সেগুলো নিযুক্তিতেই সীমাবদ্ধ। কর্মক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি নেহাত অস্বাভাবিক। অনেকে নানাভাবে এসব নিয়োগপত্র বাতিল করে শহরে কিংবা শহরের আশেপাশে স্থান করে নেয়। আর যারা অসহায় কিংবা বিফল হয়, তারা কর্তৃপক্ষের অগোচরে শহরে দিন কাটায়, নথিপত্রে কাজ দেখায়, মায়না নেয়।

পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ সারা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে এখন স্বীকৃত। ফলে নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গণমুখী চিকিৎসার প্রবর্তন অনেক উন্নয়নশীল দেশে সুফল বয়ে এনেছে। শুধু তা নয়, বিশ্বজোড়া গণমুখী চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার সকল প্রতিষ্ঠান একটা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের জন্ম দিয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে জানার, বোঝার, সহযোগিতা এবং সহায়তা করার সুযোগ এনে দিয়েছে। গণমুখী চিকিৎসার গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে দেশে দেশে এ শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের উৎসাহ এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে। এর বর্তমান কেন্দ্রস্থল হল্যান্ডের মা আস্ট্রিক্টে অবস্থিত লিমবার্গ ইউনিভার্সিটি। কার্যকরী কমিটির সভাপতি হলেন কেনেডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান, আর সাধারণ সম্পাদক মিশরের সুয়েজ ক্যানেল ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা অনুষদের ডীন অধ্যাপক জুহাইনুর নুমান।

গণমুখী চিকিৎসা বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে কি সুফল বয়ে আনতে পারে, তা পর্যালোচনা করা যাক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যার ১৯৮৭ সালের এক টেকনিকেল রিপোর্টে গণমুখী চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ৬টি কারণ দেখানো হয়েছে ঃ

১। এ ব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মায়। সমাজের সমস্যা এবং চাহিদা তারা অনুধাবন করতে পারে। বুঝতে পারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবস্থার সাথে কতটুকু জড়িত।

২। পুঁথিগত বিদ্যাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় এবং কিভাবে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়া যায় এ শিক্ষা ব্যবস্থা তারই সুযোগ দেয়। বাস্তব জীবনে গ্রাম তাদের কাছে বিকট রূপ নিয়ে আসেনা বরং একটা পরিচিত পরিবেশ হিসেবে দেখা দেয়।

৩। এ ব্যবস্থা শহরে শিক্ষিত চিকিৎসক এবং গ্রামের সাধারণ জনসাধারণের ব্যবধান দূরীভূত করে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হয়।

৪। এ ব্যবস্থায় সমস্যা ও সমাধান সম্বলিত চিকিৎসা ছাত্রদের জ্ঞান আহরণের সহায়ক হয়।

৫। সীমিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কিংবা সুযোগ-সুবিধের মধ্যে নিজ নিজ দক্ষতার পরিচয় দিতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা সুযোগ দান করে।

৬। গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসার মান এ গণমুখী চিকিৎসা শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত হয়।

উপরে উল্লিখিত ৬টি বিশেষ কারণ বিশ্লেষণ করলে পৃথিবীর দারিদ্রতম দেশ বাংলাদেশে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন কত প্রয়োজনীয়, তা সহজেই অনুমেয়। এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আকৃতি, প্রকৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, সরকারী পর্যায়ে সর্বস্তরে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়।

পল্লী অঞ্চলে, এমনকি শহর থেকে দূরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতে চিকিৎসকদের যে অনীহা, তার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যদি এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খানিকটা তলিয়ে দেখি, স্বীকার করতে হবে এ দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতি উপজেলায় কিংবা পল্লী অঞ্চলে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোনদিনই সম্ভব হবে না, যদি আমরা এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের চিকিৎসা করার মনোবৃত্তি চিকিসৎকদের মধ্যে সৃষ্টি করতে না পারি। গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী পর্যায়ের বর্তমান বিফলতা এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে বিরাজমান অনিয়মতান্ত্রিক শূন্যতা দূরীভূত করতে অনেকটা সক্ষম হবে।

শিক্ষাকালীন সময়ে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সরজমিনে শিক্ষার ব্যবস্থা ভবিষ্যতের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে বিশ্বজুড়ে এখন স্বীকৃত। একদিকে যেমন এমন শিক্ষার মাধ্যমে অবহেলিত জনগণের কাছে আমরা চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দিই, অন্যদিকে তেমনি চাহিদা অনুসারে ভবিষ্যতের চিকিৎসক তৈরির বিজ্ঞানসম্মত নতুন পথ ধরি। ফলে সদ্য পাস করা চিকিৎসকের কাছে গ্রাম আর অচেনা থাকবে না। এখানকার সমস্যাও অজানা থাকবে না। অহেতুকভাবে ভয়ের কারণ হবেনা। কারণ চাকুরি জীবনে এসব এলাকা তার নতুন কর্মস্থল নয় বরং অতীতের কর্মস্থলের নতুন দায়িত্ব।

স্বীকার করি বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে কমিউনিটি মেডিসিনের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেও ছাত্রদের গ্রামে গঞ্জে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিতে পারেনি। কিন্তু কেন? হঠাৎ করে নেয়া পরিকল্পনাবিহীন কর্মসূচী বিফলতা বয়ে আনবেই। কমিউনিটি মেডিসিনের কর্মসূচী এরই একটি উদাহরণ। কমিউনিটি মেডিসিনের স্বল্পকালীন কর্মসূচী আর কমিউনিটি-ভিত্তিক মেডিকেল এডুকেশন বা গণমুখী চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা, এ দুটোকে আলাদা করে দেখতে হবে। কমিউনিটি মেডিসিন বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী একটা বিশেষ বিভাগ। কমিউনিটি-

ভিত্তিক মেডিকেল এডুকেশন একটা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ সমন্বয়কারী বিভাগ হিসেবে কাজ করতে পারে, সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে পারেনা। প্রতিটি বিভাগ এখানে জড়িত। এছাড়া চিকিৎসা পাঠক্রমের গোড়া থেকেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে প্রথম বর্ষ থেকে শেষ বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে। কমিউনিটি এবং ছাত্রদের মাঝখানে যোগসূত্র দৃঢ় করতে হবে। বিক্ষিপ্তভাবে একদিন কিংবা মাসে কয়েকদিন স্বল্প সময়ের জন্য কমিউনিটিতে কাজ করে কমিউনিটি-ভিত্তিক মেডিকেল এডুকেশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারেনা। গ্রামীণ পরিবেশে শুধু কাজ নয়, কিছুদিন বসবাস করাও অনেকের মতে উত্তম। তবে এ কর্মসূচীর জন্য শিক্ষকদের উৎসাহ যোগানোর উদ্দেশ্যে কিছুটা সম্মানীর ব্যবস্থা থাকা উচিত। ছাত্রদের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। তাদের শিক্ষাসূচীর অন্যতম অংশ হিসাবে এটাকে মেনে নিতে হবে।

কমিউনিটি-ভিত্তিক মেডিকেল এডুকেশনকে একটা অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্ব জুড়ে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ইনস্টিটিউট অব হেলথ সায়েন্সেস। এখানে শুধু গ্রামমুখী চিকিৎসা নয়, সকল পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন নার্সিং, প্যারামেডিকস, সহকারী চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

নিকটবর্তী দেশ ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, প্রত্যেকটিতেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে ইনস্টিটিউট অব অ্যাপ্লাইড হেল্থ্ সায়েন্সেস (Institute of Applied Health Sciences) একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক কর্তৃক স্বীকৃত। তাদের কাছ থেকে যতটুকু সম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নীতিগতভাবে একে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৯৮৯ সালে ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বানের মাধ্যমে পাওয়া বিপুল সাড়া আমাদের উৎসাহিত করেছে। ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হওয়া আমাদের এ নতুন উদ্যোগ দেশের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত চিকিৎসক তৈরি করতে সহায়ক হবে — এ বিশ্বাস আমরা রাখি। সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষকগণের মাধ্যমে ইমাম, প্রাইমারী স্কুল-শিক্ষক, অন্যান্য ধর্মীয়-নেতা, গ্রাম-ডাক্তার, প্রত্যেককেই নিজ নিজ পরিবেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে পারব বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্বদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিরাট প্রতিশ্রুতি এনে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। দেশে বিপুল সাড়া এবং বিদেশে এর কদর যখন প্রত্যক্ষ করছি, ঠিক সে সময়

প্রথম আঘাত আসে ডাঃ মতিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পর পর। খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরোল, এ প্রতিষ্ঠান সরকার সমর্থিত নয় এবং এখানে সরকারের দায়দায়িত্ব নেই। অনেকের বিশেষ করে ৪২ জন ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের প্রশ্ন, তাহলে কি হবে? জবাবে আমি বলি, যে প্রতিষ্ঠান সামাজিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্ম নিয়েছে তার মৃত্যু নেই। কেউ এর অগ্রগতির পথ রোধ করতে পারবেনা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব-অনুমতি আমাদের ছিল। এ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করেই আমাদের অনুমতি দিয়েছিল। ডায়েবেটিক সমিতি বার্ডেম এমনিভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে। কেউ প্রশ্ন তোলেনি। এখানে ব্যতিক্রম হবে কেন ভেবে আমি কোনদিনই ভাবনায় পড়িনি। এগিয়ে গেছি। সবাইকে অভয় দিয়েছি। পরিচালনা পর্ষদ (গভর্নিং বডি), অধিবিদ্যা পরিষদ (একাডেমিক কাউন্সিল) ইত্যাদি গঠন করে কাজ চালিয়ে গেছি। সম্মানিত সদস্যদের কেউ প্রশ্ন তুললে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছি। অনেকে আশ্বস্ত হয়েছেন। কেউ কেউ স্বভাবতই সন্দিহান থেকেছেন ঠিক পথে চলছি কিনা। আমার কিন্তু কোন ভাবনা কোনদিনই ছিল না।

যাহোক, আবার পটপরিবর্তন। মন্ত্রীমহোদয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি। কিছুদিনের মধ্যে নতুন মন্ত্রী ডাঃ আজিজুর রহমান এফ.আর.সি.এস.-কে নিয়োগ করা হল। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। খোলা মন। কুটিলতা নেই। যা মনে আসে মুখে প্রকাশ করেন। এক কথায় তিনি বহুরূপী কিংবা নীচমনা নন। বস্তুত নতুন দায়িত্ব নেবার পর তিনি সশ্রদ্ধভাবে যাঁদের শুভেচ্ছা কামনা করেন, আমি তাঁদের একজন।

একদিন তিনি বলে বসলেন, আমাদের নবপ্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটে তাঁর এক বন্ধুর মেয়েকে ভর্তি করতে হবে, অবশ্য সে যদি বাছাই পরীক্ষায় টিকে থাকে। উপযুক্ত নিবেচিত হলে নিশ্চয় তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া হবে, এ আশ্বাস দিলাম। বস্তুত তাঁর প্রস্তাবে আমি নিশ্চিত হলাম এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর পূর্বসূরীর মতো অসূয়া ও হীন মনোভাব তাঁর নেই, বরং সমর্থন আছে। বহুলপ্রচারিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ক্যুরিয়ার'-সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান আই.এ.এইচ.এস.-গভর্নিং বর্ডির একজন প্রভাবশালী সদস্য। তাঁর সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা দু'জন মন্ত্রীমহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর অনুমতিপত্র নিয়ে আসব। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সচিব হাসান আহমদ শুরু থেকেই আমাকে এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। মন্ত্রী এবং সচিবের সমঝোতা ছিল চমৎকার। সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারী প্রচেষ্টায় তাঁরা উৎসাহ দিয়ে থাকেন। সে সুযোগে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে রাখা আমরা নিতান্ত সমীচীন মনে করি। দু'তিন দিন পর আমি এবং জনাব এনায়েতউল্লাহ খান মন্ত্রীমহোদয়ের

সাথে সাক্ষাৎ করি। সচিব মহোদয় তখন উপস্থিত ছিলেন। দরখাস্ত পেশ করার সাথে সাথে মন্ত্রীমহোদয় তাঁর সমর্থন জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। আমি ও এনায়েতউল্লাহ খান বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলাবলি করছিলাম মানুষে মানুষে কত ব্যবধান।

কয়েক দিনের মধ্যেই সরকারী অনুমতি পেলাম। প্রত্যেকটি খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হল 'আই.এ.এইচ.এস. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হল' শিরোনামে। ভূতপূর্ব মন্ত্রীমহোদয়ের বৈরীভাব না থাকলে আমরা হয়ত সতর্কতার সাথে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে যেতামনা। অহেতুক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তিনি আমাদের প্রতিযোগী হবার সুযোগ দিয়েছেন। এবং সেইজন্য আমরা সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হয়েছি। স্বল্প সময়ে আমাদের সফলতার পেছনে অতীত এবং বর্তমান মন্ত্রীমহোদয়ের অবদান স্বীকার করতে হবে। এঁদের একজন সাহায্য করেছেন পরোক্ষভাবে, অপরজন প্রত্যক্ষভাবে।

পুর্ণমুদ্রণ ঃ জীবন স্রোতে।

ঢাকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা অতীত ও বর্তমান

বৃটিশ শাসনামলে নানা সংক্রামক ব্যাধি এবং মহামারী, বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে এগুলোর প্রাদুর্ভাব বৃটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলে ১৮৫৯ সালে একটি রাষ্ট্রীয় কমিশন গঠিত হয়। ১৮৬৩ সালে এই কমিশন রিপোর্ট পেশ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেন। ১৮৫৯ সালে জনস্বাস্থ্য কমিশন বাতিল করা হয়, এবং মেডিকেল অফিসারের নাম পরিবর্তন করে সেনিটারী কমিশনার রাখা হয়। সরকারের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে উপদেশ দেয়া তাদের দায়িত্ব ছিল।

১৮৯৬ সালে ঢাকায় প্লেগ মহামারীতে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারায়। পরবর্তী সালে মহামারী আইন ঘোষিত হয়। সেনিটারী কমিশনারকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগের ক্ষমতা দেয়া হয়। শায়েস্তা খানের আমলে পূর্ব থেকে ব্যবসায়ী ও ধর্ম যাজকরা ঢাকায় বসবাস করতে থাকেন। পর্তুগীজদের পরে ওলন্দাজেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঢাকায় আসে, বর্তমান স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ড হাসপাতালের স্থানে ১৭৮১ সাল অবধি তাদের ফেক্টরী ছিল। সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৭ পর্যন্ত অনেক মসজিদ, স্মৃতিসৌধ এবং ভবন তৈরী হয়। এই সময়ে মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ অঞ্চলে তৈরী হয় একটি ছোট মসজিদ যার অস্তিত্ব এখনও চোখে পড়ে। মোগল আমলে ঢাকার পরিবেশ ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর। এখানে সেখানে আবর্জনা-স্তূপ, নিস্কাশন ব্যবস্থার অভাব। কোম্পানী আমলেও একই অবস্থা ছিল।

প্রথম দেশীয় হাসপাতাল

ঢাকায় প্রথম দেশীয় হাসপাতাল স্থাপিত হয় ১৮০৩ সালে। কলিকাতার দেশীয় হাসপাতালের একটি শাখা হিসেবে। এখানে সরকারি সাহায্য হিসেবে কিছু ঔষধপত্র এবং মাসিক ২৫০ টাকা করে অনুদান পাওয়া যেতো। দেশী এবং বিদেশীদের থেকে চাঁদা হিসেবে সংগৃহীত ২২,০০০ টাকার সুদ এবং সরকারি সাহায্য এই দুই নিয়ে হাসপাতালটিতে ৪০ জনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো।

পাগলাগারদ ও জেল হাসপাতাল

১৮১৯ সালে চকবাজারের নিকট একটি পাগলাগারদ এবং জেল হাসপাতাল

নির্মিত হয়। বস্তুত জেল হাসপাতাল এবং পাগলাগারদ যুগ যুগ ধরে এদেশে একই এলাকায় অবস্থান করে এসেছে। মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পর স্বল্পকালে এর প্রায় বিলুপ্তি ঘটে।

মিটফোর্ড হাসপাতাল

ঢাকার জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনায় ঢাকার তৎকালীন কালেক্টর মিঃ রবার্ট মিটফোর্ড-এর অবদান এ সময় গভীরভাবে স্মরণযোগ্য। ঢাকা শহরে দাতব্য এবং বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীতে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুকালে তিনি বাংলা সরকারের হাতে ছ' থেকে আট লক্ষ টাকার মত বিরাট তহবিল রেখে যান। মিঃ রবার্ট মিটফোর্ডের রেখে যাওয়া এই অর্থের উপর নির্ভর করে 'মিটফোর্ড হাসপাতাল', ১৮৫৮ সালের পহেলা মে তারিখে উদ্বোধন করা হয়। এই হাসপাতাল ১৮৬৭ সালের দিকে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হতো।

ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন ৬ই এপ্রিল ১৮৬৮ সালে বাংলার সেনিটারী কমিশনারকে প্রদত্ত রিপোর্টে এই জেলার জনস্বাস্থ্যের অবস্থার একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেন। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এই অব্যবস্থার যে একটি প্রধান কারণ ছিলো তা হান্টার সাহেবের "স্টেটিসটিকেল অ্যাকাউন্টস অব বেংগল" বইটিতে উল্লিখিত আছে। অবশ্য খাজা আবদুল গনি সি. এস. আই.-এর ৫০০০ পাউন্ডের একটা দানের প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা উৎসাহজনক।

'মিটফোর্ড হাসপাতাল' পরবর্তীকালে স্বদেশী ও বিদেশী ব্যক্তিবর্গের দানে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করতে থাকে। হাসপাতাল ভবন নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশী দাতাদের মধ্যে সন্তোষের রানী দিনমনি চৌধুরানী (৪৫,৫০০ টাকা), রায় সাহেব গৌর নিতাই সাহা শংখনিধি ও সন্তোষের রাজা মন্মথ রায় চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও এই হাসপাতালের উন্নয়নের সাথে আরো অনেক দেশী-বিদেশী মহৎপ্রাণ ব্যক্তির দান রয়েছে যাঁদের নাম এখানে স্থান সংকুলানের অভাবে দেয়া গেলো না।

ঢাকা মেডিকেল স্কুল — স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

ঢাকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয় ১৮৮৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেল স্কুলের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী কালে ১৯৬২ সালে এই স্কুলটিই স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত

হয় এবং সংক্ষিপ্ত এমবিবিএস কোর্স চালু হয়। ১৯৭২ সালে এটা একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়।

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট

এর প্রায় ৩৫ বৎসর পরে ১৯২৫ সালের ২৯শে নভেম্বর ৫৩ নং জনসন রোডের একটি ভবনে ইতিহাস–বিজড়িত ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউটের জন্ম। বাংলার যে সকল কৃতীসন্তানের অবদান এখানে অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন — স্যার পি. সি. রায়, খাজা নাজিমুদ্দিন, ডাঃ জে. সি. ঘোষ এবং আরও কয়েকজন।

১৯২১ সালে বৃটিশ সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ এবং ঢাকা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। আর তারই শাখা হিসেবে গঠিত হয়েছিল ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট। এখানে নিয়োজিত চিকিৎসকগণ প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য তাঁদের মাসিক বেতন দান এবং ব্যক্তিগতভাবে দানশীল ব্যক্তিদের নিকট হতে চাঁদা সংগ্রহ করে ৯০,০০০ টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের ভবনটি তৈরি করে তাঁদের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। প্রতিষ্ঠার স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ইনস্টিটিউটের নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। যে কয়েকজন এ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসেন তাঁদের সকলের মন্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবুও দু'একটি উদ্ধৃতি অতীতের আলোকে আমাদের ভবিষ্যতের নির্দেশনা দেবে এই বিশ্বাসে সংযোজিত হলো।

১) সরোজীনি নাইডু ১৯৬২ সালের মে মাসে মন্তব্য করেন, "ইহা তাহাদের দেশপ্রেমের নিদর্শন।"

২) ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে নেতাজী সুভাষ বসু এই ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে বলেন, "এই ইনস্টিটিউটের উন্নতি দেখে আমি গভীরভাবে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এবং গভীর আনন্দ অনুভব করছি। কর্তৃপক্ষের নিকট যে সমস্ত উপাদান রয়েছে তাতে আমার বলতে দ্বিধা নেই এই ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। দেশে চিকিৎসকের যে বিরাট চাহিদা রয়েছে তাতে যে কোন বেসরকারি প্রচেষ্টাকে স্বাগতম জানানো হবে। আমি ইহার সমৃদ্ধি কামনা করি।"

৩) রায় বাহাদুর ইউ. এম. ব্রহ্মচারী ১৯৩১ সালে বলেন, "আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে সরকারি মেডিকেল স্কুল ভিন্ন আরো একটি মেডিকেল স্কুলের প্রয়োজন আছে . . . আমি নিঃসন্দেহ যে, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট নিশ্চয় স্বীকৃতি পাইবে, কারণ ইহা অগ্রগতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।"

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাসপাতালের জন্য উৎসর্গীকৃত কিছু ডাক্তার তন্মধ্যে মরহুম ডাঃ লুতফুর রহমান, ডাঃ কাজী কফিল উদ্দিন আহাম্মদ, ডাঃ কসিম উদ্দিন, ডাঃ মোয়াজ্জম হোসেন, ডাঃ এন. এন. সেন, ডাঃ মনির উদ্দিন প্রমুখ ডাক্তারগণ মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাক্ষী এই হাসপাতালের সমস্যার কথা জ্ঞাত করান এবং এর উন্নয়নের জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করেন। দখলকৃত স্বত্বে মালিকানা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং খরিদ স্বত্বে মালিকানা পূরবী পিকচার্স প্রভৃতিসহ মোকদ্দমার কথাও তাঁরা জানান। অতঃপর সদয় হয়ে তিনি হাসপাতালের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ভূমিমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন।

অতঃপর ত্বরিৎগতিতে ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া শুরু হয়। হাসপাতালের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করেন। হাসপাতালের উন্নয়নের লক্ষ্যে চেষ্টা, রিলিফ ফাণ্ড, ভারতীয় অনুদান ২৫ লক্ষ টাকা ছাড়াও ১৯৭২–৭৩ অর্থ বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা, পরবর্তী বৎসরে ২৪ লক্ষ টাকা এবং এর পর থেকে ৩০ লক্ষ টাকা করে বাৎসরিক অনুদান দিতে থাকেন। উক্ত অনুদানের টাকা হতে হাসপাতালের সকল প্রকার খরচ মিটিয়ে প্রতি বৎসর টাকা সঞ্চয় করে ফিক্সড ডিপোজিটে রাখা হতো এবং এভাবে জমানো সুদে–আসলের টাকা দ্বারা আজকের এই আট তলা ২২৩ শয্যার হাসপাতাল তৈরি সম্ভব হয়েছে।

পশু হাসপাতাল

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটা বিশেষ দিক এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২০ সালে ৩.৩ একর জমির উপর বর্তমান পশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এই জমি দান করেন। দুঃখের বিষয়, কালের গতিতে এমন একটি ঐতিহাসিক হাসপাতালের সম্প্রসারণ আর তেমন চোখে পড়ে না বরং জীর্ণ অবস্থায় এর সংকুচিতরূপ দেখি। তবুও এর প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি।

ভোর কমিটি রিপোর্ট

১৯৪৬ সালের "ভোর কমিটি রিপোর্ট" সারা ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটা অমূল্য দলিল। রিপোর্টে তৎকালীন বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছু তথ্য টেবিল–এ সন্নিবেশিত হলো।

রেজিস্টার্ড ডাক্তার

গ্রেজুয়েট	লাইসেনসিয়েট	মোট	ডাক্তার	ঃ	জনসংখ্যা
৪৫৮৬	৭৬৯০	= ১২২৭৬	১	ঃ	৪৯১৩

হাসপাতালের বিছানা সংখ্যা ১০৯০৫	বিছানা	ঃ	জনসংখ্যা
	১	ঃ	৫৫৩০

রিপোর্টের একটি অংশে বলা হয়েছে, আনুপাতিক হারে ডাক্তারের সংখ্যা এত কম যে, বাধ্য হয়েই প্রতিটি রোগীর পিছনে একজন ডাক্তারকে এক মিনিটেরও কম সময় দিতে হয়। এছাড়া অধিকাংশ চিকিৎসক জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রগতির সাথে সম্পর্কহীন। ফলে তাদের বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ।

বর্তমান ঢাকায় হাসপাতাল

বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত হাসপাতালসমূহ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তালিকা

মেডিকেল কলেজ	ঃ ৩টি	টি. বি. হাসপাতাল	ঃ ১টি
পোস্ট গ্রেজুয়েট ইনস্টিটিউট	ঃ ৮টি	সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল	ঃ ২টি
কলেজ অব নার্সিং	ঃ ১টি	রেলওয়ে হাসপাতাল	ঃ ১টি
ডেন্টাল কলেজ	ঃ ১টি	জেল হাসপাতাল	ঃ ১টি
লেপ্রোসী হাসপাতাল	ঃ ১টি	আয়ুর্বেদিক কলেজ	ঃ ১টি
		হোমিও কলেজ	ঃ ২টি
টি. বি. ক্লিনিক	ঃ ২টি	পুষ্টি প্রতিষ্ঠান	ঃ ২ টি

এছাড়া বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিশেষ অবদান রেখেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল বার্ডেম, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, হলি ফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল, জাতীয় যক্ষ্মা সমিতি, যক্ষ্মা পুনর্বাসন কেন্দ্র, লায়ন এবং রোটারী ফাউন্ডেশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলামিক মেডিকেল মিশন, বি.এ,ভি.এস. ইত্যাদিও প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য বাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইসিডিডিআর,বি. কলেরা এবং উদরাময় চিকিৎসা–ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে।

বর্তমানে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রাইভেট ক্লিনিক এবং রোগ নিরূপণ কেন্দ্র ঃ

প্রাইভেট ক্লিনিক	ঃ	৫৭ টি	পেথোলাজিক্যাল লেবোরেটরী	ঃ	৩৯টি
এক্স-রে ক্লিনিক	ঃ	১০ টি	এম. আর. এবং ডি.এণ্ড সি. ক্লিনিক	ঃ	২টি

ঢাকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

বর্তমানে সব কয়টি মেডিকেল কলেজে ১৩০ জন অধ্যাপক, ১৬৯ জন সহযোগী অধ্যাপক, ১২২ জন সহকারী অধ্যাপক রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪২ জন অধ্যাপক, ৪৬ জন সহযোগী অধ্যাপক এবং ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপক ঢাকা এবং সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে রয়েছেন। এছাড়া পোস্ট-গ্রেজুয়েট চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠনগুলোতে রয়েছে আরও অনেক অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক। মোট কথা, উচ্চতর চিকিৎসা ব্যবস্থা রাজধানী ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ। ফলত সম্পূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন প্রকৃতপক্ষে রাজধানীতেই কেন্দ্রীভূত।

ঢাকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ভারত বিভাগের মাত্র ১ বৎসর পূর্বে ১০ই জুলাই ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ। সুদীর্ঘ ১০ বৎসর আগে ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলেও নানা কারণে তা বিলম্বিত হয়। অবিভক্ত বাংলার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে জনাব মোহাম্মদ আলী এখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং হিসেবে নির্মিত এই ভবনটি অনেক বিবর্তনের সম্মুখীন হয়। ১৯১১ সালে বাংলা বিভাগ রহিত হয় এবং এই ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা আমেরিকান বেইস হসপিটালে রূপান্তরিত হয়। আমেরিকানদের দেশ ত্যাগের পর এটা ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল হিসেবে চালু থাকে।

দেশবিভাগের পর কলিকাতা মেডিকেল কলেজ এবং লেইক মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্ব-পাকিস্তানে এসে এই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়, অধিকন্তু স্থানের অভাবে এই বিল্ডিং-এ স্বাস্থ্য পরিচালকের অফিসও স্থাপন করা

হয়। তখন কর্ণেল মন্টোগোমারী একাধারে ৩টি দায়িত্ব পালন করেন। স্বাস্থ্য পরিচালক, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এবং কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁরই নেতৃত্বে ক্যাম্পাসের অব্যবহৃত স্থানে কতগুলো শেড তৈরি করে ভবনের সম্মুখ স্থানে বহির্বিভাগ চালু করা হয় এবং পশ্চিম পাশে তৈরি করা হয় ছাত্রাবাস এবং তার থেকে কিছুদূরে নার্সিং স্কুল ও তাদের ট্রেনিং সেন্টার। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগ ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানের ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিল্ডিং তৈরি হয় ১৯৫২ সালে ১৬,৩৪,৯০০ টাকায়।

পোস্ট গ্রেজুয়েট চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পোস্ট গ্রেজুয়েট চিকিৎসা ক্ষেত্রে আইপিজিএমআর-এর অবদান প্রশংসার দাবিদার। এটা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শাসনগোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৬৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এম.ফিল. এবং এফসিপিএস কোর্স ৩ জন সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ নিয়ে গড়ে ওঠে। বিশেজ্ঞরা হলেন ঃ স্যার জেমস্ বি. এস. কেমেরুন (বৃটিশ কাউন্সিলের উপদেষ্টা হিসেবে), অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, (যুগ্ম পরিচালক হিসেবে পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে) এবং অধ্যাপক এ. কে. এস. আহম্মদ (হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে)। পরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সাথে যুক্ত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর জানুয়ারি ১৯৭২ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম জহুর আহমেদ চৌধুরী অধ্যাপক ইসলামের অনুরোধে মুসলীম লীগের পরিত্যক্ত ভবনটি (ব্লক এ) পোস্ট গ্রেজুয়েট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাহায্যে ও সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে। স্যার ফ্রান্সিস এভরী জোনস, স্যার জন ক্রফটন, ডঃ আর. এফ. রবার্টসন এবং আরও অনেকের মন্তব্য স্বল্প পরিসরে এখানে উদ্ধৃতি দেয়া গেলনা। এককথায় বলতে গেলে যথাসময়ে প্রাতিষ্ঠানিক জন্ম না নিলে সারা বাংলাদেশের চিকিৎসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ঘাটতি হতো তা আজকের দিনে ভয়াবহ রূপ নিতো। দেশের প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রে এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক নিয়োজিত আছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে যে সমস্ত হাসপাতাল এবং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় এগুলোর স্থান ও সময়কাল লিপিবদ্ধ করা হলো।

ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল

বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল প্রশংসার দাবিদার। ফার্মগেটের নিকটে অবস্থিত এই হাসপাতাল ১৯৬০ সালের ২৯শে জুলাই জনাব এম. ইস্পাহানি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬৬ সালে, অধ্যাপক এম. এ. ওয়াদুদের নেতৃত্বে এই হাসপাতাল চালু হয়। ১৯৭৪ সালে এখানেই হয় প্রথম আই ব্যাংক। ৩০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালে বর্তমানে শয্যাসংখ্যা ৩৫০ এবং ৬২ টি কেবিন আছে।

হৃদরোগ ইনস্টিটিউট

পোস্ট গ্রেজুয়েট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে হৃদরোগ বিশেষ কোন স্বীকৃতি পায়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজে নামে মাত্র একটি বিভাগ ছিল, যার সম্বল ছিল একটি ইসিজি মেশিন। পোস্ট গ্রেজুয়েট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ১৯৭০ সালে হৃদরোগের একটা পূর্ণাঙ্গ বিভাগ এবং করোনারী কেয়ার ইউনিট খোলার সুযোগ হয়। এখানে দুই তিনটি পদেরও সৃষ্টি করা হয়। অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার মালেক ফিজিশিয়ান এবং অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ সার্জন হিসাবে নিযুক্ত হন। হৃদরোগের প্রথম কয়েকটা অপারেশন এখানে করা হয়। বর্তমানে পিজিতে এই বিভাগে করোনারী কেয়ার ইউনিটও চালু আছে।

হৃদরোগ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় শহীদ সোহরাওয়াদী হাসপাতালে ১৯৭৮ সালে। ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আবদুল মালেক এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর সহযোগিতার জাপান সরকার এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পিছনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। হৃদরোগ সম্বন্ধে এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী দেয়া হয়। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে ১০০টি বিছানা এবং ১০ টি কেবিন আছে। চলতি সালে ৪০০ শয্যা বিশিষ্ট ইনস্টিটিউটের কাজ শুরু করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে এই হাসপাতালের বহির্বিভাগে ৩৫,৭৬৮ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং ৫৮২৮ জন রোগী ভর্তি করা হয়। ওপেন হার্ট সার্জারী করা হয় ৯৬ টি, ক্লোজড্ হার্ট সার্জারী করা হয় ১৬০টি, ভাস্কুলার সার্জারী করা হয় ৭০ টি।

ঢাকা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউট

১৯৬৪ সালে বিশ শয্যাবিশিষ্ট কুষ্ঠ ওয়ার্ড ও বর্হিবিভাগ মিটফোর্ড হাসপাতালে চালু করা হয়। ১৯৮২ সালে এই ক্লিনিককে কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয় এবং রোগ চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালটি ৩০টি

শয্যাবিশিষ্ট এবং অদূর ভবিষ্যতে ৬০ শয্যায় বর্ধিত করা হবে। এই ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগে বর্তমানে চার হাজার রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়।

সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল

স্কুল অব ট্রপিকেল মেডিসিন ও পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় একত্রীভূত হওয়ার পর এই উদ্দেশ্যে যে হাসপাতাল তৈরি হয় ১৯৭২ সালের মে মাসে, সেটাকে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে একজন সিনিয়র কনসালটেন্টসহ ১১ জন মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত আছেন।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড

১৯৬৭ সালে ঢাকায় বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশে মোট ৩৮টি হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ আছে। এর মধ্যে দুইটি সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত। ঢাকায় ২টি হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজে বর্তমানে প্রায় ১১শ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে।

টিবি কনট্রোল এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ এবং সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১.৯ একর জমির উপর চানখার পুলে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ডাঃ ডি. মার্কিকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে এখানে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের গোড়ার দিকে (১৯৫৩-১৯৫৪) আমার এখানে কাজ করার সুযোগ হয়। এখানে প্রতিদিন শত শত রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ১৯৮২ সালে বি. সি. জি.র সাথে অন্যান্য টিকাদান কর্মসূচী এই ইনস্টিটিউটের আওতায় আনা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বক্ষব্যাধি হাসপাতাল

১৯৬২ সালে মহাখালীতে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৫ সালে নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। একই সালে এখানে বক্ষব্যাধি পোস্ট গ্রেজুয়েট কোর্স চালু করা হয়। প্রতি বৎসর এখানে ৮০০০-৯০০০ রোগী পরীক্ষা করা হয়। এবং ১০০০ জটিল বক্ষব্যাধি রোগী ভর্তি করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালের বেড সংখ্যা ৫০০, এর মধ্যে ১৫০টি টিবি ছাড়া অন্যান্যগুলো বক্ষব্যাধির জন্য নির্ধারিত।

কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউট / আইসিডিডিআরবি

পাকিস্তান এবং আমেরিকান সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৬০ সালে মহাখালীতে "পাকিস্তান সিয়াটো কলেরা রিসার্চ লেবরেটরী" স্থাপিত হয়। ১৯৭৮ সালে আই, সি, ডি, ডি, আর, বি, নামে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অর্ডিন্যান্স পাশ হয়। এখানে বৎসরে ৬০ থেকে ৮০ হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হয়। কয়েক হাজার বাংলাদেশী এখানে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়েছেন। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এখানে উচ্চমানের গবেষণাকার্য চালানো হয়। এতে কয়েকটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানও জড়িত আছে।

ইনস্টিটিউট অব ইপিডেমিওলজী এণ্ড ডিজিজ কন্ট্রোল

অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট দিল্লীতে অবস্থিত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালে এর একটি অংশ করাচীতে স্থানান্তারিত হয়। ১৯৫২ সালে শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে এই ইনস্টিটিউট "ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন সেন্টার" হিসেবে কাজ চালাতে থাকে। ১৯৮১ সালে কেন্দ্রটি নিপসমের সাথে সংযুক্ত হয়। ১৯৮৭ সালে আবার বিভক্ত হয়ে যায়।

বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটে কালাজ্বর / ম্যালেরিয়া এবং বিভিন্ন প্যারাসাইটিক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

শ্যামলীতে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প। ১৯৭২ সালে এই কেন্দ্রের বহির্বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৮১ সালে যক্ষ্মা এবং কুষ্ঠকে একত্র করে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। এছাড়া এই ইনস্টিটিউটে ৬টি রোগের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি চালু রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র

ঢ্যকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নের সংগে সংগেই চিকিৎসা কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় নাই। ১৯২৪ সালে প্রথম চিকিৎসার বিষয়ে কর্মকাণ্ড শুরু হয়। তখন আলাদাভাবে চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য কোন ভবন ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার পি. জি. হার্টগ–এর সময় চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রথম চিকিৎসক হিসেবে ডাঃ এস. কে. দাশগুপ্ত কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা কেন্দ্রের বর্তমান ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

বর্তমানে চিকিৎসা কেন্দ্রে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছাত্রদের জন্য ৩০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল রয়েছে কিন্তু কোন সাধারণ রোগী ভর্তির ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া চিকিংসা কেন্দ্রে বর্তমানে একটি এক্স-রে ইউনিট, প্যাথলজি, দন্ত ও চক্ষু বিভাগ রয়েছে। উল্লিখিত বিভাগসমূহে বহির্বিভাগ হিসেবে চিকিৎসা দেয়া হয়।

ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল

১৯৬১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগের ৩য় তলায় ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল চালু হয়। বর্তমানে বহির্বিভাগে প্রায় ৪০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

১৯৮৩ সালে ডেন্টাল কলেজে ২০ শয্যার একটি ইনডোর হাসপাতাল চালু করা হয়। দেশে বর্তমানে একটিমাত্র ডেন্টাল কলেজ আছে। বর্তমানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় এক বৎসর পূর্বে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়। নতুন ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের জন্য মীরপুর ১৪ নং-এ ৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

বারডেম (ইব্রাহিম মেমোরিয়েল ডায়েবেটিক সেন্টার)

১৯৫৬ সালে ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ঢাকার সেগুন বাগিচায় বারডেম স্থাপিত হয়। দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে ডায়েবেটিস রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং এর নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির জ্ঞানবিস্তার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, প্রচারের লক্ষ্যে সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা প্রকাশনা, শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম ব্যবহার করা এবং বক্তৃতামালা, সভাসমিতি ও সম্মেলনের আয়োজন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

১৯৮০ সালে বারডেম শাহবাগস্থ নতুন ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৮৪ সালে শাহবাগে বারডেম হাসপাতাল তৈরি করা হয়। ১৯৮৬ সালে বারডেম পোস্ট-গ্রেজুয়েট ডিগ্রী চালু করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান এখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটা সহযোগী কেন্দ্র।

জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট

১৯৭৯ সালে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট শেরে বাংলানগরে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপ্লেক্সের একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থাপিত হয়। চক্ষু চিকিৎসার সর্বোচ্চ সুবিধাসহ বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ও সার্জন তৈরি করা এর মূল লক্ষ্য। এই ইন্সটিটিউট থেকে বর্তমানে স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ দেয়া এবং পরীক্ষা নেয়া হয়।

এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৩ জন ডাক্তারকে বিভিন্ন কোর্সে এখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন, ১৯৮৯) সর্বমোট ১২,৪৭০ জন রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

ঢাকায় অবস্থিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠাকাল
১।	মিটফোর্ড হাসপাতাল	১৮৫৮
২।	ঢাকা মেডিকেল স্কুল	১৮৮৯
	সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	১৯৬২
৩।	কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতাল	১৯২০
৪।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতাল	১৯২৪
৫।	ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইন্সটিটিউট হাসপাতাল	১৯২৫
৬।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৯৪৬

ঢাকায় অবস্থিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠাকাল
১।	টিবি কন্ট্রোল ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	১৯৫৩
২।	ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন	১৯৫৬
	বারডেম হাসপাতাল ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট	
	(ইব্রাহিম ডায়াবেটিক সেন্টার)	১৯৮৬
৩।	ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল	১৯৬০
৪।	ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ ও হাসপাতাল	১৯৬১
৫।	বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল	১৯৬৩
৬।	জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	১৯৬৩
৭।	ঢাকা কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল	১৯৬৪
৮।	পোস্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসা ও গবেষণা মহাবিদ্যালয়	১৯৬৫
৯।	বেসরকারি হোমিওপ্যাথি কলেজ	১৯৬৭

ঢাকায় অবস্থিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (১৯৭২-১৯৮৯)

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠাকাল
১।	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিভেন্টিভ ও সোশাল মেডিসিন	১৯৭৪
২।	হৃদরোগ ইন্সটিটিউট	১৯৭৮
৩।	কলেরা রিসার্চ ইন্সটিটিউট আইসিডিডিআর, বি.	১৯৭৮
৪।	জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট	১৯৭৯
৫।	ক্যানসার ইন্সটিটিউট	১৯৮২
৬।	ইন্সটিটিউট অব এপিডেমিওলজী ডিজিস কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ	১৯৮৭
৭।	সরকারি হোমিওপ্যাথিক কলেজ	
৮।	রেলওয়ে হাসপাতাল	

হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা

ক্রমিক নং	সংস্থা	শয্যা সংখ্যা
(১)	মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	১৩৫০
(২)	পোস্ট গ্রেজুয়েট হাসপাতাল	৮৩০
(৩)	সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল	১৮০
(৪)	যক্ষ্মা হাসপাতাল	৫০০
(৫)	কুষ্ঠব্যাধি হাসপাতাল	১৩০
(৬)	দন্ত চিকিৎসা হাসপাতাল	২০
(৭)	রেলওয়ে হাসপাতাল	৭৫
(৮)	পুলিশ হাসপাতাল	৭০
(৯)	জেল হাসপাতাল	

কোম্পানী আমলের ঢাকা থেকে বর্তমান ঢাকার ব্যবধান অনেক। পরাধীন দেশের শহর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকা এখন সমগ্র বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র। এর শুধু পরিধি নয়, লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। তবুও আমাদের যা কিছু সম্বল তার পরিকল্পিত সুষ্ঠু বণ্টনের অভাবে সমস্যার সমাধান না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকার বাইরে যে-কোন শহর (গ্রামের কথা দূরে থাক) পরিদর্শন করলে বুঝা যাবে এর পরিবেশ কত ভিন্ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখানে কত নিম্নমানের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাসপাতাল থাকলেও চিকিৎসক নেই, চিকিৎসক থাকলেও ওষুধ নেই, কিংবা যন্ত্রপাতির অভাব। স্বাস্থ্য পরিচালকের খাতায়, নামের পেছনে কতটুকু কর্মদক্ষতা আছে এবং রাজধানীর বাইরে কতটুকু কার্যকরী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রিপোর্টে তার করুণ বর্ণনা দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে মেজর জেঃ এম. আর. চৌধুরীর নেতৃত্বে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবার যৌক্তিকতা আছে।

ঢাকার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাথে সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অনেক। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে কিন্তু তবুও জন্ম-মৃত্যুর হার, মানুষের আয়ুষ্কাল, প্রতিরোধযোগ্য রোগসংখ্যা, পুষ্টিহীনতা, অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে, সীমিত সম্পদ ছাড়াও আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরো অনেক গলদ রয়ে গেছে। এর সমাধানের প্রচেষ্টা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হলো ঃ

১। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার মান নির্ণয় ইত্যাদি প্রকল্পের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি হেল্‌থ্ কাউন্সিল গঠন করতে হবে। এতে নেতৃত্ব দেবেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। বিভিন্ন সাব-কমিটি থাকতে পারে। তাদের কাজ নিয়ন্ত্রিত হবে।

২। সরকারি প্রশাসনের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

৩। বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠিত হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে অনূর্ধ ৬টি রিজিওনাল হেল্‌থ্ কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

৪। প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একটা গভর্নিং বডির অধীনে একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হবে।

৫। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সকল ব্যয় সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের শুধু ব্যয়ের জন্য নয়, উপার্জনের দায়িত্বভারও গ্রহণ করতে হবে।

৬। অনিয়ন্ত্রিত প্রাইভেট প্রাকটিস শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং গবেষণা ব্যাহত করে বিধায় নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের সাথে সংগতি রেখে এই প্রাকটিসকে ভৌগোলিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের পরিধিতে নিয়ে আসতে হবে।

৭। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে এর সম্পূরক হিসেবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে।

৮। সকল স্বাস্থ্যকর্মীকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাজে লাগাতে হবে। ইমাম, ধর্মীয় কর্মকর্তা এবং প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। এই উদ্যোগে যতদূর সম্ভব স্বনির্ভর হতে হবে। মোট কথা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে, শুধু সরকারকে নয়।*

---

* ঢাকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সপ্তাহব্যাপী সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ। ৭-১৩ই নভেম্বর ১৯৮৯।

সাপ্তাহিক বিক্রমের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকারে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম

মানের মাপকাঠি নেই, আইনের বালাই নেই, সরকারী নিয়ন্ত্রণের চিহ্নও নেই

(জাতীয় অধ্যাপকদের জীবদ্দশায় জাতির জন্য তাঁদের ব্যতিক্রমধর্মী অবদানগুলো তুলে ধরা এবং তাঁদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পাওয়ার আগ্রহ থেকে আমাদের এ সিরিজ ইন্টারভ্যু ইতোমধ্যে জাতীয় দায়িত্বের অংশ ভেবে কয়েকজন অধ্যাপক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, বাকীদের মুখোমুখি হতেও আমরা আগ্রহী। সুযোগমত সংখ্যা পরম্পরায় এসব সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হবে। এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার)

-- **সাপ্তাহিক বিক্রম**

বিক্রম ঃ আপনার অবসর সময় কিভাবে কাটে?

ডাঃ ইসলাম ঃ আমাকে চাকুরি থেকে অবসর দেয়া হয়েছে কিন্তু কাজ থেকে নয়। তাই পিজিতে যাওয়া ছাড়া বাকী অন্য কাজগুলি সবই করতে হচ্ছে। বরং পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কাজের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানসিক কারণে আমি পি জি তে যাইনা। আমি মনে করি, যে প্রতিষ্ঠানে জন্মলগ্ন থেকে আমি দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম, ব্রিটিশ চিকিৎসা সাময়িকীতে যেখানে আমাকে এই কেন্দ্রের জনক হিসেবে, পোস্ট গ্রাজুয়েটের ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, তার যৌক্তিকতা বিচার না করলেও ১৯৬৫ থেকে ৮৭ সন পর্যন্ত ২৩ বছর ধরে যে প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি জড়িত ছিলাম, যে প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তর প্রতিরোধে অনড় মনোভাব নিয়ে তৎকালীন সরকারের সাথে লড়তে হয়েছিল, সে প্রতিষ্ঠানে আমার অবদান আমার নিজের বলার প্রয়োজন রাখেনা। অথচ আমার জীবনেতিহাসের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দু'টি ঘটনা এ প্রতিষ্ঠানেই ঘটে। প্রথমটি চাকুরি থেকে আমার অপসারণ, দ্বিতীয়টি জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে আমার কর্ম-

কক্ষ থেকে বিতাড়ন। আপাতঃদৃষ্টিতে এ দুটি ঘটনাই মর্মভেদী ও বেদনাদায়ক হলেও এর পেছনে সফলতার নিদর্শন রয়েছে। যেমন চাকুরি থেকে অপসারণ, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আইনে। আর কক্ষ থেকে বিতাড়ন আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে জনগণের হৃদয়ে। আমার প্রতি জনগণের কি পরিমাণ ভালবাসা রয়েছে তা জানা সম্ভব হত না যদি না কিছু লোকের চারিত্রিক কারণে রাতের অন্ধকারে আমার কক্ষ তছনছ না হতো। কথা শুনে মনে হবে প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য নেই, অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আমি তা মনে করিনা। কারণ যে প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক তাকে বিসর্জন দিয়ে দূরে থাকার ইতিহাস যদি জানা না থাকে তবে সরলপ্রাণ জনগণের কাছে আমি দোষী সাব্যস্ত হব। পিজি-তে আমার অনুপস্থিতি এবং সেখানে যাবার যে অনিচ্ছা তার দুটি মুখ্য কারণ এখানে তুলে ধরলাম শুধু সঠিক তথ্য পরিবেশনের লক্ষ্যে।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। একমাত্র পি জি ছাড়া বলতে গেলে বর্তমানে সর্বত্রই আমার কর্মস্থল। বেতন কমিশন থেকে শুরু করে মাদকাসক্তি ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ-এর কোনটা থেকে বাদ পড়েনি। আমাকে জড়িত করা হয়েছে নানা কমিটি ও সাব-কমিটির মাধ্যমে। তাছাড়া সময় পেলে কিছু লেখাপড়া করা আমার অভ্যাস। দু'একটি গবেষণা কাজে বিশ্ব স্বাস্থ্য-এর সাথে জড়িত আছি। ইসলামিক মেডিকেল মিশন ও সাম্প্রতিক কালের 'আধুনিক' সকলেরই জানা। ইসলামিক মেডিকেল মিশনের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম অনেক, অনেক এগিয়ে গেছে।

বিক্রম ঃ কি কারণে এবং কাদের জন্য আপনি পি জি থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন?

ডাঃ ইসলাম ঃ যে বিশেষ ব্যক্তির নেতৃত্বে আমার বিরুদ্ধে পি জি-র মর্মান্তিক অভিনয় ঘটে গেল তিনি নিজেই এখন মর্মপীড়ায় ভুগছেন। বর্তমানে পি জি-তে যাবার আমার কোন আইনগত বা নীতিগত বাধা নেই। তবুও মানসিক দিক দিয়ে বর্তমান পরিবেশে সেখানে আমার অবস্থানের কথা তো দূরে থাকুক উপস্থিতিও কষ্টকর হবে।

বিক্রম ঃ 'আধুনিক' গঠনের পেছনে আপনার কোন্ বিষয়টি কাজ করছে?

ডাঃ ইসলাম ঃ আমি নিজে ধূমপায়ী ছিলাম। পঞ্চাশের দশকে যুক্তরাজ্যে যখন ধূমপানের কুফল সম্পর্কে প্রথম তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে তার কিছুটা প্রভাব আমার উপর পড়ে। ষাট-এর দশকে নাফিল স্কলারশীপ নিয়ে লন্ডনের রয়েল ফ্রী মেডিকেল স্কুলে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করার সময় আমি এ বিষপান ত্যাগ করি। এর পেছনে আমার স্ত্রীর কিছুটা অবদান রয়েছে। এ সুসংবাদ অনেক ধূমপায়ী স্বামীর অসহায় স্ত্রীকে উৎসাহিত করবে আশা করি।

তামাকের সাথে আমার সম্পর্কচ্ছেদ এবং তার বিষক্রিয়া সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করা আমার দায়িত্ব। চিকিৎসক হিসেবে আমার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সর্বস্তরের জনগণের কাজে লাগানোর জন্য আমাকে আমার বিবেক সচেতন করে তোলে। বিদেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ধূমপান-বিরোধী আন্দোলনে অনেকদূর এগিয়ে গেছে দেখে আমিও অনুপ্রাণিত হই। তাছাড়া আমার আরও কয়েকজন বন্ধু বিশেষ করে এনায়েতুল্লাহ খান যখন আমার এ চিন্তার সাথে অভিন্ন মত ব্যক্ত করেন, তখন আমরা উভয়ই মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে জাতীয় ধূমপান বিরোধী প্রতিষ্ঠান 'আধূনিক' প্রতিষ্ঠা করি। 'আধূনিক' প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পূর্বে *'সাসক'* নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করা হয়েছিল, আমি এর নামকরণ করেছিলাম। যার অর্থ হল স্টুডেন্ট এন্টি স্মোকিং কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলী নেয়ামত-এর নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্র ধূমপান-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ করলে আমি এই নাম দিয়ে একটি সংগঠন করার পরামর্শ দেই। এ উৎসাহই পরবর্তী পর্যায়ে আমাকে 'আধূনিক' গঠনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

বিক্রম ঃ 'আধূনিক' কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে?

ডাঃ ইসলাম ঃ স্বল্প সময় হলেও আধূনিক এখন সর্বজনস্বীকৃত সফল জতীয় ধূমপান বিরোধী প্রতিষ্ঠান। বস্তুত এটা এখন একটি আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি আধূনিকের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও সারা জীবন অধূমপায়ী। তাঁর উৎসাহ এবং আমাদের প্রচেষ্টায় বঙ্গভবন এখন ধূমপানমুক্ত এলাকা। রেডিও-টেলিভিশনে ধূমপান নিষিদ্ধ। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে কেউ ধূমপান করতে পারবেনা। সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যেমন হাসপাতাল, ডিসপেনসারী প্রভৃতি ধূমপান-

নিষিদ্ধ এলাকা। এ ছাড়া আরও অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিক্রম ঃ একটিমাত্র বিষয়কে বেছে নিলেন কেন?

ডাঃ ইসলাম ঃ আমি মাদক–বিরোধী আন্দোলনেও জড়িত আছি। এর বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। আসলে অনেক দেশেই ধূমপান–বিরোধী প্রতিষ্ঠান মাদকদ্রব্য ও নেশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। একই আংগিকে আধুনিক –এর কার্যক্রমও ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি লাভ করবে, প্রসারিত হবে। আমরা বসে নেই। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি।

বিক্রম ঃ সমাজের কোন্ কোন্ স্তরের লোক আপনার এ সংগঠনে যোগদান করেছে?

ডাঃ ইসলাম ঃ সর্বস্তরের লোকজন বিশেষ করে সমাজকর্মী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ছাত্র প্রভৃতি লোকজন 'আধুনিক'–এ যোগদান করে।

বিক্রম ঃ ধূমপানের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে কিছু বলুন?

ডাঃ ইসলাম ঃ বিভিন্ন কারণে এটা সম্ভব নয়। তবে আমাদের দেশে ছোট করে যে সতর্কীকরণের বিজ্ঞাপন ছাপা হয় তা শাস্তিযোগ্য। কারণ সতর্কীকরণ জনগণের দৃষ্টিতে পড়তে হবে। কোন কোন দেশে ধূমপানের যে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তার ২০–৩০ ভাগ স্থান জুড়ে থাকে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে পরামর্শ। আমাদের দেশেও এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য এবং আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বিক্রম ঃ আপনি যে একটি ওষুধনীতি প্রণয়ন করেছিলেন তা কি বাস্তবায়িত হয়েছে?

ডাঃ ইসলাম ঃ এ পর্যন্ত বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রণীত যে সকল নীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ওষুধনীতি। দেশে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লুপ্তপ্রায়। প্রয়োজনীয় ওষুধের সংখ্যা এবং তাদের মান বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক গুণ। ফ্যাশনের ওষুধ এখন আর ব্যবস্থাপত্রে স্থান পায়না। ওষুধের উর্ধ্বমূল্য প্রতিরোধ করা হয়েছে। কিছু কিছু ওষুধের আমদানির প্রয়োজন হয়না। আমরাই এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাছাড়া আরও বেশি কিছু উপকার সাধিত হয়েছে। তবে কিছুসংখ্যক অতিউৎসাহী লোক কয়েকটি ওষুধের বেলায় দাম কমাতে কমাতে এমন পর্যায়ে এনেছে বা নিতে যাচ্ছে

তাতে ওষুধের মান রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে কেউ কেউ তুলে নিয়েছে। অন্যদিকে নীতিবিবর্জিত কিছু কিছু কোম্পানী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ঔষধের মান বিসর্জন দিয়েছে। তাই এ অবস্থা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বাজারজাতকৃত ওষুধের মূল্য নির্ণয় করতে হবে। তা না হলে আমরা হয়তো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব। ওষুধনীতির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

বিক্রম ঃ আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করার জন্য কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ডাঃ ইসলাম ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে জনশক্তি বাড়াতে হবে। এ জন্য আমাদের অব্যবহৃত জনগণকে কাজে লাগাতে হবে। গ্রাম পর্যায়ে যেখানে ৮০ থেকে ৯০% ভাগ লোক বাস করে চিকিৎসার সুযোগ সেখানে অত্যন্ত সীমিত। তাই সেখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক ডাক্তার পাঠাতে হবে।

বিক্রম ঃ দশম শ্রেণীতে একটি সাধারণ চিকিৎসা বিষয় যোগ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক পর্যায়ে কিছু কিছু বিষয়ে জ্ঞান দেয়া সম্পর্কে আপনার অভিমত বলবেন কি?

ডাঃ ইসলাম ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুটা জানা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সে হিসাবে স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু পরিবারের লোককে সহজে বুঝাতে পারে। এমন প্রকাশনা তাদের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে পারলে একদিকে যেমন জনগণের ভোগান্তি হ্রাস পাবে, তেমনি সরকারের উপর চাপের বোঝাও অনেকটা কমে আসবে। ইসলামী মেডিকেল মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ' পুস্তিকাটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বিক্রম ঃ বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় কি ধরনের ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

ডাঃ ইসলাম ঃ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে আছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাঙের ছাতার মত যে ধরনের নার্সিং হোম গড়ে উঠছে সেগুলির মানের কোন মাপকাঠি নেই। আবার অনেকগুলিতে যেমন কোন প্রকার আইনের বালাই নেই তেমনি কোন প্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণের চিহ্নও নেই। আর এ সুযোগেই নিজ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে অনেকেই যেমন তেমনভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নার্সিং হোম গড়ে তুলছে। জনসেবা যার মোটেই লক্ষ্য নয়।

তাই এখন বিশেষ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়ন করে আইনের মাধ্যমে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যে সকল আইন আছে বলে আমরা দাবী করি তার যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। যারা আইন অমান্য করার চেষ্টা করবে তাদের শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ নিয়ম সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে কার্যকরী করতে হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তাতে সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে। তাহলে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের মাঝখানে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি না পেয়ে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি গড়ে উঠবে। ফলে জনগণ ও সরকার উভয়েই লাভবান হবে।

বিক্রম ঃ সরকারী ডাক্তারদের প্রাইভেট ক্লিনিকে কাজ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

ডাঃ ইসলাম ঃ যাচাই করে দেখতে হবে এর ফলে আমরা আমাদের দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পারছি। জনগণ কতটুকু সেবা পাচ্ছে। এর ভিত্তিতেই এ ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

বিক্রম ঃ আমাদের স্বাস্থ্যনীতি শহর ভিত্তিক হাসপাতাল গড়ে তোলে। তাতে সাধারণ মানুষের কতটুকু উপকার হয় বলে আপনি মনে করেন?

ডাঃ ইসলাম ঃ শহরে হাসপাতাল থাকতেই হবে। তবে সে হাসপাতালে যদি গ্রাম্য লোকদের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে বুঝতে হবে উন্নতমানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে শতকরা ৯০ ভাগ লোক অর্থাৎ গ্রাম্য জনসাধারণ বঞ্চিত। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে চাহিদা অনুসারে হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা না গেলেও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা সম্ভব। বাংলাদেশে আটটি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা ব্যবস্থা শহরেই সীমাবদ্ধ। মাত্র স্বল্পসংখ্যক গ্রাম্য লোক এখানে আসার সুযোগ পায়। চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রতিককালের আমূল পরিবর্তনকে আমরা এখনও গ্রহণ করিনি। আমাদেরকেও প্রথমবর্ষ থেকে শেষবর্ষ পর্যন্ত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষকের নেতৃত্বে গ্রাম পর্যায়ে হাতে-কলমে কাজের ম্যাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

চিকিৎসক হিসাবে ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ড এবং র্কমক্ষেত্র সম্পর্কে অভিহিত হওয়ার এটা একটি উপায়। অন্যদিকে বিচার করতে গেলে এর মাধ্যমে গ্রামে থেকেও অসহায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা উন্নতমানের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এ ব্যবস্থা বহুদেশে অনেক পূর্বেই

চালু করা হয়েছে।

স্বীকার করতে হবে, এ ব্যবস্থার প্রয়োজনীতা ও নিশ্চিত সুফল রয়েছে। গ্রামমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা আমরা যে মাঝে মাঝে বলি কিন্তু কার্যকরী করতে পারিনা, এর মাধ্যমে তা সম্ভব হবে।

বিক্রম ঃ প্রতি বছর মেডিকেল কলেজসমূহ থেকে প্রায় ১৩০০ করে ডাক্তার বের হয়। এ সকল ডাক্তারের চাকুরির ব্যবস্থা কিভাবে করা যায়।

ডাঃ ইসলাম ঃ চাহিদার তুলনায় আমাদের দেশে চিকিৎসকের সংখ্যা এখনও বলা যায় খুব নগণ্য। সাড়ে এগার কোটি লোকের জন্য ষোল হাজারেরও কম চিকিৎসক শুধু উন্নত দেশে নয়, অনেক উন্নয়নশীল দেশেও কল্পনার বাইরে। তবুও এদের অনেকে এখনও বেকার। কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। প্রয়োজনানুসারে পদের সৃষ্টি হয় না বলেই এই গরমিল। প্রতিটি উপজেলায় ন'জন করে ডাক্তার আছে বলে আমরা দাবী করি। কাগজ-কলমে কথাটি সত্য হলেও কার্যক্ষেত্রে বহুলাংশে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সবাই কাজ করে একথা ধরে নিলেও একটুখানি তলিয়ে দেখলেই তেমন উৎসাহের কারণ দেখি না। চিকিৎসক এবং জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আমরা কোথায় আছি তা-ই বিচার করে দেখতে হবে। সামগ্রিকভাবে বিচার করে দেখলে স্বীকার করতে হবে আরও অনেক অনেক চিকিৎসক প্রয়োজন। এই অবস্থায় চিকিৎসকের বেকার থাকার প্রশ্নই উঠেনা। সুযোগ সৃষ্টি না করে এদেরকে বেকার রাখা সমীচীন হতে পারেনা। অবহেলিত জনস্বাস্থ্যকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে না গেলে সমগ্র জাতি নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়ে পড়বে। শিশুমৃত্যুর সাথে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিশুদের সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে না পারলে জনস্বাস্থ্যের এবং জাতির প্রধান সমস্যা জন্ম নিয়ন্ত্রণ কোনদিনই কার্যকরী হতে পারবেনা। এই বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে হলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অপরিহার্য। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, একটু পূর্বেই যেমন ইংগিত দিয়েছি চিকিৎসা শিক্ষাকে গ্রামমুখী করে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিয়ে যেতে হবে। সকল স্তরের জনশক্তিকে নিজ নিজ আওতায় কাজে লাগাতে হবে।

বিক্রম ঃ দু'হাজর সালের মধ্যে যে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" কর্মসূচী নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হবে কি?

ডাঃ ইসলাম ঃ দু'হাজার সালের মধ্যে "সবার জন্য স্বাস্থ্য" শাব্দিক অর্থে যা বুঝায় তা করা সম্ভব নয়। আর ক'বছরই বা বাকি! তবে একথাগুলির পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল বা আছে তা হল একটা এগিয়ে যাওয়ার পথ। নিঃসন্দেহে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সকলেরই কাম্য। সে লক্ষ্যে পৌছাতে হলে একটা নির্ধারিত সময়সীমা সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। সেই উদ্দেশ্যেই এ বিশেষ সময়ের ইংগিত দেয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক বিক্রম ঃ ৩০ জুলাই — ৫ আগষ্ট '৯০ইং।

পেশা, জনসাধারণ এবং সংবাদপত্র

আজ বাস্তবিকই আমার জন্য এক স্মরণীয় দিন। এর কারণ শুধু একটি নয়, অনেক। যে মুহূর্তে আমাকে প্রথম ইব্রাহিম স্মারক বক্তৃতা দেবার অনুরোধ করা হয়েছিল, আমি তীব্রভাবে সে ব্যক্তির অপূরণীয় অন্তর্ধান অনুভব করেছিলাম। তাঁর অভাব আমরা আজও এত উপলব্ধি করছি। যা হোক, এরপরই যখন আমি চিকিৎসা পেশার এ মহান সৈনিকের জীবন ও কর্ম স্মরণ করলাম তখন দুঃখের এ অনুভূতি মিলিয়ে গিয়ে আবির্ভূত হল অগাধ সন্তোষ। যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন গৌরবের তুঙ্গে তাঁর স্মরণে বক্তৃতা করা সোজা কাজ নয়। তবে পরিতৃপ্তি ও সন্তোষের অনুভূতি শরীর ও মনের ক্লেশ কমিয়ে সামর্থ্য বাড়াতে পারে। অন্তরতম এ অনুভূতিগুলোই আমার অনীহা দূর করে আমাকে প্ররোচিত করেছে আজকের এই সম্মানিত দায়িত্ব নিতে।

বক্তৃতাটির জন্য যে শিরোনাম আমি পছন্দ করেছি তা বেশ জটিল বলে প্রতিভাত হয়। এর আওতা হয়তো যা হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি। এটি কেবল আমাদের পেশার মধ্যে সীমিত নয়, বরং চিকিৎসা পেশার সাথে আরো যেসব প্রধান বিষয় অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছে তাদেরকেও বেষ্টন করেছে। যেমন — জনসাধারণ ও সংবাদপত্র।

জনসাধারণ বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যা

এ পেশা জনসাধারণের জন্যই অস্তিত্ব নিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি জনবহুল দেশ। এর জনসংখ্যা প্রতি বৎসর শতকরা ২৪ হারে বাড়ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ শতাব্দীর শেষে তা ১৫ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। উদ্বেগজনকভাবে বাড়তে থাকা জনসংখ্যাকে সামনে রেখে দেশের কিছু স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক।

সারণি-১ ঃ বাংলাদেশের কিছু স্বাস্থ্য-পরিসংখ্যান

হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যা	৩৩,০০০
নিবন্ধিত চিকিৎসক সংখ্যা	১৬,০০০
চিকিৎসক প্রতি জনসংখ্যা	৭,০০০
নিবন্ধিত সেবিকা সংখ্যা	৭,০০০
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে ব্যয়	৩৫.৯০ কোটি
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে মাথাপিছু ব্যয়	৩৪.০০ টাকা

স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়

সারণি ১ থেকে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে এখানে জনসংখ্যা অধিক, চিকিৎসকের সংখ্যা অতি অল্প ও ব্যয় খুবই কম। সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সরকার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ন্যূনতম চাহিদাগুলোও মেটাতে পারেনা। বর্তমানে জাতীয় বাজেটের প্রায় শতকরা ৩ ভাগ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হয়। ওষুধ যোগাড়ের ব্যয়ের দিক দিয়ে দেখলে এ বণ্টনের হার বছরে মাথাপিছু ৩.৫০ টাকা। এর প্রতিফলন ঘটেছে অভাবী জনতার জন্য দেয়া স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায়। আমি ইচ্ছা করে 'অভাবী' শব্দটা ব্যবহার করেছি কারণ এর এমন তাৎপর্য রয়েছে যা হাসপাতাল চিকিৎসা ব্যবস্থার হালহকিকতের ইশারা আনে। সরকারী হাসপাতালগুলোতে বিনা ব্যয়ের শয্যা, টাকা-দেয়া শয্যা, গ্লানকক্ষ (কেবিন) ও বিশেষ ব্যক্তিদের গ্লানকক্ষ (ভিআইপি কেবিন) রয়েছে। বিনাব্যয়ের শয্যাগুলোই মোট সংখ্যার অধিকাংশ, টাকা-দেয়া শয্যাগুলো মোট সংখ্যার ১০%-১৫%-এর মধ্যে সীমিত। একটি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্লানকক্ষের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-এর মধ্যে। বেতন ও মর্যাদা অনুসারে সরকারী কর্মচারীরা টাকা-দেয়া শয্যা ও গ্লানকক্ষে বিনাখরচে চিকিৎসা পাবার অধিকার রাখে। তাদেরকে প্রতিদিন খাবার খরচ বাবদ মাত্র ২৫ টাকা দিতে হয়।

ভাবার্থ

বেশির ভাগ গ্লানকক্ষই সরকারী কর্মচারীদের দখলে থাকে, বিশেষ ব্যক্তিদের গ্লানকক্ষগুলো মন্ত্রীদের বা তাঁদের সমকক্ষদের দখলে। এসব কক্ষে নিখরচায় ওষুধপত্র সরবরাহ করা হয়। হাসপাতাল তহবিলকে এইসব প্রধান এলাকাগুলোর দিকেই নিয়োজিত করা হয়। অপূরণ থেকে যায় বিনা-টাকার শয্যাসমষ্টির বিরাট চাহিদা। এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ করায় অভাবী জনতা তাদের প্রাপ্য সেবাটুকু কখনো পায় না। ইদানিং নিখরচা চিকিৎসা বলে আসলে কিছু নেই। অসহায় দরিদ্র রোগীদের সবকিছুই কিনতে হয় — খাবার, ওষুধ, সিরিঞ্জ, ব্যান্ডেজের তুলো ; প্রকৃতপক্ষে সবধরনের দরকারী জিনিষপত্র, এমনকি সাধারণ খাবার, যা হাসপাতাল থেকে পরিবেশন করা হয়, তাও পর্যাপ্ত না। কাজেই মাত্র একটি বিছানা, শোবার একটু জায়গা, রোগযন্ত্রণা বা ক্ষুব্ধ পরিবেশের মধ্যে অস্বচ্ছন্দে হয়ত একটু ঘুমাবার সুযোগই নিখরচায় পাওয়া যায়। এসত্ত্বেও আমরা দরিদ্রদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা দেবার জন্য পরিতৃপ্তি বোধ করি।

চিকিৎসকগণ ও জনসংখ্যা

রোগীর অনুপাতে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর সংখ্যা এবার বিবেচনা করা যাক।

আমি ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কে উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি। আমাদের কাছে অগ্রণী বলে প্রতিভাত এমন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রকৃতাবস্থায়

সারণি ২ ঃ ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে রোগী ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মী

চিকিৎসক	১৮১
অন্তর্বিভাগ	১২৯
বহির্বিভাগ	৫২
সেবিকা	২৪৬
বহির্বিভাগে দৈনিক রোগী	১১৭১
জরুরী বিভাগে দৈনিক রোগী	১৮৫

দেখা যাচ্ছে, বহির্বিভাগের একজন চিকিৎসককে দৈনিক ২০ থেকে ৩০ জন রোগী দেখতে হয়।

এ রোগীরা প্রধানত গ্রাম বা বস্তি থেকে আসা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র লোক। তারা নিজেদের রোগের বর্ণনা দিতে পারে না। বিচারশক্তি তাদের দুর্বল। প্রায়শঃই তারা এমন সব লম্বা কাহিনী বলে যায়, যার সাথে তাদের রোগের তেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না। কেউ হয়ত ফুসফুসের কর্কটব্যাধির (ক্যানসারের) ইতিহাস শুরু করবে। অসুখী স্বপ্নের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে অথবা কোন অনৈসর্গিক বৃষ্টির অভিজ্ঞতা বা কোন–কোন বয়োজ্যেষ্ঠের ঘন–ঘন অসন্তুষ্টি বা বিরক্তির কথা বলে। তারা এ্যানজাইনার কারণে বুকের বাঁ পাশের ব্যথাকে সনাক্ত করতে না পেরে পল্লবিত বর্ণনা দিয়ে বসে বিশেষ খাবারের জন্য পেটে জমা হওয়া 'বায়ুর'। জনাকীর্ণ বহির্বিভাগে বসে প্রায়ই অশিক্ষিত রোগীদের নিয়ে কাজ করা চিকিৎসকের জন্য সহজসাধ্য নয়। নির্ধারিত সময়টুকু অপ্রয়োজনীয় তথ্যের কথা শুনতেই কেটে যায়, সত্য নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকরা অতিরিক্ত সময় দিতে পারেনা। এর ফল দাঁড়ায় আপাত–অমনোযোগিতা, প্রায়শ ভুল রোগনির্ণয় ও ভুল–নির্দেশিত পরীক্ষা–নিরীক্ষায়। এসবই অকার্যকর করে দেয় স্বাস্থ্যসেবা বিতরণকে, যা জনতা ও এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অবিশ্বাস ও ভুল বোঝাবুঝি সঞ্চার করে। বস্তুত এমন পরিস্থিতি চিহ্নিত করার পরই আমাকে এ পেশার পক্ষ নিতে হবে। অন্যথায় সবকিছু নীতিহীন শোনাবে।

অন্তর্বিভাগের অবস্থা

এখন আমরা হাসপাতালের ভেতরকার কার্যকলাপে একবার তাকাতে পারি। আমি সবার আগে কোন শিক্ষা-হাসপাতালকে বেছে নেব যা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে বা স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত রয়েছে। বহির্বিভাগে যেখানে রোগীর সংখ্যার ওপর সীমা আরোপ করা যায় না, যে তুলনায় অন্তর্বিভাগের অবস্থা স্বচ্ছন্দ। সরু বারান্দা ও যে কোন খালি জায়গায় পেতে রাখা অতিরিক্ত শয্যাগুলো সত্ত্বেও এখানে যেন তাদের সীমা আছে। চিকিৎসক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের শিক্ষাক্রম শেষ করার সময় সেবার অতিরিক্ত শক্তি যোগ করতে পারে। প্রশ্ন করা যেতে পারে অন্তর্বিভাগের সেবা পুরোপুরি সন্তোষজনক কিনা, রোগীর যত্ন আদর্শ কিনা। সৎভাবে আমরা এর উত্তরে হ্যাঁ বলতে পারি না। এমন এক সময় ছিল যখন এসব হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ছিল কম, চিকিৎসকের অভাব ছিল, অর্থাৎ সবকিছুই কম ছিল। পরিবেশ ছিল শান্ত, সম্পর্ক ছিল আন্তরিক, চিকিৎসক-রোগীর মধ্যে সাক্ষাৎ সংশ্রব ছিল। সময় বয়ে যাবার সাথে সাথে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হলো। আশঙ্কাজনক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের সব সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে, এমনকি তা কল্পনার সীমা পেরিয়ে গেছে। তা ক্ষয় করেছে অর্থনীতিকে, ক্ষুব্ধ করেছে পরিকল্পনাকে এবং বাস্তবে ডেকে এনেছে সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীনতা। আমরা তাই আর কোন কোলাহলমুক্ত হাসপাতাল দেখি না, যেখানে রয়েছে প্রশান্ত পরিবেশ। শুধু রোগীদের জন্য নয়, সারাদিন ধরে তাদের দেখতে আসা লোকজনদের অনিয়মিত স্রোতে হাসপাতালগুলোতে ভিড় লেগেই থাকে। সাক্ষাতের সময়ের অস্তিত্ব কেবল ফলকে ও কাগজে রয়েছে। এমনটা কোন উন্নত দেশে পাওয়া যায় না। যে সুযোগসুবিধাগুলো আছে, প্রাথমিক হিসাবের চেয়েও অনেক বেশি লোক সেগুলো ভাগাভাগি করে নেয়। বরাদ্দ অর্থ দিয়ে চাহিদামাফিক খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায় না ; প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ওষুধ দেয়া হয় ; গবেষণাগার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিভাগে আছে আবশ্যকের চেয়ে কম কর্মী। কাজে কাজেই মান পড়ে যায় চিকিৎসার, সেবা নষ্ট হয়ে আসে, হাসপাতালের সেবার ওপর আস্থা কমে যায় জনসাধারণের।

বেসরকারী চিকিৎসাগার (ক্লিনিক), হাসপাতাল

আজকাল রোগীরা বা তাদের আত্মীয়বর্গ সরকারী হাসপাতালের সেবা ব্যবস্থায় সন্দিহান হয়ে বেসরকারী চিকিৎসাগার বা হাসপাতালে যায়। ব্যয়নির্বাহের জন্য তার সহায়সম্পত্তি সব বিক্রি করে দেয়, কেননা তারা জানে কোন কিছুই জীবনের চেয়ে

মূল্যবান নয়। যদি রোগটা সারার হয় এবং তারা সেরে ওঠে, তাহলে আশা নিয়ে সুদিনের অপেক্ষায় থাকা যাবে।

যখন এর বিপরীত ঘটে, না–সারার রোগীরা পরম দুর্দশাপন্ন পরিণতির মুখোমুখি হয়। তাদের অর্থাবস্থা ও পরিবার বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যারা বাকি থাকে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। অসুস্থতা, দারিদ্র ও দুর্দশার এক ক্রুরচক্র এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবার থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে সমাজে, শেষপর্যন্ত আক্রান্ত করে সারা জাতিকে।

তাই বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থ দিয়ে পীড়িত। কেবল নগরীর বিভিন্ন অংশে নয়, এমনকি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চারপাশে প্রত্যাশিত মানের চেয়ে কখনো নিচু মানের সেবাদানকারী চিকিৎসাসদনের সংখ্যা বৃদ্ধি, বহুকাল ধরে সম্মানিত হাসপাতাল সেবায় জেগে–ওঠা অনাস্থাকে প্রমাণ করে। এর আগে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য জনশক্তি ও বর্ধিষ্ণু রোগী জনতার কথা উল্লেখ করছি। আমরা সবাই স্বীকার করি, একজন চিকিৎসকের এবং সে দিক দিয়ে সরকারী দায়িত্ব পাওয়া যে কোন পেশাদারের ওপর ন্যস্ত কাজের মাত্রা এরই মধ্যে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বেশি যে কোন কিছুই পরিস্কারভাবে তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

বেসরকারী চিকিৎসাগার ও চিকিৎসাসদনের দেয়া অতিরিক্ত অর্থ–সুবিধাদি, কর্মক্ষেত্রের (যেমন ঃ সরকারী হাসপাতাল/চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান) প্রতি তাদের নৈতিক দায়িত্ব থেকে চিকিৎসকদের সরিয়ে নিয়ে যায়। তাদের সময় ও শক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে টেনে নেয়া যাবে না। গণপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবক্ষয়রত স্বাস্থ্যসেবায় এ সত্য প্রতিফলিত হয়েছে। যে চিকিৎসা–শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের ও অন্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামনে আদর্শ দৃষ্টান্ত রাখতে বাধিত, তাই হয়ে ওঠে সব অনিয়ম ও অমনোযোগিতার দৃষ্টান্তস্থল। এমন বিধ্বংস ছড়িয়ে গেছে শ্রেণীকক্ষ থেকে শয্যাপাশের চিকিৎসা–শিক্ষা পর্যন্ত। প্রথমটাকে কোনরকমে অনিয়মিতভাবে চালান হয়, পরেরটা অযত্নে ভেসে যায়।

শিক্ষাদান ও পরীক্ষা

যথেষ্ট বিস্ময়কর ব্যাপার হল, ওপরে–বলা কারণবর্গ পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করেনা। বছরে বছরে সাফল্যের (?) শতকরা হার বেড়েছে। দেশের সকল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে বছরে প্রায় ১৩০০ থেকে ১৪০০ জন স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সংখ্যার দিক থেকে একে মনে হয় যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মানের দিক দিয়ে একে সন্তোষজনক বলা অনেক দূরের কথা। বিবিধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও

সাক্ষাৎকারের ফলাফল প্রকৃত তথ্যকে বের করে আনে। একেবারে প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশ্নগুলো অনেক ছাত্রছাত্রীর কাছে দুর্বোধ্য শোনায়। তবুও পরীক্ষার বাধা পেরুতে তাদের কোন অসুবিধে হয় না। বাস্তবিকপক্ষে তারা কোন বাধারই সম্মুখীন হয় না। এমন দুঃখজনক অবস্থার অন্য দুটো কারণ থাকতে পারে। যে শিক্ষক তার শিক্ষকতায় ও অন্যান্য কাজকর্মে কোন সংপ্রশ্ন (চ্যালেঞ্জ) মোকাবেলা করতে পারে না দলগত চাপ এড়াতে ও পেশার প্রতি খাঁটি অর্থে সৎ না থেকেও বাইরে জনপ্রিয় থাকার জন্য ছাত্রদের উত্তীর্ণ করাতে সে উদ্বিগ্ন থাকে। প্রশাসনের সামনে নিজের কৃতিত্বকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিষ্ঠানে খোলামেলা মনোভাব নেয়। ছাত্রছাত্রীদের অধিবিদ্য ক্রিয়াকলাপের ওপর নির্ভর না করে পরীক্ষার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক থাকছে, অন্ততঃ সংখ্যার দিক থেকে। কাজেই আমরা নামের পাশে নতুন অক্ষর–বসান অনেক ডাক্তার বানাচ্ছি, কিন্তু বছর–বছর প্রশিক্ষণের পরও তারা অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আয়ত্ত করতে পারেনি।

হাসপাতাল সেবা

অনুষঙ্গক্রমে হাসপাতালের রোগীরা মনোযোগ পাবার অভাবে ভোগে। একজন চিকিৎসক হয়ত তার অধীনে ভর্তি–হওয়া রোগীকে দিনের পর দিন পরীক্ষা করে না, কোন কোন ক্ষেত্রে একদম না। কিছু সময় পরে ঐ রোগী হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়, হয় রোগ–অনির্ণীত অবস্থায়, নয় নতুন ডাক্তারদের হাতে কোনরকমে ব্যবস্থা পেয়ে। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এটা আরো জটিল। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা এখন বেশ কমে গেছে, যদিও জনশক্তি বেড়েছে। ওজর উঠিয়ে অস্ত্রোপচারের রোগীকে ফিরিয়ে দিতে কোন কষ্ট হয় না। এর কারণ শারীরিক ও নৈতিক। আগে যেমন বলেছি, কাজের আসল স্থলের বাইরে শক্তিব্যয়ের ফল প্রথমটা, আর পরের কারণটা আর্থিক।

এসব মন্তব্য হয়ত কর্কশ, এমনকি স্ববিরোধী শোনাবে। কিন্তু নৈতিক বাধ্যবাধকতা সত্যছবির প্রদর্শন চায়। যাহোক, ঘন কালো মেঘের পেছনে সবসময় একটি রূপালি আস্তর থাকে। শিক্ষকতা ও হাসপাতাল সেবার এ বিষণ্ন পরিবেশ কিছু প্রদীপ্ত দৃষ্টান্তের জন্য কেটে যায়। এমন আত্মনিবেদিত কর্মীরা আছেন যাঁদের ক্রিয়াকলাপ তাঁদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল তার চেয়েও উজ্জ্বল। তাঁদের অনেকেই অদেখা, অচিহ্নিত থেকে যান। তাঁদেরকে অনেক সময় নিযুক্তি, পদোন্নতি ও বদলি নিয়েও অবিচার বা অনিয়মের শিকার হতে হয়।

বেসরকারী খাতের উন্নয়ন

কোন বৈধ যুক্তি ছাড়াই অনেকে বেসরকারী খাতের উন্নয়নের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে থাকেন। বেসরকারী চিকিৎসার ও সেবাসদনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবেনা। সরকারী উদ্যোগকে পরিপূরণ করার জন্য এগুলো অত্যাবশ্যক। বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো সেজন্যই সরকারের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে আসছে। তবে সহযোগিতার সাথে সাথে তাদের সার্বিক মান ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে সুদৃঢ় মাপকাঠিকে অবশ্যই বহাল করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের সৌষ্ঠবনিষ্পত্তির সময় এগুলো অনুসৃত হতে হবে। সমাজ সচেতনতা দাবি করে, সেবাদলের এখনকার মতো সংখ্যাবৃদ্ধিকে আমরা অবশ্যই রোধ করব। এ বিষয়ে আমাদেরকে অবশ্যই জাতির গৌরব 'বার্ডেম' থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সুলভ সুযোগ-সুবিধা

পেশাদার সামর্থ্যের বিকাশ ও উন্নতির জন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার। একজন নিবেদিত ও যোগ্য কর্মী যখন চারপাশে অনেক ফাঁক দেখতে পায়, হতাশা বোধ করে। অনেক কারণের অবদান হিসেবে সাফল্য আসে যদি আমরা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার ওপর মনোযোগ দিই, তাহলে যে মূল ব্যাপারগুলো বেরিয়ে আসে সেগুলো গবেষণাগার, রোগনির্ণায়ক সুযোগ-সুবিধা, সহযোগী কর্মীবৃন্দ ও গ্রন্থাগারের সাথে সম্পর্কিত। স্ব স্ব মানদণ্ড ও কার্যক্রম থাকলেও গবেষণাগারগুলো দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আছে। যন্ত্রপাতি ও অনুরঞ্জকগুলো (রি-এজেন্ট) সময়-শেষ-হওয়া পদার্থের অথবা অব্যবহার্য জিনিসের সংগ্রহ মাত্র। হারানো যন্ত্রাংশগুলো বদলান হয়নি, হয় তাদের যোগাড় করা যায় নি বলে, নয় সংশ্লিষ্ট নথিটি প্রশাসনিক প্রণালীর ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে, যা জটিল রোগের চেয়েও জটিলতর।

অনুরঞ্জকগুলো প্রায়শ প্রতিক্রিয়া করে না। তথাপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। এ সমস্ত বিরূপতা, অভাব এবং অসুবিধার মুখে এটা কোন বিস্ময় নয় যে, জনতার বিশ্বাসবঞ্চিত হয়ে একসময়কার সম্মানিত পেশা আপন ভাবমূর্তি হারিয়েছে।

সংবাদপত্র

আমি এখন একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয় তুলে ধরতে চেষ্টা করব — আমাদের পেশার ব্যাপারে সংবাদপত্রের ভূমিকা। কোন জাতির, একইভাবে কোন ব্যক্তির জীবনে সংবাদপত্র অপরিহার্য। যে কোন নিয়মিত পাঠক প্রতি সকালে তার

দোরগোড়ায় পত্রিকা আসার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে। দেশে–বিদেশে বিগত চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনাবলী জানতে সে উদ্বিগ্ন থাকে। চমকজাগানো প্রত্যেক খবর তাকে সচকিত করে, প্রত্যেক আনন্দ সংবাদে সে হৃষ্ট হয়। যখন এমন সংবাদ আসে যা বাস্তব ঘটনার বা সে যা বলেছিল তার একেবারে বিরোধী, সে ক্রূরতম আঘাত পায়।

আমাদের মেনে নিতেই হবে সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দেয়ায়, জনতাকে শিক্ষা দেয়ায় এবং প্রশাসন বা পেশার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সবাইকে দিকনির্দেশনা দেয়ায় সংবাদপত্রের মুখ্য দায়িত্ব রয়েছে। আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু যেহেতু চিকিৎসা পেশায় সংবাদপত্রের ভূমিকা, আমি এ বিশেষ বিষয়েই মনোনিবেশ করব। সংবাদপত্রের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা এক রকম হয়নি। এটা আনন্দ ও ব্যথার মিশ্রণ। এ বিষয়ে আলাদা–আলাদা প্রসঙ্গালাপ থেকে আমি নিবৃত্ত থাকব। সতর্ক প্রহরী হিসেবে সংবাদপত্র তথ্য প্রতিবেদন করার, অনিয়ম ও অনাচারকে আলোতে এনে তদন্ত, বিচার ও শাস্তি বিধানের দাবি করার দায়িত্ব অবহেলা করতে পারে না। তা করতে গিয়ে একে অবশ্যই নিরপেক্ষ, ইতিবাচক ও জোরালো হতে হবে। অপরাধীকে অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, তার অবস্থান যাই হোক না কেন। বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। সংবাদপত্রসেবীরা হয়ত কিছু ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। সত্যটা হয়ত অনুজ্ঞাবিহীন অনধীনতা ও সম্পূর্ণ বিধিনিষেধের মাঝামাঝি কোথাও রয়েছে।

তবে অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বিশ্বাস করি, চিকিৎসা পেশা সম্বন্ধে খবর প্রকাশে সংবাদপত্রগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। কিছু কিছু চিকিৎসা প্রতিবেদন এ মতের পর্যাপ্ত প্রমাণ বহন করে। তবে এটা বিব্রতকর, যখন দেখা যায় সংবাদপত্রগুলো কোন নিষ্পাপ চিকিৎসককে নিষ্ঠুরতার জন্য অভিযুক্ত অথবা কোন মৃত্যুর জন্য দায়ী করছে, অথচ নিষ্ঠুরতার জন্য অন্য কেউ দায়ী ছিল, আর মৃত্যুর বেলায় রোগটাই ছিল দুশ্চিকিৎস্য। কেবলমাত্র শোকসন্তপ্ত পরিবারটি তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে বলেই আবেগ ও সহানুভূতিতে আক্রান্ত সংবাদপত্রগুলো চিকিৎসকের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ছাপায়।

গ্রাম এলাকা থেকে আসা একটি খবর এখানে তুলে ধরছি। খবরটি একটি সুপ্রচারিত দৈনিকে প্রকাশিত হয়ে তথ্যানভিজ্ঞদের ছাড়া প্রত্যেক চিকিৎসককেই আমোদ দিয়েছে।

"প্রাণরক্ষাকারী ওষুধ অপ্রতুল"

সম্প্রতি একটি স্থানীয় গ্রামে কমপক্ষে বিশ ব্যক্তি ডায়রিয়ায় মারা গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, "মৃত্যুর কারণ ছিল এন্টেরোভাওফর্ম নামের বিশেষ ওষুধের অভাবে, যা এ রোগ নিরাময়ের জন্য নির্দিষ্ট।"

এ উদাহরণটি বিশ্লেষণ করলে অন্তর্বর্তী সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে চিকিৎসকরা বিনা দোষে দোষী হয়ে পড়ে। ফলে অনিবার্যভাবে এ পেশার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এখানে সত্যটি হল, অন্ধত্ব সৃষ্টির মতো গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে এন্টেরোভাওফরমের উৎপাদন নিষিদ্ধ হয়েছে। ডায়রিয়ায় এর কোন কর্মক্ষমতা নেই। একমাত্র অবস্থায়ী আন্ত্রিক এমিবায়োসিসে (ক্রনিক ইনটেসটিনাল এমিবায়োসিস, এমিবাঘটিত রক্তামাশয়) এর উপকারিতা ছিল। এন্টেরোভাওফরমের অভাব'কোনক্রমেই উল্লেখিত মৃত্যুগুলোর কারণ হতে পারে না। তবুও পত্রিকা এমন একটা অভিযোগ তুলেছে যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং যা ঐ প্রতিবেদকের ডাহা অজ্ঞতার দৃষ্টান্ত। কোন চিকিৎসকের কাছ থেকে ঐ প্রতিবেদকের এ তথ্য পাবার সম্ভাবনাকে বাতিল করা যায় না।

কারণ যাই হোক, সঠিক প্রতিবেদন করার দায়িত্ব থেকে সংবাদপত্র, এবং প্রতিবেদককে বৈজ্ঞানিক তথ্য অথবা এন্টেরোভাওফরমের প্রকৃত মর্যাদা সম্বন্ধে জানাবার দায়িত্ব থেকে চিকিৎসক অব্যাহতি পেতে পারেনা। প্রতিবেদকের পক্ষে সংবাদকে বাড়িয়ে তোলার ও সংবাদ যাচাই অসমাপ্ত রাখার প্রবণতা অযথার্থ বা বিভ্রান্তিকর সংবাদের জন্ম দিতে পারে। বিরল নয় যে, সামান্য ঘটনার ওপর দেয়া একটি পল্লবিত প্রতিবেদনে একজন চিকিৎসককে অনেক লোকের কাছে প্রিয়ভাজন করে তোলে, যারা ঐ বিশেষ ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ। যেমন, শরীরের কোন অংশ থেকে কোন এক বিরাট আকারের অর্বুদ (টিউমার) অপসারণের খবর অভিজ্ঞ লোকের কাছে অসাধারণ না শোনালেও অন্যদের কাছে আশ্চর্যকর শোনাতে পারে। চিকিৎসক তার প্রাপ্যের বেশি কৃতিত্ব পায়। অতএব সংবাদপত্র এ পেশাকে জনতার সামনে যেমন উন্নত করে তুলতে পারে, তেমনি পারে অপমানিত করতে। যেসব প্রকাশনা এ পেশার বিরুদ্ধে যায় তা জনতা ও প্রশাসনের মধ্যে কৌতূহল জাগায়।

স্বীকার্য যে, সবসময়ই সংবাদপত্র বৈরীভাবাপন্ন থাকেনা। চিকিৎসা পেশার কিছু চাহিদা পূরণের দাবিতে বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির (বি.এম.এ.-এর) সাম্প্রতিক আন্দোলন সম্পর্কে পত্রিকাগুলোর ভারসাম্য দৃষ্টিভঙ্গি অনেকের কাছে সহানুভূতিশীল মনে হলেও সত্যকে তুলে ধরা ও দায়দায়িত্ব সুচিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার সাথে দেয়া গঠনমূলক ইঙ্গিতের জন্য তারা অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

নিরপেক্ষ সংবাদপত্র জাতির গঠনমূলক কাজকর্মে বিরাট অবদান রাখতে পারে। জাতিকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে তা দিকনির্দেশ দিতে, ত্রুটিবিচ্যুতি, অনিয়ম ও অপকীর্তির বিরুদ্ধে সাবধান করে দিতে পারে। পক্ষান্তরে, এর বিপরীতে কোন পদক্ষেপ বয়ে আনতে পারে বিধ্বংসের ইশারা। আমাদের জাতীয় পত্রিকাগুলো কখনো এ পেশার বিরুদ্ধভাবাপন্ন ও কখনো বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছে। তাদের কাছে আশা করা হয় বিবেচনার লক্ষ্য বা উপযুক্ত দণ্ডবিধানের পাত্র যেই হোক না কেন তাঁরা সত্যের আলোক বহন করবে।

আমার দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ

১। জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিকিৎসা পেশা অন্য যে কোন দেশ থেকে কোন ভাবেই আলাদা নয়।

২। জনশক্তি ও অন্যান্য সম্পদের অযথা বণ্টন শেষপর্যন্ত আমাদের অপ্রতুল সম্পদ বিতরণকেই দূষিত করেছে, যা স্বাস্থ্য খাতের অসন্তোষজনক অবস্থাকে করে তুলে আরো গভীর।

৩। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী সম্মতিক্রমে বিকশিত হচ্ছে। এগুলো অত্যাবশ্যক হলেই নির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতায় সরকারের সম্পূরক হিসেবে এদেরকে সেবা দিতে হবে।

৪। দুঃখদুর্দশার জন্য জনতা এ পেশাকে ভুল বোঝে, অথচ মূল কারণ থাকে অন্যখানে।

৫। বড় বড় চিকিৎসা-শিক্ষা হাসপাতালগুলোর ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সেবাসদনের সংখ্যাবৃদ্ধি, হাসপাতালের কিছু শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীদের বাইরে আকর্ষণে সাহায্য করেছে। এতে আরো অবক্ষয় এসে পড়েছে শিক্ষকতা, স্বাস্থ্যসেবা ও গবেষণায় একটি ক্রূর-চক্র স্থাপিত হয়েছে।

৬। সংবাদ প্রতিবেদন কখনো কখনো তথ্যনিষ্ঠ হয়না। তথ্যাজ্ঞাত চিকিৎসকের অযথা মন্তব্য ও অযোগ্য সংবাদপত্রসেবীদের কারণে প্রায়ই এমন হয়। ভুল প্রতিবেদন অবিশ্বাস জন্ম দিতে পারে।

৭। সত্য ঘটনা তুলে ধরায়, অপকীর্তির উদঘাটন এবং পেশা ও প্রশাসনকে সুপথের নির্দেশ দেয়ায় সংবাদপত্র মৌলিক ভূমিকা নিতে পারে।

উপসংহার

অন্য যেকোন পেশার চেয়ে চিকিৎসা পেশার সম্পর্ক হয়ত জনতা ও সংবাদপত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ। এ পেশা ও প্রজাসাধারণ অবিচ্ছেদ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঐ সংযোগ দৃঢ় হয়ে ওঠতে পারে।

যত সমস্যা এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল চাহিদা ও সম্পদের অসঙ্গতি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোয় এটা বেশ নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্থূলভাবে এ পেশার সদস্যদের দু'গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম গোষ্ঠীতে রয়েছে নিবেদিত, মনোনিবিষ্ট, নীরব কর্মীরা।

পরেরটিতে অনিবেদিত প্রগল্‌ভরা। পরের দলই যে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও রোগী সেবার জন্য তারা নিযুক্ত তা উপেক্ষা করার মতো অনৈতিক কাজে লেগে সেবাসদনের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়।

ক্ষয়িষ্ণু অধিবিদ্য পরিবেশ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাস্থ্যসেবা মান, সেবাসদন ও বেসরকারী চিকিৎসাগারের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে যোগ হয়ে চিকিৎসা–শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও গবেষণা ক্ষেত্রের এক বিষণ্ন ভবিষ্যৎ তুলে ধরে। এমন অবস্থায় পরিবারই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। প্রভাবশালী ও ধনীরা ঈর্ষণীয় অবস্থানে আছে। গ্লানকক্ষ বা চিকিৎসাগার, যেখানেই তারা থাকে সেখানেই সবরকম মনোযোগ পায়, ভোগ করে নানা সুযোগ–সুবিধা। গরীবরা যথেষ্ট মনোযোগ পায়না ; বিনামূল্যের চিকিৎসা বাস্তবে নেই। হাসাপাতাল চিকিৎসার ওপর বিশ্বাস কেঁপে গেছে। অনেকের কাছে এগুলো নিরাময়ের চেয়ে উপেক্ষার কেন্দ্র। এ পেশার গণভাবমূর্তি এভাবে সংপ্রশ্নের সম্মুখীন, সমালোচনা বাড়ছে, মাঝে মাঝে প্রকাশিত সংবাদ–প্রতিবেদন এ আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। চিকিৎসকদের নীতিজ্ঞানশূন্য ঐ দ্বিতীয় দল এ আক্রমণ থেকে বেঁচে যায় ; নিবেদিত দল এর শিকার হয়। প্রশাসনেরও কখনো যথার্থ নীতিনির্দেশের অভাব থাকে। বাকচতুর তোষামোদেরা বিকশিত হয়ে ওঠে, কিন্তু নীরব অথচ নিবেদিতরা কষ্ট পায়।

আমি বিশ্বাস করি, চিকিৎসা–শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অসুবিধে দূর করে এদের মানোন্নয়নের কাজে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতে পারে। মিথ্যার অনুপ্রবেশ ও ছলচাতুরিকে নিরুৎসাহিত করতে পারার মতো নিরপেক্ষ তথ্যনিষ্ঠ পত্রিকা বিরাট অবদান রাখতে পারে এ পেশা ও প্রশাসনে বিদ্যমান অশুভ উপাদানবর্গ অপসারণে। যাদের মধ্যে আছে চিকিৎসা পেশা সম্বন্ধে জনতার অবস্থা ও ভুল ধারণা। বিবিধ বাধা থাকলেও এভাবেই তার পক্ষে সুস্থতর ও সমৃদ্ধতর সমাজ গড়া সম্ভব।

অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহীমের জীবন ছিল শৃঙ্খলা, আত্মনিবেদন, বিনয় ও সেবার সমষ্টি। তাঁর নিজের কথায় "শৃঙ্খলাই জীবন।" প্রত্যেক কাজেই এটা ছিল তাঁর সতর্কমন্ত্র। এ 'স্মরণীয় সময়' যখন আমার রয়েছে ইব্রাহীম স্মারক বক্তৃতা দেবার বিশেষাধিকার, যে শব্দটা আমার মনে ঝলসে যাচ্ছে, তা হল "শৃঙ্খলা"। এটাই ছিল বার্ডেম প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরল সাফল্যের গুপ্তসূত্র। এ প্রতিষ্ঠানে একত্রে সংহত রয়েছে বেসরকারী উদ্যোগ, সরকারী সাহায্য ও কাজের স্বাধীনতার মধ্যে জন্মানো শৃঙ্খলা। যদি পেশা ও প্রশাসন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত থাকে এবং পত্রিকাগুলো সে সমাচার ছড়িয়ে দেয় বৃহত্তর সমাজে, আমরা জাতিকে–ক্ষয়–করা অনেক ব্যাধি ও অশুভকে উন্মূল করতে পারব। বাংলাদেশের চিকিৎসা পেশার মহত্তম সন্তানের জীবন ও কর্ম আমাদের ও আমাদের বংশধরদের যেন অনুপ্রাণিত করে।

১৯৯০ সালের ১৯ শে মার্চ এসোসিয়েশন অব ফিজিসিয়ান্স কর্তৃক
আয়োজিত জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম. ইব্রাহিম স্মারক বক্তৃতা ।

আইএএইচএস-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, বিশেষ অতিথি যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, অতিথিবর্গ এবং ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনেরা,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশের চিকিৎসা জগতের ইতিহাসে আজ একটা গৌরবময় দিন। এতে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি।

আজকের দিনটির তাৎপর্য একাধিক।

বিপদগামী রাজনীতির ফলশ্রুতিস্বরূপ সামাজিক অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত নতুন সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের। যুগের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরবর্তীকালে এখন পুনর্বাসন এবং পুনর্গঠন নিয়ে আমরা সকলেই বিরাট এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নিত্যনৈমিত্তিক সামাজিক অপরিহার্য চাহিদাপূরণে সীমিত সাহায্য নিয়ে প্রতিনিয়ত আমরা যে জটিলতার সম্মুখীন হই আজকের দিনটি তার থেকে মুক্ত নয়। এ সকল সমস্যা নিয়ে আমরা যখন গভীরভাবে চিন্তা করি, হঠাৎ যেন মনে হয় এর সমাধান নেই। পথের সন্ধান আমরা কোনদিনই পাব না।

বিগত কয়েক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রগতি আমাদের এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয় আমরা কতকালইনা হেলায় কাটিয়েছি। নিজেদের গোঁড়ামীর বদ্ধজালে আবদ্ধ রেখে একদিকে যেমন আমরা প্রগতিকে ব্যাহত করেছি, অন্যদিকে সমাজকে বঞ্চিত করেছি অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে দু'একটা শহরেই সীমাবদ্ধ রেখে আমরা যাদের আওতায় রেখেছিলাম তাঁরা হলেন ভাগ্যবান কিছু পরিবারের ছেলেমেয়ে।

সাম্প্রতিককালে এ গতিধারার আমূল পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্লোগান "২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য" এবং এ স্বাস্থ্য সকলের জন্য। এ লক্ষ্যে পৌছাতে হলে অংশীদারিত্ব নিতে হবে সকলের। সরকার এবং জনগণের। শুধু সরকারের উপর নির্ভরশীলতা জাতিকে পঙ্গু করে তোলে। জনগণের সীমাহীন প্রত্যাশা, সরকারের বলগাহীন প্রতিশ্রুতি আমাদের সীমাবদ্ধতায় জটিলতা সৃষ্টি করে। আইন ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। তা ঘটেছে বলে আমরা এখন

মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে। বিলম্বে হলেও দিকে দিকে এখন শুভ সূচনা দেখা দিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে এখন প্রয়াসী।

মাননীয়া প্রধান অতিথি,

এমন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উৎসাহিত হয়ে আপনি সানুগ্রহে আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটা আপনার জন্য যত সুখের আমাদের জন্য তার চেয়েও অধিক গৌরবের। স্বনির্ভর হবার উদাত্ত আহ্বানে আমরা সাড়া দিয়েছি।

আইএএইচএস জনগণের প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণে নিবেদিত। সরকারের আর্শিবাদ নিয়ে এর যাত্রা শুরু। আজ আমরা যেখানে অবস্থান করছি তা রেল কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে সরকারী অনুদান। পাশে যে টিনের শেড দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু। আমরা প্রমাণ করেছি বর্তমান সরকারের বেসরকারী উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ প্রদান কত যুক্তিসংসগত এবং কত ফলপ্রসূ হতে পারে।

মাননীয়া প্রধান অতিথি,

আপনার মাধ্যমে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাঁদের, যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের শুভ সূচনার সন্ধিক্ষণে সম্বলহীন দিনগুলিতে। টি. কে. অয়েল মিলসের কালাম সাহেব অপ্রত্যাশিতভাবে দশ লক্ষ টাকার একটা চেক হাতে তুলে দিয়ে আমার মনে যে উৎসাহ এবং সাহসের সঞ্চার করেছিলেন তার পরিণতি আজকের এ অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে সমাজদরদী আরও যাঁরা আমাদের অর্থ যুগিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, সৎ উপদেশ দিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন তাঁদের সকলের নাম এ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাঁরা সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের পুরোভাগে আছেন,

১। জনাব কবির আনোয়ার	দশ লক্ষ টাকা।
২। জনাব এম. এ. কালাম	দশ লক্ষ টকা
৩। আনোয়ার নূর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট	দশ লক্ষ টাকা।
৪। জনাব কবির আহমদ (দুবাই)	দশ লক্ষ টাকা।
৫। জনাব নাজিউর রহমান	পাঁচ লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের বিশেষ অবদানের কথা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করি। ১৯৮৮ সালে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে অর্থ

সাহায্য দেওয়ার পর কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে। পরবর্তীতে আরো কিছু সাহায্য আসায় বর্তমানে তাঁদের দানকৃত টাকার পরিমাণ বিশ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। আফ্রিকার বিশিষ্ট সমাজকর্মী আবদুল খালেক মিয়া এবং তাঁর স্ত্রী সাবেরার মাধ্যমে আমরা এই টাকা পাই। এই টাকা লিল্লাহ হিসাবে দেয়া হয়েছে বলে ইসলামিক রীতিনীতি অনুসারে পরিকল্পিতভাবে খরচ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এই টাকা অসহায় গরীবদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যয়িত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমান ভাইদের আমরা এই জন্য আমাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

উপদেশ-নির্দেশ, আলোচনা-সমালোচনায় যাঁরা কার্পণ্য করেনিনি তাঁদের পুরোভাগে আছেন গর্ভনিং বডি এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ। আজকের এই সুযোগে আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের প্রতি অভিনন্দন জানাই তাঁদের উদারতার জন্যে। সম্মিলিতভাবে তাঁদের অনুদান আমাদের আয়ের অন্যতম উৎস। এ পর্যন্ত যা সাড়া পেয়েছি তার প্রমাণ আমাদের আশেপাশে। স্বভাবতঃই আমরা উৎসাহিত।

. ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। প্রস্তর স্থাপনই প্রথম এবং শেষ পর্ব — এমন ঘটনা বিরল নয়। বিরাট জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানপর্ব শেষ করে পরবর্তীতে বিলুপ্তি কিংবা তিরোধান হয়েছে এমন ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ে। আজকে যে ভিত্তিপ্রস্তর আপনি স্থাপন করবেন তার ভিত্তি সুদৃঢ়। এটা নতুন পরিবারের ভবিষ্যতের কল্পনার দুলাল নয় বরং যোগসূত্রের এক বলিষ্ঠ সন্তান। আপনার সহমর্মিতা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে একে আপনার হাতে তুলে দিতে। এ নবজাতক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াবে, দিনে দিনে সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে আমাদের প্রাণ জুড়াবে। সেটা কোন কল্পনা নয়, বাস্তবে রূপ নিবে -- এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ তাকে এমন একজনের হাতে তুলে দিলাম যেখানে প্রাণের টান আছে। মাতৃত্বের গৌরব আছে। আছে ত্যাগের মহিমা।

মাননীয়া প্রধান অতিথি,

আপনার উপর এমন একটা গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে আমরা পিছপা হব না — এ আশ্বাস দিতে পারি। যে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তাকে সুসংহত করে আমরা এগিয়ে যাব।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথিদ্বয়ের কথা না বললে ন্যায়-নীতির মাপকাঠিতে অন্যায় করা হবে। আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের পেছনে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ছিল। তাতে শক্তি যুগিয়েছেন আমাদের কৃতিসন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা অলি আহমদ। সহজ সরল, আপাতঃদৃষ্টিতে

কর্কশ এ লোকটির পেছনে কত কোমলতা লুকায়িত আছে অনেকেরই হয়ত তা অজানা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে দেখবার, জানবার এবং বুঝবার সুযোগ আমার হয়েছে। মরহুম জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে তাঁকে যেমন ক্ষমতার পাশে দেখেছি, দারুণ বিপর্যয়ের দিনে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সর্বশক্তিমানের উপর নির্ভরশীলতা তাঁকে হতাশ হবার সুযোগ দেয়নি। তাঁর সফলতা এবং আপনার পাশে অবস্থান যে মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে সেটা হল — বিলম্বে হলেওসততা সফলতা আনে।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের প্রচেষ্টায় শরীক হতে, স্বাস্থ্য দপ্তরের বরাত দিয়ে নয়। তাঁর উপস্থিতি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যের কথা। ছাত্রজীবনে কলকাতা মেডিকেল কলেজে থাকা অবস্থায় অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের কর্মী হিসাবে তাঁর জন্মদাতা মোহন মিয়াকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। রাজনীতির উত্থান-পতন আছে সত্য, পূর্বসূরীর অবদান উত্তরসূরীর জন্যে কতটা সহায়ক, জনসংযোগ তাদের কতটা প্রাণবন্ত, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তারই উদাহরণ।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

আমার বর্ণনায় হয়ত কেউ কেউ অতিরঞ্জনের আভাস পাবেন, আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। আমার জীবনের এমন একটি দিনে নির্ভেজাল সত্যকে আমি গোপন রাখতে পারবনা। যে যাই বলুক।

বক্তব্য শেষ করার আগে আর একটা জ্বলন্ত সত্যকে সকল দায়িত্বশীল নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক দলের সামনে তুলে ধরতে চাই। সরকারের নিকট আমাদের প্রত্যাশা আছে, থাকবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে অবহেলা করে বলগাহীন প্রলোভনকে যদি প্রশ্রয় দিই নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি সজাগ না হই, সহমর্মিতা যদি আমাদের সহগামী না হয়, তাহলে সমস্যাই আমাদের সম্বল হয়ে দাঁড়াবে, সমাধান নয়। স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমাদের প্রয়োজন এবং চাহিদার সীমা নেই। সকলের জন্য স্বাস্থ্য আমাদের স্লোগান, আমাদের স্বপ্ন, সকলেরই কাম্য। যদি বলি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সদয় সরকার এর সুরাহা করবে তাহলে আমরা কল্পনার রাজ্যে বাস করব। সরকারের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান কোনদিনই সম্ভব নয়, হতেও পারে না। বস্তুতঃ সকল সমস্যা সমাধানে সরকার এবং জনগণ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে। উভয়েরই এখান দায়িত্ব। জনবহুল বাংলাদেশের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান সংকটময় অবস্থায় বেসরকারী উদ্যোগকে ভূমিকা পালন করতেই হবে।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,

আপনি জনগণের প্রতি বেসরকারী উদ্যোগে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি সময়োপযোগী। রাজধানী ঢাকা নগরী, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারী উদ্যোগের সফলতার নির্দশন রেখেছে। ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, রেড-ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ঐতিহাসিক ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট এবং সাম্প্রতিককালে বার্ডেম ঢাকায় এর স্বাক্ষর বহন করে। বন্দরনগরী চট্টগ্রাম শিশু হাসপাতাল, লায়ন্স হাসপাতাল, লায়ন্স চক্ষু হাসপাতাল এবং আমাদের পাশে সগর্বে দাড়িয়ে থাকা আই ইনফারমারী এমনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের দুটো চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি ঢাকায় আর একটি চট্টগ্রামে। স্বল্পকালের মধ্যে দুটোর অগ্রগতি জনগণকে উৎসাহিত করেছে। শুধু আর্থিক অনুদান নয়, তাদের সহযোগিতা আমাদের গতিপথে শক্তির সঞ্চার করেছে। আমাদের এই ইনস্টিটিউট বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। জনসাধারণ এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবৎসর আমরা ভর্তি করি পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী। বর্তমানে এদের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ। চাহিদা অনুসারে শিক্ষকের অভাব নেই বললেই চলে, তবুও সমঝোতার মাধ্যমে সরকারী মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের এখানে অংশগ্রহণ তাঁদের সময় এবং অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহারের সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা উভয়ে লাভবান হব। ছাত্র সমাজ এতে উপকৃত হবে। একাধিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার রেওয়াজ পশ্চিমা দেশগুলোতে বহুল প্রচলিত। আমাদের এখানেও তার প্রচলন শুধু সমঝোতার সৃষ্ট করবে না, শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। প্রশাসনিক পর্যায়ে স্বীকৃতি দিলে এই ব্যাপারে আরো উন্নতি হবে।

সরকারী শিক্ষকদের অংশগ্রহণ এভাবে যেমন বিশেষ কার্যকরী হবে তেমনি উপকৃত হবে কিছু কিছু সরকারী হাসপাতাল। এগুলো এখন নানা কারণে কিছুটা অবহেলিত। দক্ষ জনশক্তির অভাব এর অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের শিক্ষক আছে, ছাত্র আছে ; অন্যদিকে হাসপাতালের সীমাবদ্ধতা আছে। সেটা কাটিয়ে উঠা সময়ের ব্যাপার।

আমাদের ছাত্র-শিক্ষক জনশক্তিকে হাসপাতালগুলোতে প্রশিক্ষণ চালাবার সুযোগ দিলে বর্তমান অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। একদিকে যেমন চিকিৎসার মান বাড়বে অন্যদিকে শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হবে। রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করে এরা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই — পোর্ট হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল এবং শিশু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালকে একইভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

মাননীয়া প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদ্বয়,

এবার আপনাদের নিকট আবদারের সাথে কিছু আবেদন রাখবো। আইএএইচএস-এর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে শহরের নানা হাসপাতালে যাতায়াতের কথা আগেই বলেছি। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে সরেজমিনে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য গ্রাম, উপজেলা, এবং থানা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্বভাবতই যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন উঠে। দুটো মাইক্রোবাস আমাদের নিতান্তই প্রয়োজনীয় হলেও কিছুটা আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আমরা তা দিতে পারিনি। রিক্সশা, বেবী টেক্সির ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপদ এড়াতে পারে না বলেই আমাদের ভাবনা। বিষয়টি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবী রাখে।

কয়েক মাসের ব্যবধানে আমরা হাসপাতালের কাজ চালু করতে পারবো বলে আশা রাখি। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, আমাদের এই আশা নিতান্তই অমুলক নয়। এখানে সেবিকাদের বাসস্থান অপরিহার্য। ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায়ও আবাসস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। সেবিকাদের সঙ্গে ছাত্রীদের সহ-অবস্থান সৌহার্দ্যের সৃষ্টি করে। চিকিৎসক এবং সেবিকাদের কৃত্রিম ব্যবধান লোপ পায়। এই ধরনের ব্যবস্থা একই উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে নানা দেশে চালু হয়েছে। এই জন্য বিস্তৃত এলাকা জুড়ে দ্বিতল-বিশিষ্ট বহু বিলাসভবন আমরা চাই না, শুধু দু-চার বিঘা জমির উপর বহুতল বিশিষ্ট দুটো ভবন সেবিকা, ছাত্রী, মেট্রোন বিবাহিত আবাসিক চিকিৎসক, সার্বক্ষণিক চিকিৎসকমণ্ডলী এবং তত্ত্বাবধায়কের স্থান সংকুলান করবে। চাহিদার তালিকা সম্প্রসারিত করা সমাজ। সরকারের উপর এক ধাপে অনেক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া আমরা সংগত মনে করি না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হব না।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের শুধু প্রাণ সঞ্চার করেনি, আমাদের এগিয়ে চলার পথে বিরাট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। যাঁরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে আমাদের টিকে থাকার এবং এগিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছেন, তাঁদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরো অনেকে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

শুধু অর্থই একমাত্র শক্তির উৎস হতে পারে না। আমাদের সঠিক পথে চলার নির্দেশ আপনারাই দিতে পারেন। এটা পাবার দাবী আপনাদের সকলের উপর রইল। আপনাদের সোহাগ পেলে শাসনও আমরা মাথা পেতে নেব।

মাননীয়া প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আমার জীবনের দুটো ঐতিহাসিক ঘটনার অপূর্ব সংমিশ্রণের কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

১৯৭৮ সালে মরহুম জিয়াউর রহমান ঢাকা-টাংগাইলের টানাহেচড়ার যবনিকা টেনে আইপিজিএমআর-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আমার অনুরোধে ঢাকায়। আমি তখন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আয়োজনে সাহায্য করেছিলেন কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ এবং অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী।

আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে এসেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আমার প্রাণপ্রিয় এ দুটো প্রতিষ্ঠানে আপনাদের দুজনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপন যেন সৃষ্টিকর্তার করুণার বিশেষ ইঙ্গিত।

সাপ্তাহিক রোববার-এর মুখোমুখি

রোববার ঃ বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে আপনি দীর্ঘকাল জড়িত। বলতে গেলে আপনার চোখের সামনেই এ দেশের চিকিৎসা পেশা ও ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে। সুতরাং আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার ও পেশার সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ ও অভিমতের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই, আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পেশার মূল গলদ কোথায়?

নুরুল ইসলাম ঃ আজকের বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম প্রায় দুই যুগ আগে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিলো প্রায় অর্ধ শতাব্দীর আগে। বৃটিশ শাসনামলে এই ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ছিলো নগণ্য. পাকিস্তান আমলে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা দেয়। ক্রমে-ক্রমে ৭টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এই সময়ে। বর্তমানে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা সরকারী পর্যায়ে ৮টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৩টি। এ ছাড়া পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট, বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট, চক্ষু ইনস্টিটিউট ইত্যাদি বিভিন্ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। স্বাস্থ্যখাতে যা খরচ হয় তার সিংহভাগ শহর-কেন্দ্রিক। বস্তুত, শহরকেন্দ্রিক বললেও ভুল হবে। রাজধানীর আশেপাশেই যেন সকল সুযোগ-সুবিধা সীমাবদ্ধ। ৩টি মেডিকেল কলেজ বাদ দিলেও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বিশেষ চিকিৎসার সবক'টি ইনস্টিটিউট রাজধানী ঢাকায়। প্রতিটি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং চিকিৎসক এসব কিছুর পেছনে যা খরচ হয় তাতে বাজেটের মোটা অংশ চলে যায়। বড়-বড় হাসপাতালের কিছু সংখ্যক পেয়িং বেড এবং কেবিন ছাড়া হাসপাতালের সবক'টি বেড বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবার উদ্দেশ্যে। 'বিনামূল্যে' কথাটি কতোটুকু প্রযোজ্য তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সিরিঞ্জ থেকে সেলাইর উপকরণ এবং প্রায় সব ওষুধ কিনতে হয় রোগীকে। অন্যদিকে বিশেষ করে কেবিনে ভর্তি হয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা। আদর-যত্ন, বিনামূল্যে ওষুধ সব তাদেরই জন্য।

সদর হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বাড়িয়ে আমরা আধুনিক শব্দটি সংযোজন করি। অথচ আধুনিক সুযোগ–সুবিধা এখানে নেই বললে চলে। উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক নিয়োজিত আছে হাতে–কলমে, কর্মক্ষেত্রে নয়। পরবর্তী কোনো এক প্রশ্নের উত্তর হিসেবে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মোটকথা, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শহরকেন্দ্রিক, রাজধানীভিত্তিক বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা শুধু প্রভাবশালী ও ভাগ্যবান লোকের জন্য। অন্যদিকে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যেখানে চিকিৎসার মান কিছুটা উঁচু, তা বিত্তহীনদের নাগালের বাইরে। সুযোগ--সুবিধা এবং অর্থের অসম বণ্টনে চিকিৎসা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি দুঃখজনক। নামসর্বস্ব ইনস্টিটিউট আমাদের বেশ কয়েকটি আছে। একটুখানি তলিয়ে দেখলে দেখা যায় এগুলো অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য। পুরনো এবং বহুলাংশে অকেজো যন্ত্রপাতি এখনও জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। অনেক ল্যাবরেটরীতে এখনও অতি প্রয়োজনীয় অনেক পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালানো সম্ভব হয় না। বহু সরকারী প্রতিষ্ঠান বেশ কয়েকটি পরীক্ষা–নীরিক্ষার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী থাকলেও বইপত্র, সাময়িকী শুধু অপ্রতুল নয়, বহুদিনের পুরনোও।

চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষা কার্যক্রম পরিবর্তনের সঙ্গে–সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়া উচিত ছিলো। বৃটিশ আমলের 'লাইসেনসিয়েট কোর্স' তুলে দিয়ে আমরা কি ভুল করেছি এখন তার প্রমাণ মিলে। গ্রামে–গঞ্জে চিকিৎসার জন্য এই ধরনের চিকিৎসকের প্রয়োজন এখন আমরা উপলব্ধি করি। সহকারী চিকিৎসকের (প্যারামেডিক্স)–এর প্রয়োজনীয়তা এখন শুধু উন্নয়নশীল দেশে নয়, উন্নত দেশেও স্বীকৃত। অনেক দেরিতে হলেও তাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষাক্রম চালু করেছি। এইদিক দিয়ে আমরা সমকালীন চিকিৎসা পেশায় ইমামদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটা জনগোষ্ঠী সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছি। এর সূচনা ইসলামিক মেডিকেল মিশন থেকে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জলের মতো মসজিদের বিস্তৃতি এবং নানা সামাজিক কাজে এর ব্যবহারে ইমামদের অংশগ্রহণ শুধু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই নয়, সমাজের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিপুল সহায়ক।

চিকিৎসা শিক্ষায় গ্রাম পর্যায়ে হাতে–কলমে শিক্ষা ব্যবস্থা (গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা) বহু যুগ ধরে অবহেলিত ছিলো। ফলে চিকিৎসকরা ছিলো গ্রামবিমুখ এবং তারা ছিলো গ্রামের সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞ। বিগত এক যুগেরও অধিক ধরে পৃথিবীর নানা দেশে শিক্ষার্থীদের গ্রামীণ পরিবেশে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার প্রবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষাকালে নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। ফলে ভবিষ্যতের ডাক্তার হিসেবে গ্রাম এবং গ্রামীণ সমস্যা তাদের অজানা থাকে না। সমাধানও তারা খুঁজে পায়। পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন–পরিবর্ধন এবং গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে একটি শুভ সূচনা। সততার সঙ্গে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে আমরা শুধু উপযুক্ত চিকিসৎক তৈরি করবো না, গ্রামের বর্তমান নাজুক শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নতমানের হবে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবো।

রোববার ঃ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করানোর প্রবণতা বেড়েছে। বিদেশী ডাক্তার, বিদেশী হাসপাতাল, বিদেশী নার্স ইত্যাদির প্রশংসা এবং আমাদের এখানকার সবকিছুর প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। এ–ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

নুরুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ সীমিত। রোগ ও রোগীর সংখ্যা এখানে সীমাহীন। হাসপাতালে আমরা প্রায় করুণ চিত্র দেখতে পাই। অসংখ্য রোগীর মাঝখানে সীমিত সংখ্যক চিকিৎসক, অতি সীমিত সেবিকাবৃন্দ এবং চিকিৎসার নানা সুযোগ–সুবিধা। এখানে ডাক্তার থাকলেও ওষুধের অভাব, সেবিকা থাকলেও সেবা পাওয়া মুশকিল। প্রতিটি সেবিকাকে দেখতে হয় ৩০–৫০ জন রোগী। আমরা ভুলে যাই তার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। অথচ অভিযোগ করি তার কাজের অবহেলা নিয়ে।

বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত পাশাপাশি উঁচুমানের এক নার্সিংহোমের দিকে তাকালে তারতম্য বুঝা যাবে। এখানে রোগীর সংখ্যা সীমিত, ডাক্তার এবং নার্সের অভাব নেই। নানা মানের বিছানা, কেবিন, ফ্যামিলি কেবিন, ভিআইপি কেবিন ইত্যাদি সবকিছুই আছে। আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী পছন্দমতো বেছে নিতে পারেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনে টেলিভিশন, টেলিফোন, বিশেষ

নার্স, এটেনডেন্ট সবই পাবেন। এ সকল সুব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস। এবং তা থেকে খরচ করে আয়ের অংক উদ্ধৃত্ত থাকে বলেই বেসরকারী পর্যায়ের নার্সিংহোমের সংখ্যা উত্তরাত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা শিল্প হিসেবে।

সব নার্সিংহোমের মান সমান নয়। নিম্নমানের নার্সিংহোমকে কেউ কেউ আয়ের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে জনগণকে প্রতারিত করে। তাদের আমি সমর্থন করতে পারি না। বরং উপযুক্ত শাস্তির জন্য সুপারিশ করি। উন্নতমানের নার্সিং হোম প্রতিযোগিতামূলকভাবে বেড়ে উঠুক সেটা আমি মনে-প্রাণে চাই। কেউ কেউ বলতে পারেন এতে শ্রেণী-বৈষম্য প্রকাশ পায়। এগুলো বৈষম্য সৃষ্টির হাতিয়ার। আমি কিছুতেই একমত হতে পারি না। বৈষম্য থাকবেই। তবে তার মানে এই নয় যে, ভাগ্যবান কিছু লোকের সুযোগ-যুবিধা বিত্তহীনদের ন্যূনতম চাহিদার বিনিময়ে, চিকিৎসার সুযোগ সকলেরই প্রাপ্য, আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। ব্যয় যেহেতু আয়ের উপর নির্ভরশীল, অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যয়ের সামর্থ্য থাকতে হবে। এই ব্যবস্থা চালু আছে বলেই অন্তত কিছু সংখ্যক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (নার্সিংহোম) সরকারী হাসপাতাল থেকে উন্নতমানের চিক্যিসা ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে।

বর্তমান ব্যবস্থায় হাসপাতালের ৮০% শয্যা বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত। এখানে শুধু থাকা খাওয়া নয়, ওষুধপত্র সবকিছুই বিনামূল্যে দেবার কথা। আসলে তার কিছুই হয় না, শুধু বিছানা এবং খাবারটা পাওয়া ছাড়া বাকি সব রোগীর ঘাড়ে। একই হাসপাতালে পেয়িং বেড, কেবিন আছে। কিছু সংখ্যক ভিআইপি কেবিনও রয়েছে। এগুলোর জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার্য থাকলেও তা অতি সামান্য। সরকারী কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী নেতা -- এদের সকলের জন্য আবার এগুলোর সব 'বিনামূল্যে', যেন তেলে মাথায় তেল দেয়া।

দাবী তুলতে পারেন — হাসপাতালের বাজেট বাড়ান, উন্নতমানের চিকিৎসা দিন, সুযোগ-সুবিধা বাড়ান। বিদেশে কি চমৎকার চিকিৎসা এবং সেবার ব্যবস্থা। চিকিৎসক আর সেবিকাদের ব্যবহার। স্বীকার করি, চিক্যিসকের সুব্যবস্থা, কেবিনের চাকচিক্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

কক্ষ, মন জয়কারী চিকিৎসক ও সেবিকা সব এখানে আছে। কিন্তু কেন? কিসের বিনিময়ে? একটিবার খরচের খাতা খুলে দেখুন, আমাদের হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমের সঙ্গে তুলনা করুন। নিশ্চয়ই ভুল ভাঙবে। যে মহাসত্যটি প্রকাশ পাবে তা হলো সবচে' মহা পরাক্রমশালী 'টাকা'। রাস্তার পাশের ছোট হোটেল আর ব্যয়বহুল পাঁচতারা হোটেল সোনারগাঁ দুটোই হোটেল নামে পরিচিত। থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা দু'টোতেই আছে। সুযোগ-সুবিধার ব্যবধান এখানে সাগর পরিমাণ। ব্যয়ের দিকে তাকান। সোনারগাঁ মানেই সাগর পরিমাণ অর্থ। তাই যদি হয় এবং এই ব্যবস্থাকে যখন আমরা স্বীকার করে নেই, তাহলে মানতে হবে বৈষম্য থাকবেই। সুযোগ-সুবিধার ব্যবধানও থাকবে। তবে তাই বলে একদিকে বিলাসবহুল বিরাট অট্টালিকা, অন্যদিকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে অগণিত অসহায় মানবসন্তান। এই ব্যবধান সমর্থনযোগ্য নয়। মূল কথায় ফিরে আসি। হাসপাতালের বর্তমান ব্যবস্থাকে অব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়ে এর সুরাহা করতে হবে। সরকারের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিজস্ব আয়ের উৎস খুঁজে বের করতে হবে। বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে এখানকার সবকিছু বিনামূল্যে দিতে হবে। শুধু খাবার এবং বিছানা নয়। আবার বলি — সবকিছুই। অন্যদিকে পেয়িং বেড এবং কেবিনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে আয় বাড়াতে হবে। বিভিন্ন মানের কেবিন থেকে সুযোগ-সুবিধা মাফিক টাকা আদায় করতে হবে। এমনকি চিকিৎসক এবং সেবিকাদের জন্য একটা অংশ নির্ধারিত থাকবে এবং তা হবে নির্ধারিত বেতন কাঠামোর অতিরিক্ত। সকলেই পরিতৃপ্ত থাকবে। মনে-প্রাণে রোগীর সেবায় এগিয়ে আসবে। যেমন আসে বাইরের দেশগুলোতে, এমনকি নিকটবর্তী দেশ সাম্প্রতিককালের আকর্ষণ সিঙ্গাপুর ও ব্যাংকক এবং পশ্চিমের দেশ ইংল্যান্ড ও আমেরিকা।

হাসপাতালকে আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার রাজস্বখাতে অর্থ বৃদ্ধির জন্য নয়, এখানকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হবে। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। এতে চিকিৎসার মান বাড়বে। পেশাকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।

বাংলাদেশে দক্ষ চিকিৎসক ও নিবেদিতপ্রাণ সেবিকার অভাব নেই। সীমিত সুযোগ এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়। এর প্রমাণ মিলে আমাদের ডাক্তার এবং সেবিকা বিদেশে যখন সুযোগ-সুবিধা পায়, যখন সুনাম অর্জন করে তখন। যাদের সুনাম বিদেশে এতো বেশি, দেশে কদর নেই বলে আপাতদৃষ্টিতে আমরা তাদের অবমূল্যায়ন করি। বিত্তবানদের কাছে অনুরোধ, আপনাদের অর্জিত অর্থ স্বদেশের বিত্তহীনদের জন্য যদি নাও হয়, এ অর্থ বিদেশে বিসর্জনের জন্য নয়, স্বদেশের সৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত। সরকারের প্রতি অনুরোধ, গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কালোপযোগী করে তুলুন, দলমত নির্বিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে একটা অর্থবহ নীতিমালা প্রণয়ন করুন। অতীতের সব কিছুই ভুল — এই ধারণা পরিহার করে যা গ্রহণযোগ্য বাস্তবতার ভিত্তিতে তা গ্রহণ করুণ। এ ব্যবস্থা সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

রোববার ঃ আমাদের এখানকার ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

নুরুল ইসলাম ঃ এ ব্যবস্থা এখনও ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রতিটি ওষুধ শিল্পের সঙ্গে মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। সে হিসেবে উন্নতমানের বড় বড় কোম্পানীগুলোর ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকাটাই স্বাভাবিক। কোনো-কোনো কোম্পানীর তা থাকলেও সকল কোম্পানীর নেই। মাঝারী এবং ছোট কোম্পানীগুলো তাদের ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হলেও মান নিয়ন্ত্রণে সকলে সমানভাবে সচেষ্ট নয়। কিছু কিছু কোম্পানী আছে যারা মান নিয়ন্ত্রণে মোটেও আগ্রহী নয়। সব কিছুর গলদ এক জায়গায় — নিয়ন্ত্রণের অভাব। তাই অনেক কোম্পানী চলে নিয়ন্ত্রণমুক্ত লাগামহীনভাবে। যেটা প্রয়োজন, এমনকি বলতে গেলে অপরিহার্য, সেটা হলো উন্নতমানের স্বয়ংসম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী। শুধু সাজ-সরঞ্জাম নয়, পর্যাপ্ত ও উপযোগী জনবল এখানে অপরিহার্য। পরীক্ষাগারে সৎ, নিষ্ঠাবান এবং দক্ষ কর্মী থাকলে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ কেনা-বেচার সামগ্রীতে পরিণত হবে না। শুধু মানের দিক দিয়ে নয়, চাহিদা অনুসারেও এই ল্যাবরেটরীর বিস্তৃতি ঘটেনি। বেশ কিছু প্রশাসক তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিগত বছরগুলোতে এখানে নিযুক্ত হয়েছেন। ফলে ধাপে-ধাপে

প্রতিষ্ঠানটির প্রগতি ব্যাহত হয়েছে। ল্যাবরেটরী ছাড়াও চাহিদা অনুযায়ী মান নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্য অংশ হিশেবে ড্রাগ প্রশাসনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী না থাকায় বাজারজাত মালের পরিদর্শন-এর ফলে মান নির্ধারণ সম্ভব হয় না। এখানে আমাদের অনেক ব্যর্থতা। ড্রাগ প্রশাসনের কর্মীর সংখ্যা আর তাদের দায়িত্ব সারা দেশব্যাপী। ফলে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ এখনও নির্ভর করে প্রতিটি কোম্পানীর সদিচ্ছা এবং ব্যবস্থার উপর। এমন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশে তৈরি অধিকাংশ ওষুধ দেখা গেছে মানের দিক থেকে মোটামুটি বিদেশী ওষুধের মতোই। তবুও নিম্নমানের ওষুধ সম্পর্কে আমাদের অমনোযোগিতা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হ'তে পারে।

রোববার ঃ আমাদের দেশে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে যেসব প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল, প্যাথলজিকেল ল্যাবরেটরী ইত্যাদি গড়ে উঠেছে সেগুলোর মান সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারের কি কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

নুরুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশে ক্লিনিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অতি উঁচুমানের ক্লিনিক এখানে নেই বললেই চলে। নিচু মানের ক্লিনিকের সংখ্যা অহরহ বাড়তির দিকে। চিকিৎসা পেশা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে পরিণত। এখানে চিকিৎসা যেন গৌণ, ব্যবসাই মুখ্য। ব্যতিক্রম হয়তো থাকতে পারে। প্রশ্ন তুলেছেন ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণে যেমন সরকারের দায়িত্ব রয়েছে, ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নীতিমালা রয়েছে। তবে প্রয়োগের অভাবে এর অস্তিত্ব অনেকেরই জানা নেই। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রশাসনের। আমরা জনস্বাস্থ্যের কথা বলি, উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলি, দু'হাজার সালে সবার জন্য স্বাস্থ্যের কথা বলি অথচ উন্নতমানের কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলি না। আমি মনে করি দিন-দিন যেভাবে ক্লিনিক ব্যবসা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে এর উপর যদি নজর দেয়া না হয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্ভোগ নেমে আসতে বাধ্য। উপযুক্ত পরিদর্শক টীম গঠন করে প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে মান যাচাই করে লাইসেন্স প্রদান এবং বাতিলের ব্যবস্থা না করলে একদিকে চিকিৎসা যেমন সুষ্ঠু ব্যবসায়ে পরিণত হবে, নৈতিকতার দিক দিয়ে পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, অন্যদিকে বিপন্ন হবে জনজীবন। এমন একটা করুণ পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না হয়, সে বিষয়ে

আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। সরকারী চিকিৎসকদের অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেসরকারী ক্লিনিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সরকারী হাসপাতাল-গুলোর চিকিৎসার মান এবং তৎসঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার মান কোন গতিতে সেটা গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সময় অনেক আগেই বয়ে গেছে। এখন আর বসে থাকলে চলবে না। প্যাথলজি ল্যাবরেটরীর সংখ্যা একমাত্র ঢাকা শহরে কতো আছে এবং প্রতি সপ্তাহে কতোগুলো নতুন হচ্ছে তার হিশেব কেউ দিতে পারবে বলে মনে হয় না। ক্লিনিকের মতো মানের দিক দিয়ে এরাও স্বাধীনতা ভোগ করে। ভুল রিপোর্ট ভুল চিকিৎসকের জন্ম দেয় এবং ভুল চিকিৎসা মর্মান্তিক পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। চিকিৎসকরা এখানে বিপাকে পড়ে আর রোগীরা হয় বিপদের সম্মুখীন। একটি সাধারণ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কোনো টাইফয়েড রোগীর প্যাথলজিকেল টেস্টে যদি ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়, তাহলে তার যে রোগের অস্তিত্ব নেই সে রোগের চিকিৎসা হবে। অর্থাৎ যে রোগে সে ভুগছে সে রোগের চিকিৎসা হবে না। এই ধরনের রোগীর চিকিৎসা যদি না হয়, তাহলে পরিণতি বিপজ্জনক হতে পারে। ভোগান্তির কথা বাদই দিলাম। অন্যদিকে কোনো সহজ রোগের ভুল চিকিৎসা হলে অর্থের অপচয়, সময় নষ্ট ইত্যাদি নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। নিঃসন্দেহে ল্যাবরেটরীর প্রয়োজন রয়েছে। তবে এর মান একটা মাপকাঠির ভেতরেই থাকতে হবে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ, দু'একটা মাইক্রোস্কোপ এবং কয়েকজন লোক বসিয়ে দিয়ে ল্যাবরেটরী চালানোর প্রবণতা যদি রোধ করা না হয়, রোগ নির্ণয়ে যেমন সমস্যা দেখা দেয়, চিকিৎসকরা তেমন ভুল পথে পরিচালিত হয়, রোগীরা শুধু আর্থিক অপচয়ের সম্মুখীন হয় না, তাদের জীবনের ঝুঁকিও নিতে হয়।

ওষুধের ক্ষেত্রে যেমন মান নির্ণয় অপরিহার্য, ল্যাবরেটরীর ক্ষেত্রেও তাই। এর অন্য কোনো উদ্যোগ এ পর্যন্ত নেয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। গোটা ব্যাপারটাই দুঃখজনক।

যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল রোগ নিরাময়ের অপরিহার্য অঙ্গ এবং চিকিৎসার দিক নির্ণয় করে তা বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে — এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে রাতারাতি যেসব ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে

তা নির্মূল করতে হবে। একদল বিশেষজ্ঞ দিয়ে সরেজমিনে তা তদন্ত করতে হবে। নিম্নমানের এবং ক্রটিপূর্ণ ল্যাবরেটরীর জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান করে সেসব বিলুপ্ত করতে হবে। এতে কোনো আপোষের অবকাশ নেই।

রোববার : আমাদের দেশে চিকিৎসকদের মধ্যে সেবাধর্মী মন-মানসিকতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই অভিযোগ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

নুরুল ইসলাম : চিকিৎসকদের মধ্যে সেবাধর্মী মন-মানসিকতা সকলের সমান নয়, হতেও পারে না। তবে মনে হয় যতো বেশি চিকিৎসক এ মন-মানসিকতার অধিকারী ততোই মঙ্গল, এ পেশার পক্ষে গৌরবের। আমার মতে চিকিৎসা পেশা শুধু একটা পেশা নয়, এটা একটা সামাজিক এবং নৈতিক অঙ্গীকার। একটা ট্যাবলেট কিংবা একটা ইনজেকশন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে-একথা সত্য। রুগ্ন মন হতাশা-নিরাশা রোগ নিরাময়ে বাধার সৃষ্টি করে — এ কথাও সত্য। বস্তুত ওষুধ এবং সমমর্মিতা নিয়ে আশার বাণী রোগীর দেহ-মনকে সতেজ করে, রোগ-নিরাময় ত্বরান্বিত করে। এ কারণেই দেখা যায় একই ওষুধ দিলে রোগ নিরাময়ের ফলাফলে তারতম্য দেখা যায়। কেবলমাত্র সেবার মনোভাব থাকলে অতি সহজে এসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়া যায়। শুধু অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা হতে পারে না। অর্থলোভী চিকিৎসকের অস্তিত্ব নেই — এমন ধারণা ভুল। ভাবনাটাও অসম্ভব। তবে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেশার মানের দিক দিয়ে নিম্নগতি নির্দেশ করে। সাম্প্রতিককালে এ গতি যেন দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আমি মনে করি এর যাত্রা শুধু পরিবার থেকে, পরে স্কুল, উচ্চতর শিক্ষাঙ্গন এবং শেষ পর্যায়ে পেশাজীবন প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শের অভাব ভিন্ন স্রোতের প্রবণতা। শুধু চিকিৎসা পেশায় নয় সকল পেশার নৈতিকতার মান যেন নিম্নদিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য জাতি হিসেবে আমাদের সকলকে দায়-দায়িত্ব নিতে হবে, বিশেষ কোনো পেশার উপর বোঝা চাপালে সঠিক হবে না।

রোববার : অন্যান্য দেশে রোগীদের কাছ থেকে পেশাগত সেবাদানের জন্য ডাক্তাররা যে অর্থ গ্রহণ করে তার রসিদ দেয়া হয়। এখানে সে ব্যবস্থা না থাকার কারণ কি?

নুরুল ইসলাম ঃ পেশাগত সেবাদানের অর্থ গ্রহণ করে রসিদ দিতে হবে কি হবে না এর কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই, থাকার প্রয়োজনও বোধ করি না। আর থাকলেও বা কী? তবে শুধু চিকিৎসা নয়, অর্থের লেনদেনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে রসিদ পাওয়া দাতার অধিকার। সেই হিশেবে প্রতিটি রোগীও চিকিৎসকের নিকট থেকে ফি বাবদ রশীদ পাওয়ার অধিকার রাখে। চাইলেও দিতে হবে এমন নিয়ম থাকা ভালো। সকলকে দিতে হবে এই নিয়ম চালু করা সহজ, তবে কার্যকর হবে না নানা কারণে। করের বোঝা এবং সময়ের অভাব এর অন্যতম।

রোববার ঃ আমাদের দেশের নামী–দামী ডাক্তাররা গড়ে অর্ধশতাধিক রোগী দেখে থাকেন। আপনি কি মনে করেন এতো রোগী দেখা বাঞ্ছনীয়?

নুরুল ইসলাম ঃ প্রত্যেকের কাজ করার ক্ষমতার একটা সীমা অছে। এ সীমা ছাড়িয়ে গেলে দক্ষতা এবং পারদর্শিতা ব্যাহত হতে বাধ্য। চিকিৎসা পেশায় গভীর মনোযোগ যেমন অপরিহার্য, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে রোগীর মন জয় করা এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস সৃষ্টি করা তেমনি অপরিহার্য। এ সকল শর্ত পূরণ করে পেশাজীবনে সফলতা লাভ করতে হলে যে সময়ের প্রয়োজন অর্ধশতাধিক কিংবা তুলনীয় সংখ্যায় রোগী দেখা হলে তা পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে রোগনির্ণয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেড়ে যায়, রোগ নিরাময়ে সফলতা থেকে বিফলতা যেন বেশি, কোনো কোনো সময় বিপর্যয়ও আসতে পারে। জবাবদিহি করতে হয় না বলে অবহেলা করেও অনেকে রেহাই পায়। মর্মান্তিক পরিণতির পরেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বলতে চাই — একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমিত সংখ্যক রোগী না দেখে যতো আসে ততোই ভালো এ নীতি অনুসরণ করলে টাকার অংক বাড়বে, তবে একদনি না একদিন বেশি রোগী দেখার ভুল ঢাকা থাকবে না, ধরা পড়বে।

রোববার ঃ বাংলাদেশের সমকালীন মেডিকেল শিক্ষার মান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

নুরুল ইসলাম ঃ সার্বিকভাবে বাংলাদেশের শিক্ষার মান এখন নিম্নাভিমুখী। চিকিৎসা শিক্ষা এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ এখানে একাধিক শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ সকলকেই এর দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। উপযুক্ত সুযোগ–সুবিধার অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব উপযুক্ত ছাত্র

তৈরির ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ–সুবিধার অভাব চিকিৎসা পেশায় এক বিরাট প্রতিবন্ধক। রোগ ও রোগীর সংখ্যা আমাদের অগণিত। রোগ নির্ণয়ের সাজ–সরঞ্জাম, ল্যাবরেটরী কিংবা পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র নানা প্রশাসনিক এবং আর্থিক কারণে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ফলে শিক্ষাকালে একজন ছাত্র যেসব সুযোগ–সুবিধা ব্যবহার হাতে–কলমে শেখার তো সুযোগই পায় না, দেখার ভাগ্যও তাদের হয় না। পরবর্তীকালে এবং বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটে। বিফলতা অনেকের উৎসাহ নষ্ট করে। আমাদের দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক দুঃখজনক পরিস্থিতি কাজ করে। এর অশুভ প্রতিফলন দক্ষ চিকিৎসক এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

শিক্ষক তৈরীর ক্ষেত্রে যেমন সুযোগ–সুবিধার অভাবে গুণগত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুযোগ–সুবিধার অভাবে তেমনি ছাত্রদের উপযুক্ত জ্ঞান লাভে বিঘ্ন ঘটে। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মান হয় নিচু। মানোন্নয়নের আর একটা অপরিহার্য শর্ত হলো চিকিৎসা শিক্ষায় ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যেখানে সীমিত শিক্ষকদের উৎসাহ সেখানে ব্যাহত হ'তে বাধ্য। অন্যদিকে শিক্ষক নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উপর প্রণীত নয়। নীতিমালা যা আছে তা অনুসরণ করা হয় না। ফলে গুণগতমানের বিরাট তারতম্য ঘটে।

রোববার : বাংলাদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা রোগীকে দেয়ার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?

নুরুল ইসলাম : বর্তমানে ৮টি মেডিকেল কলেজ থেকে বছরে ১৩০০–১৪০০ ডাক্তার তৈরি হয়। এগারো কোটি লোকের জন্য এদেশের চিকিৎসকের সংখ্যা ষোল হাজার–এর কাছাকাছি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০–৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে। এদিকে শতকরা ৮০–৯০ জন ডাক্তার শহরবাসী। উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসকের নিযুক্তি আছে কাগজে–কলমে। কাজে–কর্মে এর বিস্তর ফারাক। সুযোগ–সুবিধার অভাব, পরিবেশ ও প্রশাসনিক দুর্বলতা, গ্রামের প্রতি অনীহা কয়েকটি বিশেষ কারণ। উপজেলা (বর্তমানে থানা) পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যকরী হলেও চিকিৎসা ব্যবস্থা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হবে না। বিপুল জনসংখ্যা, যোগাযোগের জটিলতা, বহু এলাকার অবস্থান ইত্যাদি কারণে চিকিৎসা ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে

যদি সম্ভব না হয়, অনেকে এর থেকে বঞ্চিত হ'তে বাধ্য। এ সমস্ত কারণে পল্লী চিকিৎসায় শুধু শিক্ষিত পাস করা চিকিৎসককে দায়িত্ব দিলে চলবে না। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জনগণের কাছে অধিকতর হারে পৌঁছানো সম্ভব। ইসলামী মেডিকেল মিশনের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে পল্লী চিকিৎসক, ইমাম, ধর্মীয় নেতা এবং স্কুল শিক্ষকদের অংশগ্রহণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি ব্যাপকতর হারে ব্যবহৃত হলে এ সকল কর্মী নিজ-নিজ কর্মস্থল থেকে অনেককেই প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ দিতে সক্ষম হবে।

স্বল্প খরচায় ন্যূনতম স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো দেশের সর্বত্র ইমামদের এ কাজে লাগানো। তাদেরকে কাজে লাগানো শুধু সমীচীন নয়, একান্ত অপরিহার্য।

রোববার ঃ দীর্ঘকাল চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে আপনি বিচিত্র ধরনের রোগীর চিকিৎসা করেছেন। এক্ষেত্রে আপনি মনে রাখার মতো কোনো অভিজ্ঞতার সুযোগ পেয়েছেন?

নুরুল ইসলাম ঃ বিলাতে ডিগ্রী লাভের পর ফিরে এসে যে বিশেষ রোগীর চিকিৎসার সুযোগ হয়, সেটা ছিলো নব বিবাহিতা একটি মেয়ে। বিয়ের এক মাস পর তার বাম হাত অবশ হয়ে যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কিছুই ধরতে পারি না। নানা রোগের কথা ভাবি। কয়েকদিন পর মনস্থ করি তার রোগের ইতিহাস জানার। একদিন সকালবেলা রোগীর পাশে গিয়ে বসলাম। বিবাহের আগে থেকে শুরু করে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত সব বিনাদ্বিধায় বলতে বললাম। আশ্বাস দিলাম, গোপনীয় বিষয় গোপনীয়ই থাকবে। তার বর্ণনাকালে মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন করে পুরো বৃত্তান্ত জানতে পারলাম। সে ছিলো বাড়ির গরীব ঘরের এক আদুরে মেয়ে। বিয়ের পর এমন জায়গায় তার বসতি যে বাড়ির পাশে পুকুর নেই। পানি আনতে হয় কলসীতে করে প্রায় আধ মাইল দূর থেকে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে এ দায়িত্ব তার ওপর পড়ে। ১০/১৫ দিন এমনিভাবে পানি নিয়ে আসার পর হঠাৎ তার বাম হাত অবশ হয়ে যায়। এমনিভাবেই রোগের সূচনা। কাহিনী শুনে পুরো ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে জানা হয়ে গেলো। তার অসুখটা পুরোপুরি মানসিক। প্রতিদিন কলসী করে পানি আনার কষ্ট সহ্য

করতে না পেরে সে মনে মনে চেয়েছিলো যদি তার হাতখানা অবশ হয়ে যায় তাহলে হয়তো সে এমন একটা যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। অর্থাৎ তার অসুখটা ছিলো এক ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া (হিসটেরিয়া)। নির্দেশ দিলাম তার স্বামী এবং শাশুড়ী যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। দু'দিন পর এদেরকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম এবং মেয়েটিকে অভয় দিয়ে বললাম, সুস্থ হয়ে গেলে আগের মতো তাকে আর পানি আনতে হবেনা। আমাদের উৎসাহে এবং স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতিশ্রুতির ফলে কিছুদিনের মধ্যে সে সুস্থ হয়ে উঠলো। আমিও শিক্ষা পেলাম রোগ নির্ণয়কালীন সময়ে সময় দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে রোগের পুরোপুরি ইতিহাস জানা কতোনা গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য এক রোগীর কাহিনী। ৮–১০ বছরের ছেলে। যতোদূর মনে পড়ে বাপ পুলিশের চাকরি করে। কয়েক মাস থেকে ছেলের পায়খানা হয় না। স্বভাবতই বাবা–মা ভীষণ চিন্তিত। ঢাকার বড় ডাক্তার ছাড়া হয়তো এমন কঠিন রোগের চিকিৎসা কেউ করতে পারবেন না। তাই তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো। সার্জারীর একজন অধ্যাপক দেখলেন, তারপর মেডিসিনের। পরীক্ষা–নিরীক্ষা অনেক হলো। এক্স–রে, রক্ত, পেশাব ইত্যাদি। কোনো কিছুতেই দোষ পাওয়া গেলো না। একটি ইংরেজি সাময়িকীতেও বেরুলো খবর — 'প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল'। 'কয়েকমাস ধরে পায়খানা হয় না, অথচ ছেলেটি সুস্থ আছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পত্রিকায় দেয়া ছেলের বাপের ঠিকানায় চিঠি আসলো। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ছেলের পরীক্ষা–নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে বিনামূল্যে। তবে যাওয়া–আসার খরচ বহন করতে হবে নিজেদের। এ টাকা যোগাড় করা ছেলের অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই দেশেই চেষ্টা করতে হবে এই ভেবে একদিন আমারই এক ছাত্র ছেলেটাকে নিয়ে আমার চেম্বারে এসে হাজির হলো। ইতিমধ্যে ৫/৬ মাস অতিক্রম হয়েছে। দেশ–বিদেশে ছেলের নাম জাহির হয়েছে, দেখতে–শুনতে ছেলে সুস্থ, খাওয়া–দাওয়া নিয়মিত করে, কোনো অসুবিধে নেই। প্রস্রাবও ঠিকামতো হয় কিন্তু পায়খানা হয় না। ভাবনায় পড়ে গেলাম। অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি পেয়ে ইতিমধ্যে আমি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে যোগদান করেছি। কয়েক মাসের

মধ্যে আবার অনুরোধ আসলো ছেলেটিকে একটু ভালো করে দেখতো হবে। ইতিমধ্যে এখানে-সেখানে নানাজনকে দেখানো হয়েছে। ছেলেটাকে বার বার জিজ্ঞেস করলাম পায়খানার কোনো বেগ হয় কিনা। ছেলেটা দেখতে নির্বিকার, তার কোনো কষ্ট নেই, ভাবনা শুধু তার বাবা-মার। একদিন সকালে তাকে নিয়ে আসা হলো হাসপাতালে। ছাত্র-ছাত্রীদের রোগী দেখা এবং শেখানোর মাঝখানে ছেলেটাকে দেখলাম। বেলা ৯টা-১০টা হবে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় আসে। সহকারী ডাক্তারকে গোপনে নির্দেশ দিলাম ছেলেটাকে দেড় আউন্স এস. এস ম্যাগসালফেট খাইয়ে ওয়ার্ডের মাঝখানে রোগী এবং নার্সদের সামনে বসিয়ে রাখতে। ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যে তার পায়খানার বেগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যদি আশ্চর্যজনক কিছু না হয়ে থাকে, তবে এ ওষুধের ফলে পায়খানা হবেই। ছেলেটাকে ওয়ার্ডের মাঝখানে বসানো হলো। তার উপর সকলের কড়া নজর। ঘণ্টাখানেক অতিক্রান্ত হবার পর একটুখানি অস্থিরতার ভাব দেখা গেল। সে বলল যে প্রস্রাব করতে হবে। একা যেতে দেয়া ঠিক হবে না মনে করে সহকারী ডাক্তারকে সঙ্গে পাঠালাম। বললাম, পায়খানার দরজা খোলা রেখেই তাকে প্রস্রাব করাতে হবে। ছেলেটা খানিকটা আপত্তি জানালেও ডাক্তার রাজি হয়নি। এবার সে প্রস্রাব করতে বসে। ডাক্তারের সামনে বসে প্রস্রাবের সঙ্গে পায়খানাও করলো প্রচুর পরিমাণে। বললো, অনেকদিন পর এই প্রথম পায়খানা হলো। তাকে সমবেদনা জানিয়ে বললাম, এবার থেকে তার অসুবিধা সেরে যাবে, তার নিয়মিত পায়খানা হবে। যদি না হয়, তাহলে হাসপাতালে ভর্তি করা যাবে। এরপর থেকে তার নিয়মিত পায়খানা হতে লাগল। ছেলেটির বাবা-মা'র মন শান্ত হলো। সকলেই বুঝতে পারলো এটা প্রকৃতির খেয়াল নয়। বাবা-মা'র অস্থিরতা, দেশ-বিদেশে নামধারী চিকিৎসকদের উৎসাহ ছেলেটিকে উৎসাহিত করেছিলো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তার পায়খানা হতো কিন্তু সে গোপন রেখেছিলো নানা ডামাডোলে উৎসাহিত হয়ে। সহজভাবে রোগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রায় বছর খানেক সময় লাগে। যে উপায়ে তাকে সকলের সামনে মলত্যাগে বাধ্য করা হলো সে সাধারণ ব্যাপারটা আমাদের মনে জাগেনি কারুর। তা না হলে দেশ থেকে দেশান্তরে এ

সামান্য ব্যাপার নিয়ে অসাধারণ চিন্তা-ভাবনা হতো না। এজন্যেই বলা হয়, সাধারণ জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণ।

রোববার ঃ দেশ জাতি সমাজ সম্পর্কে একজন চিকিৎসক হিসেবে আপনার যে স্বপ্ন ছিলো তা কতোটা সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি একটি ছবি আমাদেরকে উপহার দিন।

নুরুল ইসলাম ঃ সকলের স্বপ্ন থাকা স্বাভাবিক। শুধু চিকিৎসক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও আমার স্বপ্ন ছিলো, আছে। শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক সুস্থতাই স্বাস্থ্য। একটি স্বাস্থ্যবান দেশ ও জাতির নাগরিক হিশেবে গর্ববোধ করার সৌভাগ্য স্বভাবতই আমার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন রোগ নিরাময় কিংবা রোগ প্রতিরোধে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক এবং নৈতিক সমৃদ্ধি যদি না হয়, প্রতিদিনের ঘটনা-দুর্ঘটনা যদি সামাজিক অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত দেয়, সন্ত্রাস যদি বছরের পর বছর ধরে প্রতিটি ছাত্রের জীবনের মূল্যবান সময় কেড়ে নেয়, দুর্বল প্রশাসন যদি নীতিমালা বাস্তবায়নে অক্ষম হয়, অসাধুতা যেখানে সাধুতার চেয়ে শক্তিশালী রূপ নেয়, ধর্ম যেখানে অন্যায় অপরাধের সম্বল হিশেবে ব্যবহৃত হয়, সে সমাজ তথা জাতিকে সুস্থ বলা যায় না। কথায় বলে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল। আমি বলি সুখের অভাবই অসুখ।

সাপ্তাহিক রোববার ১৮. ৭. ৯১ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

মাদকাসক্তির অভিশাপ

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, তবে এর সীমাবদ্ধতা ছিল। কখনও বা আনন্দের সামগ্রী হিসাবে, আবার কখনও বা ধর্মীয় উৎসবে বহুকাল ধরে ভারতবর্ষে এর ব্যবহার চলে আসছিল।

খ্রিস্ট ধর্মের শতবর্ষ আগে মেক্সিকোবাসী ইন্ডিয়ানরা এক প্রকার গাছের নির্যাসকে তাদের ঈশ্বরের বিশেষ অবদান হিসাবে ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহার করত। আরো নানা জাতীয় গাছের নির্যাসও ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এ সকল ব্যবহার স্বাভাবিক কারণেই সীমিত ছিল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে। শুনতে অবাক লাগে, খ্রিস্ট ধর্মেরও দু'হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে গাঁজার প্রচলন হয় ধূমপানের মাধ্যমে।

জার্মানীতে মারিগোয়ানা, মারিজোয়ানার ব্যবহার শুরু হয় খ্রিস্ট ধর্মের অর্ধ শতাব্দী পূর্বে। পেরু এবং বলিভিয়ায় খ্রিস্ট ধর্মের এক হাজার বৎসর আগে কোকা পাতা চিবিয়ে রস গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর দক্ষিণ আমেরিকার কোকেন, উত্তর আমেরিকার তামাক এবং মধ্য আমেরিকার মারিজোয়ানা আস্তে আস্তে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য কেনাবিস, গাঁজা, মারিজোয়ানা, ভাং ইত্যাদি নিয়ে অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে কিংবা সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আসলে এসব অভিন্ন এবং কেনাবিস মেটাইবা নামক এক প্রকার গাছ থেকে তৈরি মাদ্রকদ্রব্য। ভারতবর্ষে এর নাম গাঁজা বা ভাং। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে মারিজোয়ানা।

বিগত দুই দশকে নেশা সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্যের ব্যবহার যেভাবে বেড়ে গেছে তা আতংকজনক। সারা বিশ্বে অসংখ্য তরুণ এখন নেশাগ্রস্ত। এ আসক্তির সহিত শুধু ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমাজ এবং জাতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ফলে শুধু পারিবারিক এবং সামাজিক নয়, নেশার ফলে জাতীয় জীবনেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে অনেক।

বাংলাদেশে আফিম, গাঁজা, চরস ইত্যাদির প্রচলন নতুন নয়। তবে মাদকদ্রব্য হিসেবে গোড়ার দিকে প্রায় সকল দেশেই যেমন এর ব্যবহার সীমিত ছিল, বাংলাদেশে ছিল আরও বেশি সীমিত।

আফিমের ব্যবহার আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় এক সময় ছিল বহুল প্রচলিত এবং সেই সূত্র ধরে নিয়মিত আফিম ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায়ই চোখে পড়ত। স্বল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত কিছু লোকের মধ্যে গাঁজার ব্যবহার দেখা যেত। কেউ কেউ আধ্যাত্মিক সাধনায় সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার করত। এখনও তারই

ফলশ্রুতি হিসেবে কোন কোন জায়গার আশেপাশে গাঁজায় আসক্ত লোকদের একসাথে থাকতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যখন একটা পরিবর্তনের ঢেউ আসে, যে তরুণ সমাজ আত্মত্যাগের মাধ্যমে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে গিয়েছিল তাদেরই অনেকে তখন শিকার হয়ে যায় এই বদ অভ্যাসের।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আফিম জাতীয় মাদকদ্রব্য সরবরাহের উৎস আবিষ্কৃত হয় ১৯৬০ সালে। বিশেষজ্ঞগণ বার্মার [মায়ানমার] উত্তর-পূর্বাংশ, লাউসের উত্তর-পশ্চিম এবং থাইল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের প্রায় ৭৫০০০ বর্গমাইল এলাকাকে নাম দিয়েছে গোল্ডেন ট্রায়াংগল। বছরে প্রায় ৮০০ (আট শত) টন আফিম উৎপন্ন হয় এই অঞ্চলে এবং পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইরান চিহ্নিত হয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট নামে ১৯৭০ সালের শেষের দিকে। এখানে বছরে প্রায় ৯০০ টন আফিম উৎপাদিত হয়। এ দুই অঞ্চলে আফিম থেকে মরফিন এবং হিরোইন তৈরি হয়। গোল্ডেন ট্রাইংগল থেকে মাদকদ্রব্য যায় প্রধানত ইউরোপের বাজারে, আর গোল্ডেন ক্রিসেন্ট থেকে পাচার হয় তুরস্কে। তুরস্কে এবং ইরানে তৈরি মরফিন, হিরোইন বেশি বিক্রি হয় ইউরোপের বাজারে। বাংলাদেশ গোল্ডেন ট্রাইংগল এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্টের মাঝখানে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীরা বাংলাদেশকে ব্যবহার করে "করিডোর অথবা ট্রানজিট পয়েন্ট" হিসেবে। পরবর্তীকালে 'গোল্ডেন ওয়েজ' বলে আরেকটি নামের উদ্ভব ঘটে। ভারত, নেপাল সংলগ্ন এলাকা এবং স্বভাবতই নিকটবর্তী বাংলাদেশও এ নামের আওতায়।

মাদকদ্রব্য চোরাচালানীতে যারা জড়িত তারা নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এড়িয়ে চলার কারণে নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশকে "করিডোর" হিসেবে ব্যবহার করে অতি নিপুণতার সাথে কাজ চালিয়ে যায় এরা।

ভারতের নয়াদিল্লী এবং বোম্বে হিরোইন পাচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে যায় পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষত ইউরোপ, আমেরিকা এবং বৃটেনে। বস্তুত বৃটেনের পাচারকৃত হেরোইনের তিন-চতুর্থাংশ আসে ভারত থেকে। ভৌগোলিক কারণে এ কাজে বাংলাদেশও করিডোররূপে ব্যবহৃত হয়। বার্মা থেকে ড্রাগস পাচার হয় বিশেষ করে জলপথে। জলপথ এবং আকাশপথে দক্ষিণ এশিয়া থেকে ইউরোপ

এবং আমেরিকায় মাদকদ্রব্য পাচারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। সেই হিসাবে মাদকদ্রব্য চোরাচালানে বাংলাদেশ অন্যতম করিডোর। সংগত কারণে অনুমান করা হয়, হিরোইন পাচারের সংগে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের সংগঠিত চোরাচালানী দল রয়েছে। বার্মা ও আফগানিস্তানে হিরোইন প্রস্তুতকারকগণ এদের উপাদান এবং উৎসাহ যোগায়।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

পশ্চিমা দেশগুলোতে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে আশির দশকের গোড়াতে। তারই ফলশ্রুতিতে চোরাচালানী ব্যবসায়ীরা উন্নয়নশীল দেশের দিকে নজর দেয়। হিরোইন প্রায় দেড় দশক আগে বাংলাদেশে তেমন পরিচিত ছিল না। প্রথমবারের মত হিরোইন দেশে ধরা পড়ে ১৯৮৪ সালে। সীমান্ত এলাকা দিয়ে লাখ লাখ টাকার হিরোইন এখন এখানে চলে আসে। ১৯৮৮ সালের একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় ঢাকা শহরে ড্রাগ আসক্তের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি এবং তরুণদের মধ্যে এ আসক্তির প্রবণতা অধিক। বেনাপোল সীমান্ত এলাকায় বারটি জেলায় বিশ হাজারের অধিক তরুণ-তরুণী এ অপরাধের শিকার। হিরোইনের বিকল্প হিসাবে অনেকে পেথেডিন ব্যবহার করে। মাদকাসক্তির শিকার হয়ে অনেক সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটেছে তার দু'একটি এখানে উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার শক্তি প্রসাদ বিশ্বাস ১৯৮৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রাণ হারান। তিনি ছিলেন পেথিডিনের শিকার। পরবর্তী সময়ে হেপী আখন্দ মৃত্যুবরণ করে মাদকাসক্তির কারণে। ১৯৮৮ সালে একটি দৈনিকের খবরে প্রকাশ — পাবনা জেলার ৫টি উপজেলায় হিরোইন গ্রহণের ফলে দুই মাসে একুশ জন প্রাণ হারায়। এ ছাড়াও ড্রাগে আসক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে সহস্রাধিক। এদের বেশির ভাগই রিকশা, বাস, ট্রাক চালক এবং দিনমজুর।

বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ১৯৮৮-৯০ সাল পর্যন্ত ৭০৭ জন মাদকাসক্তের উপর জরিপ চালিয়ে দেখতে পায়, আসক্তদের গ্রহণীয় মাদকদ্রব্যের মাঝে হিরোইন ৫২.৩৩%, প্যাথেডিন ২০.০৮%, অন্যান্য ধরনের ড্রাগ ১৯.৩৭%, ক্যানাবিস এবং এ্যালকোহল ৪. ২২%। বয়সের দিক দিয়ে এদের মাঝে ১৯ থেকে ২৮ বৎসর বয়সীদের সংখ্যা সর্বাধিক (৬৭.২৫%)।

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কারণ

সহস্রাধিকনেশা দ্রব্য ব্যবহারের কারণ অনেক। সংগীদের প্রভাব, অজ্ঞতা, কৌতূহল, বেকারত্ব, নিসংগতা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পূর্বউল্লিখিত

সমীক্ষা অনুসারে প্রথমবার মাদকদ্রব্য ব্যবহারের কারণ হিসাবে দেখা গেছে বন্ধুদের প্রভাব সবচাইতে বেশি ৩৮.২১%। কৌতূহল ২৫.৪৫%। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে হতাশা, দুশ্চিন্তা, পারিবারিক সমস্যা ৩৬.৩৪%।

অনুমান করা হয়, হিরোইন আসক্তের সংখ্যা শুধু ঢাকা শহরে ৫০,০০০–৬০,০০০–এর কাছাকাছি আর সারা দেশে দশ থেকে বার লাখ। ১৯৮৪ সালে আফিম আমদানি এবং সরবরাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর আগে অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আসক্তের সংখ্যা ছিল আঠার হাজার। গাঁজাখোরের সংখ্যা ৫০,০০০–এর উর্ধে। দেশী মদ ক্রয়ের পারমিট আছে ৫৮১৭৬ জনের, আর বিদেশী মদের জন্য আছে ১৯৭২ জনের। তবে মদখোরের সংখ্যা প্রায় চার লক্ষের কাছাকাছি বলে অনুমান করা হয়। বর্তমানে বিদেশী মদ বিক্রয়ের জন্য ৭৭টি বার এবং দেশে উৎপাদিত মদ বিক্রয়ের জন্য ২২৭টি লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান আছে। এ ছাড়া ঔষধ হিসাবে কয়েক লাখ পেথেডিন এবং মরফিন ইঞ্জেকশন দেশেই তৈরি করা হয়।

মাদকাসক্তদের অপরাধ প্রবণতা

সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায় মাদক আসক্তদের শতকরা ১০ জন তথ্য প্রদানে রাজি হয়নি। শতকরা ২০ জন কোন প্রকার অপরাধ করেনি, কিংবা মামলায় জড়িয়ে পড়েনি বলে জানান। বাকি ৭০ জন একাধিকবার নানা অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে। অপরাধ আচরণের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

মাদকাসক্তের অপরাধ আচরণের চিত্র

ছিনতাই —	১৫%
পকেট মার —	৯০%
যানবাহন দুর্ঘটনা —	০৫%
মাস্তানী —	০৫%
বিশৃঙ্খল আচরণ —	২৫%
খুচরা মাদক বিক্রি —	০৫%
অপরাধের প্রকৃতি প্রকাশে অনিচ্ছা —	৩৫%
কোন অপরাধ করেনি —	১০%

আরেকটি সমীক্ষায় ৮৭৬ জন মটরগাড়ি চালক অংশ নেয়। এদের মধ্যে ১০২ জন (১১.৬৪%) মাদকাসক্ত। এই ১০২ জনের মধ্যে ০২ জন রিকশাচালক, ০৭ জন টেম্পো চালক আর অন্যান্যরা বাস এবং ট্রাকচালক। এমন একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে উজ্জ্বলতার একটি দিক আছে। শতকরা প্রায় ৯৯ জন মাদকাসক্ত মনে করে তাদের এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিৎ এবং সদিচ্ছা মাদকসাক্তি বিলুপ্তির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

মাদকাসক্তির পরিণতি

যে-কারণেই হউক না কেন নেশাগ্রস্তের পরিণতি ভয়াবহ। এর প্রভাব সমাজের প্রতিটি স্তরে, পরিবারের শুধু আর্থিক দিক দিয়ে নয়, নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। পিতা-মাতার নেশার ব্যবহার ছেলেমেয়েদের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। এই বদভ্যাস তাদের নিকট স্বাভাবিক সামাজিক আচার বলে মনে হয়। নেশাগ্রস্ত পিতা-মাতা তাদের অপরাধ সম্বন্ধে সজাগ হলেও ছেলেমেয়েদের সে বিষয়ে সজাগ করে দিতে অপারগ। স্কুলে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার উৎসাহের সৃষ্টি করে এবং এটাকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা করে, আমিও করে দেখি — এই মনোভাব নিয়ে যে বদভ্যাসের সূচনা তা জীবন গড়ার প্রথম পদক্ষেপে বিরাট আঘাত হানে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিফলতা আনে। বস্তুত, সকল প্রকার সামাজিক এবং নৈতিক ব্যভিচার পবিত্র শিক্ষাংগনে এমনিভাবে প্রবেশ করে। স্কুলের সীমাবদ্ধ পরিধিতে যে মারাত্মক বদভ্যাসের জন্ম, ক্রমে ক্রমে তা বিস্তার লাভ করে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে — কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কর্মস্থলে নেশার রূপ অভিন্ন নয়। সামান্য কয়েকজন থেকে এর বিস্তৃতি লাভ করে বহুজনে। পরিণতি একই। সবারই সমান, নেশাগ্রস্ত যে গোলার্ধের অধিবাসী হউক না কেন তার আচরণ এবং পরিণতি অভিন্ন। যেমন অভিন্ন নানা রোগের প্রকৃতি — সামান্য সর্দি-কাশি থেকে ক্যান্সার, যাই হোক না কেন।

মাদকবিরোধী পদক্ষেপ

আফিম, মদ, গাঁজা, ভাং ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের উপর প্রথম আইন প্রচলিত হয় নিউ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে। উদ্দেশ্য ছিল শূন্য রাজকোষের সুরাহা। আফিম চাষের উপর নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় ১৮৫৭ সালের আফিম আইন দিয়ে। ১৯০৯ সালের এক্‌সাইজ এক্ট এবং ১৯৩০ সালের ডেন্‌জারাস ড্রাগস এক্ট — এই দুই আইন হ'তে উৎসারিত বিধিমালা দিয়ে মদ, গাঁজা, ভাং এবং আফিমসহ সিনথেটিক ড্রাগের

নিয়ন্ত্রণের লাইসেন্স ও পারমিটের ব্যবস্থা চালু হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশী-বিদেশী মদ, গাঁজা, ভাং এবং আফিম ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের লাইসেন্সের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। মূলত এই সকল দ্রব্যের উপর লাইসেন্স অতি উচ্চ পর্যায়ে বিরল ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে।

১৯৮৫ সালে আফিম বিক্রির দোকানগুলি সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়া হয় এবং যে ১৬০০০ আফিম পাশ ছিল সেগুলিও নবায়ন করা বন্ধ হয়। পাঁচ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে গবেষণা ও ওষুধ ক্ষেত্র ছাড়া গাঁজা চাষের ব্যবহার এবং ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এটাও বলে রাখা ভাল, গাঁজার উপর এই দেশে এখন পর্যন্ত গবেষণা ও ওষুধ ক্ষেত্রে কোন কাজ হয়নি। ১৯৮৮ সালে ডেন্‌জারাস ড্রাগস এক্ট ১৯৩০-এর উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনা হয়। তাতে বেআইনী মাদকদ্রব্যের পাচার, ২৫ (পঁচিশ) গ্রামের বেশি সংরক্ষণ এবং বিপজ্জনক মাদকদ্রব্য উৎপাদনের জন্য দোষী ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। এমনকি ২৫ গ্রামের কম পরিমাণ মাদকদ্রব্য থাকলেও সর্বনিম্ন ২ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

অতএব, দেখা যায় আইন প্রণয়নের দিক দিয়ে বাংলাদেশ তেমন পিছিয়ে নেই। মাদকাসক্তি প্রতিকারের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে এর নিরাময় এবং নিবারণের জন্য নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আইন সংশোধন এবং সংবর্ধন করা হয়েছে। তবুও নানা কারণে এ সামাজিক দুষ্টব্যাধি থেকে দিন দিন অধিকতর পরিমাণে আমরা ভুগছি। দু'টো বিশেষ কারণে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য চোরাচালান হয়।

বাংলাদেশে চোরাচালানের বিশেষ কারণ

১) এ দেশকে করিডোর হিসাবে ব্যবহার।

২) দেশের যুবকগোষ্ঠির হতাশা এবং বেকারত্বকে সম্বল করে নেশাগ্রস্ত করে তোলা।

করিডোর হিসাবে বাংলাদেশের ব্যবহার এখন আর অজানা নয়। ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা মূল্যের হিরোইন পাচার করার দায়ে পাঁচজন পাকিস্তানী নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাদের সাথে জড়িত দুইজন বাংলাদেশী নাগরিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। একই সালে অপর এক পাকিস্তানী নেপাল যাওয়ার পথে ধরা পড়ে, তার হাতব্যাগে

দেড় পাউণ্ড পরিমাণ হাশিষ পাওয়া যায়। ১৯৮৮ সালে শ্রীলংকার দুইজন নাগরিক ধরা পড়ে দুই কেজি হিরোইন নিয়ে। তাদের গন্তব্যস্থল নাকি যুক্তরাজ্য। প্রতি বৎসর এক হাজার কোটি মূল্যের টাকা তিন টন হিরোইন বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পাচার হয় বলে অনুমান করা হয়। একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এর পাচারকার্যে জড়িত। ইউরোপ এবং পশ্চিমা দেশগুলো নিয়ে, বিশেষ করে আমেরিকা, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো নিয়ে এই নেটওয়ার্ক।

বাণিজ্যিক জাহাজগুলো বহুকাল আগে থেকে মাদকদ্রব্য চোরাকারবারিতে লিপ্ত। ১৯৮১ সালে বিদেশগামী একটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে ২০ কেজি মারিজোয়ানা আটক করা হয়।

১৯৮২ সালে একই বন্দরে সমুদ্রগামী বাংলার কল্লোল থেকে উদ্ধার করা হয় —

১। আফিম	২৩ কেজি
২। হাশিষ	২৫ কেজি
৩। মারিজোয়ানা	৮ কেজি

১৯৯০ সালে এম. ভি. সমুদ্র নামে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে ৩ কোটি টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হরা। এতে ছিল ঃ

১। হিরোইন	২ কেজি
২। চরস	১৩ কেজি
৩। মাদক ইনজেকশন	আড়াই হাজার এ্যাম্পল।

স্থলপথ, জলপথ, আকাশ পথে বাংলাদেশে আসা কি পরিমাণ হিরোইন এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে তার হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ১৯৮৯ সালের ২৫শে জুলাই ঢাকা এবং পার্শবর্তী এলাকা থেকে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

ঢাকা এবং পার্শবর্তী এলাকায় উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য — (১-১-৮৫ — ২৫-৭-৮৯)

১। হিরোইন	৪৯.৫ কেজি
২। গাঁজা	৭২.৫ কেজি
৩। চরস	৭ কেজি
৪। ভাং	১৯ কেজি
৫। আফিম	৪ কেজি
৬। পেথিডিন এ্যাম্পল	৮৫৭৫
৭। মরফিন	৫৩৪২

মাদক পাচার বিরোধী অভিযান জোরদার করার সাথে সাথে পাচারকারীরা নানা অভিনব কৌশল প্রয়োগ করে। ১৯৮৮ সালে হিরোইন পাচারের জন্য রাজশাহী সীমান্তে ৩০০ জনকে আটক করা হয়। এদের ৩৩ জন শিশু এবং ৩৪ জন মহিলা।

উপসংহার

নেশা এখন সারা বিশ্বে একটি সমস্যা। নেশার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া শুধু নেশাগ্রস্তের নয়, তার পরিবার, জনগোষ্ঠী, জাতি সকলের জন্য এক বিরাট হুমকি। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী চক্র তাদের শক্তিশালী সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যেভাবে নেশা পাচার করে থাকে তার মোকাবেলা করা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়, অসম্ভবই বলতে হবে। নেশাকে আমরা একটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছি। এই সমস্যার সমাধানে আমাদের সামর্থ সীমিত। তবুও জাতীয় পর্যায়ে আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। যে সকল সমস্যা নেশার জন্ম দেয় এবং একে লালন করে তার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সকল সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব না হলেও আমাদের সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সবশেষে দৃঢ়তার সাথে বলব, নেশাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে দেশগুলো যদি আন্তরিকতা এবং দৃঢ়তার সহিত এর নিরসনে এগিয়ে না আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার মত এর সমাধানও মিলবেনা। দায়দায়িত্ব সকলকেই নিতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব যেমন অপরিহার্য, জাতীয় পর্যায়ে

আমাদের কর্তব্য অবহেলার ফলে সাফল্য বিঘ্নিত হবে। মাদক চোরাচালানীদের অন্তর্ভুক্ত অবৈধ আয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে এমন একাধিক লোক বাংলাদেশের ভিতরেই আছে। প্রবেশ পথে অবৈধ আয়ের অংশীদার হিসেবে সহযোগী না থাকলে বাংলাদেশ করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারতনা। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দায়িত্ব এদের চিহ্নিতকরণ এবং উপযুক্ত শাস্তিবিধান। শুধু আইন প্রণয়ন করে নয়, এর প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এই আইন লোক-দেখানো নয়, বাস্তবিক এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহজ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর একটি সাংবাদিক সম্মেলন

বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রচারণা এবং বিভ্রান্তিকর কুৎসা রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ইউএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলামের ভাষণ — তারিখ ঃ ১৯-৯-১৯৯৩ ইং।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের প্রতি আপনাদের অঙ্গীকার এবং সেই অঙ্গীকার পূরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি)-এর কর্মসূচীর প্রতি আপনাদের আগ্রহের প্রমাণ রেখেছেন। সভার শুরুতে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি নিজেদের কিছুটা ত্রুটি স্বীকার করে নিলে হয়ত আমাদের ভার কিছুটা লাঘব হবে। আপনারা জানেন যে, কোন কর্মসূচীর সূচনা পর্বটা বেশ নাজুক। কারণ এসময়ে উদ্যোক্তাদের অধিকাংশ সময় চলে যায় পরিকল্পনার প্রতিটি দিক গুছিয়ে নিয়ে কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। একটি বীজ বুনে চারা তুলে তাকে প্রকাণ্ড গাছের সাথে তুলনীয় করে তুলতে যে কঠিন-কঠোর নিষ্ঠার প্রয়োজন আমাদের ক্ষেত্রেও হয়েছে তেমনি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে আপনাদের সকলের দ্বারে গিয়ে নিজেদের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। এটা আমাদের ত্রুটি কিংবা ব্যর্থতা যেভাবেই আপনারা নিতে চান আমরা আপত্তি করবোনা। আমাদের একান্ত প্রত্যাশা ছিল একদিন আমাদের হাতে বোনা এই চারা গাছটি ফলে-ফুলে সুশোভিত হবে। যখন সবাই জানবে গাছটির কি নাম।

আমাকে তাই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে সেই গাছটি বেড়ে ওঠার আগেই শুরু হয়েছে গাছের মালিকানা নিয়ে কথামালা, জমির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক কিংবা এই বাগানের মালিক কে, মালি কে? ফলগুলো কি মিষ্টি হবে না টক হবে, এ ধরণের বিতর্ক। বিতর্কে ক্ষতি নেই, আপত্তিও নেই। কারণ গঠনমূলক সমালোচনা ও বিতর্ক কল্যাণ বয়ে আনে, একথা আমি সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছি এবং এখনো করি। কিন্তু বিতর্কের নামে যদি সেই চারা গাছটিকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয় তাহলে তাকে নিছক বিতর্ক হিসেবে গ্রহণ করা যায়না — বলতে হয় অন্য কিছু। আজ তাই

তেমনি একটি পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে সংক্ষিপ্ত কোন বক্তব্য দেয়া কঠিন হলেও আমি চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে।

১৯৮১ সাল থেকে আজ ১৯৯৩ পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘ এক যুগের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সাধনার সম্মিলিত রূপ আমাদের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ইসলামিক মেডিকেল মিশন (আইএমএম), আইএএইচএস, জনসেবা ফাউণ্ডেশন এবং ইউএসটিসি। অনেকেই মনে করছেন আমরা বুঝি আমাদের কোন একটি প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে দিচ্ছি। এটা দুষ্ট লোকের প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যের বেসাতি মাত্র। আমাদের কোন একটি প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হবার নয়। বরং আমরা সব ক'টি প্রতিষ্ঠানকে একই সেতুবন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রেখেছি। এর একটি অপরটির সম্পূরক ও পরিপূরক। তাই আমি একটু অতীতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতে চাই।

১৯৮১ সালের পর 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচীর লক্ষ্য বাংলাদেশে কিভাবে অর্জন করা যায় এ বিষয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা অনুভব করি যে, মসজিদের ইমাম ও প্রাথমিক বিদ্যালয় — শিক্ষকের ন্যায় অর্ধ ব্যবহৃত জনশক্তিকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তাঁরা সহজেই অসংখ্য সাধারণ অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা প্রদান করতে এবং বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি জনগণের স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানের বিকাশে অবদান রাখতে পারেন। এই লক্ষ্যে আমাদের আয়োজিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক উৎসাহ বয়ে আনে। ক্রমে ক্রমে আমরা অনুভব করতে থাকি যে, বিচ্ছিন্নভাবে দু'চার সপ্তাহ প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে একটি সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সুবিধে এবং চিকিৎসা সহায়তা করা হলে আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এই লক্ষ্যে আমরা ১৯৮৪ সালে জনসেবা কমপ্লেক্স নামে ২৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা ব্যয়সাপেক্ষ একটি প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন করি। কিন্তু প্রকল্পের শুরুটা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। প্রকল্প ভাল কিংবা মহৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ হলেই টাকা পাওয়া যায় না। একথাটা বুঝতে গিয়েও আমাদের সময় লেগেছে। আইএএইচএস, একটি হাসপাতাল এবং একটি ঔষধ কারখানা প্রতিষ্ঠা এই তিনটি উপকরণের সমন্বয়ের যে জনসেবা কমপ্লেক্স এর স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম তাতে স্পষ্ট বলা ছিল ঃ একটি ট্রাষ্টি বোর্ড ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পেলেও জনাব এম. এ. সালাম ও জনাব ইব্রাহিম মিঞা (মরহুম) থেকে যথাক্রমে সোয়া দুই একর ও সাত একর জমি অনুদান হিসেবে লাভ করি। প্রায় একই সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে ৯৯ বছর মেয়াদী ইজারা ভিত্তিতে ফয়'জ লেকে তিন একর জমি লাভ করি। এতে আমাদের আশা এবং আস্থা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে আমরা

অনুভব করি যে, প্রকল্পের সবচেয়ে ব্যায়বহুল অংশ হচ্ছে আইএএইচএস। আমরা তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভুত ইন্সটিটিউট হিসেবে আইএএইচএস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। কিন্তু সরকার ঐ প্রকল্প আর্থিক কারণে অনুমোদন না করায় আমাদের দীর্ঘ তিনটি বছর সময়ের অপচয় হয়। আমাদের জন্য ঐ সময়টা ছিল কঠিন অগ্নি পরীক্ষার। কোনোভাবেই কোন ইতিবাচক কিছু করা যাচ্ছিল না। তবে প্রচেষ্টার বিরতি ছিলনা। দ্বার থেকে দ্বারে, বহু দ্বারে ঘুরেছি — ক'টি দ্বার খুলেছে, ক'টি খোলেনি সবাই জানেন।

১৯৮৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব এম. এ. কালাম এককালীন দশ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করে আমাদের সজীব করে তোলেন এবং ১৯৮৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত এক সভায় আমরা ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের জনসেবা প্রকল্পের অধীনে আইএএচইএস প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিই ও ১৯৮৯ সালের ১৩ই মে মাত্র ৪২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আইএএচইএস-এ ক্লাস আরম্ভ করি।

প্রায় সাড়ে নয় হাজার বর্গফুট আয়তনের দু'টো টিন শেড নিয়ে সূচিত এই প্রতিষ্ঠানে আজ ৩২৩ জন এমবিবিএস এবং ৬০ জন ফার্মেসী ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করেছে। এই অসমতল পাহাড়ের প্রায় দশ লাখ ঘনফুট মাটি অপসারন করে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট না করে এবং এক একর ভূমি পুনরুদ্ধার করে আমরা যে দু'টো ভবনের (আংশিক) প্রতিষ্ঠা করেছি তার বর্তমান আয়তন প্রায় ৬০ হাজার বর্গফুট। পাঠাগার, ল্যাবরেটরী সুবিধে গড়ে উঠেছে এবং তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। আমাদের প্রদত্ত এমবিবিএস ডিগ্রী বাংলাদেশ মেডিক্যাল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের ব্যাপক পরিচিত ও সুনাম। **Network of Community Oriented Educational Institutions for health Sciences** বা সংক্ষেপে **Network** নামে পরিচিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত সংগঠনের পূর্ণ সদস্যপদ আমার লাভ করেছি। আমাদের ছাত্র-শিক্ষকগণ বিনিময় কর্মসূচী **(Exchange Programme)** এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে যোগদানের সুযোগের অধিকারী। বৃটেনের রয়াল কলেজ আমাদের শিক্ষার্থীদের ইলেকটিভ **(Elective)**-এর সুযোগ দিয়েছে। অনুরূপভাবে জাপান, কানাডা ও সৌদি আরব থেকে আমরা পেয়েছি সহযোগিতার অঙ্গীকার। এগুলো একদিকে যেমন আমাদের সাফল্যের দৃষ্টান্ত, তেমনি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভবনার ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু যারা সাফল্য ও সম্ভাবনার আলোকসিক্ত হতে জানেন না তাঁদের কাছে এসব কিছু ভিন্নতর অর্থবোধক হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

আমাদের দীর্ঘদিনের অগ্রযাত্রা কোন পর্যায়েই বিচ্যুতির অবকাশ ছিলনা — কিন্তু তাই বলে বিভ্রান্তির কালো ধোঁয়া থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি আমাদের সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা থেকে শুরু করে ব্যাক্তিজীবনও আজ পারিনি। আমাদের সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনও আজ কুৎসা, নিন্দা ও পরশ্রীকাতরতার হাত থেকে নিরাপদ নয়। তবুও ব্যক্তিগতভাবে আমি একে দুর্ভাগ্য মনে করিনা। যেমনি মনে করেন না আমার প্রত্যেক সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী। কারণ এটা আমাদের অর্জিত নয় — মহল বিশেষের আরোপিত। আমরা আমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে হয়তো পারবো। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুরতা ঠেকাবে কে? তা না হলে মিথ্যে — ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষ প্রসুত অপপ্রচার আমাদের উপর চাপিয়ে আগামী প্রজন্মের সকল সম্ভবনার ভিত্তিমূলকে আঘাত করা হল কেন? আমি আজকের এই সুযোগে কিছু কিছু বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

এক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান হিসাবে যে আইএএচইএস প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করছিলাম তা তৎকালীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও অর্থায়িত হয়নি। আর ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের জনসেবা কমপ্লেক্সের অধীনে প্রতিষ্ঠিত আইএএইচএসকে খোদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি পরিদর্শন-রিপোর্ট মেনে নেয়ার পরও এ বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে অনাহুতভাবে।

দুই ইসলামিক মেডিক্যাল মিশন (আইএমএম) প্রতিষ্ঠিত আইএএইচএসকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন টিম স্বীকৃতি দেয়ার পর বারডেম কিংবা হলিক্রস কলেজের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের যে স্পষ্ট আইনানুগ কর্তৃত্ব ও স্বীকৃতি রয়েছে বার বারই তার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে।

তিন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে আইএএইচএস প্রতিষ্ঠানকে আইনানুগ রূপ দেয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে নানারূপ অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা করে এর অগ্রগতি ব্যাহত করা হয়েছে।

চার আইএএইচএস-এ ক্লাস শুরুর প্রায় ত্রিশ মাস পর ১লা অক্টোবর ১৯৯১ সংবিধি (Statute) এবং অধ্যাদেশ(Ordinance)-এর খসড়া প্রণয়নের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগী হন। কিন্তু তার মাত্র ১২ দিন পর ঐ নির্দেশ প্রত্যাহার করে তাঁরা বিভ্রান্তির অন্ধকারে তা তলিয়ে দেন।

পাঁচ· ১৯৯১ সালের ১০ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২রা মার্চ '৯১ প্রদত্ত শর্তাদি পূরণ করে Instrument of Operation ১৯৯১ (বাই ল'জ) প্রেরণ করা হলেও তাঁরা দীর্ঘ সাত মাস পর তার প্রাপ্তি স্বীকার করেন মাত্র। কিন্তু অনুমোদনের ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে গভর্নিং বডিতে ভাইস চ্যান্সেলরের একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্যে তিনজন বিশিষ্ট ব্যাক্তির নামসহ নতুন গভর্নিং বডি গঠন করতে বলেন। কিন্তু নতুন গভর্নিং বডি প্রস্তাব করার সাথে সাথে তাঁরা তা গ্রহণ না করে বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের জন্যে প্রযোজ্য বিধিমালার আলোকে আইএএইচএস–এর গভর্নিং বডি গঠন করতে বলেন, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

ছয়· আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া প্রতিটি শর্তপূরণ করার জন্যে সকল চেষ্টা করেছি এবং তা পূরণও করেছি। কিন্তু তারপরও চারটি পরিদর্শন টিমের প্রত্যেক্ষ সুপারিশ সত্ত্বেও আমাদের উপযোজন প্রদান না করে জনমনে আমাদের এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমাদের বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ উপযোজনের বিধিমালা প্রণয়ন করে তার ভিত্তিতে পরিদর্শন করতেন তাহলে কারো খেয়াল–খুশীর শিকার আমাদের হতে হোতনা। এই খেয়াল খুশীর নজির অসংখ্য। একটিই উল্লেখ করবো — আর তা এই যে, পরিদর্শন এমনকি চিকিৎসা শিক্ষার সাথে জড়িত বিশিষ্ট অধ্যাপকবৃন্দের সুপারিশও বিবেচনায় আনা হয়নি।

আমাদের সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল তখনই আমাদের অনুরোধে এগিয়ে আসেন আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগীগণ। আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ এ. এফ. এম. ইউসুফ, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদ বীর বিক্রম এবং সংসদ সদস্য আখতারুজ্জামান চৌধুরীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করতে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাধ্য হয়।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এখানে এসে আমাদের এবং আমাদের সে দুর্দিনের সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের দুর্ভোগের নতুন করে সূচনা হয় মাত্র। যেখানে স্বয়ং মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী, একজন সংসদ সদস্য এবং বৃটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান হাই কমিশনার

জড়িত এবং তাঁদের সকলের ব্যাক্তিগত প্রচেষ্টা ও সুনাম জড়িত সেখানে এসে তাঁদের প্রতি চরমতম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দাবী করা হয় যে, 'অভিভাবকরাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক উপযোজন এনেছেন' এবং ছাত্রদের দিয়ে সাংব্যাদিক সম্মেলনে তা দাবী করানো হয়েছে। এটা কত বড় অসত্য — কত বড় বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য, একবার অনুভব করুন। কিন্তু যখন প্রকাশ করা হল যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোন উপযোজন দেয়নি ; প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি এবং অন্য তিন ব্যাচে ছাত্র ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র তখনও শুভবুদ্ধির উদয় হয়নি। আরো একটু পিছিয়ে গিয়ে সেই ১৯৮৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত বিজ্ঞাপন এবং প্রসপেকটাস দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, IAHS is affiliated to University of Chittagong লিখে ছাত্রদের প্রলুব্ধ ও অভিভাবকদের প্রতারিত করা হয়েছে। অথচ এরা একবারও জানতে কিংবা বুঝতে চাইলেন না যে, পরিদর্শন টিম এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন এবং আইএএইচএস পরিচালক প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা এ বিষয়ে কোনরূপ মন্তব্য তাঁদের রিপোর্টে করেননি।

গভর্নিং বডি নিয়েও বহু বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে অভিভাবকদের নিয়ে প্রতিশ্রুত গভর্নিং বডি করা হয়নি, দু'বছরের প্রসপেকটাসে দু'ধরণের গভর্নিং বডি দেখানো হয়েছে। অথচ এরা একবারও জানতে চাইলেন না — আইএএইচএস-এর প্রথম গভর্নিং বডি ছিল মূলত একটি প্রকল্প কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বার বার বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডির রূপরেখা চেয়ে এবং সে অনুযায়ী গভর্নিং বডি গঠনের আগ্রহ ও ইচ্ছে ব্যক্ত করে আমরা বার বার হতাশ হয়েছি। এমনকি তিন বছরে তিনভাবে গভর্নিং বডিতে পরিবর্তন এনেও আমরা এই অচলায়তন ভাঙ্গতে পারিনি। এরপরও ঘটনার শেষ হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ গভর্নিং বডি ছাড়াই উপযোজন দিতে কার্পণ্য করেনি সেক্ষেত্রে আমরা গড়িমসি, কালক্ষেপ এবং উন্নাসিকতার কালস্রোতে আবর্তিত হচ্ছিলাম। তবুও ছাত্রদের শিক্ষা জীবন নির্বিঘ্ন করার স্বার্থে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রশাসনিক নিদের্শের ভিত্তিতে এডহক কমিটি গঠন এবং কোন সংবিধি কিংবা অধ্যাদেশের সমর্থনহীন হলেও তাঁদের নির্দেশিত মতে গভর্নিং বডি গঠনে সম্মত হই।

১৫ নভেম্বর ১৯৯২-এর মধ্যে অভিভাবকগণের নিকট বকেয়া টিউশন ফি পরিশোধ করার অনুরোধ জানাই। কিন্তু তার জবাব পাওয়া যায়নি।

আমরা যদি ভুল করে থাকি তবে তা সংশোধনের অধিকার আমাদের আছে। তবে ভুল সংশোধনের পর তা নিয়ে কাদা-ছোঁড়াছুড়ি করার কোন অধিকার কারো থাকতে পারে কিনা আপনারাই বিবেচনা করুন।

রেলওয়ের নিকট থেকে কি শর্তে জমি নেয়া হয়েছে এবং কিভাবে আইএএইচএস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সে প্রশ্নে রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা পরবর্তীতে বরাদ্ধকৃত এক একর জমির বরাদ্ধপত্রে "ইসলামিক মেডিক্যাল মিশনের আইএএইচএস" বলে উল্লেখ করেছিলেন। আর একই স্থানে ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠার আবেদনপত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী হচ্ছেন স্বয়ং যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয়। কিন্তু তবুও আইএএইচএস থাকবে ইউএসটিসি থাকবে না এমন উদ্ভট যুক্তি দেখিয়ে ছাত্রদের একাংশকে ক্লাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মা থাকবে বাচ্চা থাকতে পারবেনা।

আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি বিশাল পরিবারের এক একজন সদস্যের ন্যায়। কাউকে বিচ্ছিন্ন করার কিংবা বিচ্ছিন্ন ভাবার কোন অবকাশ নেই। ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, বারডেম, ইব্রাহিম মেমোরিয়াল ডায়াবেটিক সেন্টার এবং ডায়াবেটিক ফাউণ্ডেশন এর ন্যায় আমাদের সব ক'টি প্রতিষ্ঠানও একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আইনানুগ।

আমি দ্বিধাহীন মনে বলতে চাই যে, বেসরকারী খাতে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণ আমাদের শিক্ষাথীদের জীবনে যে হতাশার কালো মেঘ ছড়িয়ে দিয়েছিল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন এবং ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা দূর হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তিকৃত আমাদের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যেখানে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল তা থেকে তারা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। যাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না আজ তারা দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনটিতে রেজিস্ট্রেশন করাতে এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে। পছন্দ তাদের।

আমরা ইচ্ছে করলে তাদের সরাসরি ইউএসটিসি তে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু তা না করে তাদের এবং অভিভাবকগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছি। জোর করে কাউকে ইউএসটিসিতে নিয়ে আসিনি। প্রসঙ্গক্রমে আমি কিছু তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তিকৃত ছাত্রদের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাখা হয়নি। তেমনি বিআইটি প্রতিষ্ঠার পর চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সরাসরি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিআইটি'র অধীনে চলে যায়। একইভাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সব ক'টি কৃষি কলেজ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়। এ নিয়ে আদালতে মামলা করেও কোন লাভ হয়নি। আর সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে আমাদের সামনে রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ। একটি মাত্র নির্দেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে যায় প্রায় সাড়ে পাঁচশ ডিগ্রী কলেজ।

ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠার প্রধানতম কারণটি এতক্ষণে বলা হয়ে গেছে। তা এই যে, ছাত্রদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে মুক্তির সোপানে নিয়ে আসা। তার প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন। দ্বিতীয় কারণটি আরো বাস্তব — সেশন জট। আমাদের তিন ব্যাচের ১৫১ জন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর জীবন থেকে ইতোমধ্যেই মূল্যবান আটমাস করে সময় হারিয়ে গেছে। একটি মাত্র পেশাগত পরীক্ষা পাস করতেই যদি আট মাস সময় চলে যায় বাকী দু'টি পরীক্ষা কতটা সময় লাগবে কে জানে। অভিভাবকগণ এই ভার কিভাবে বহন করবেন জানিনা। তবে এ ভার কতটা কঠিন তা আমরা অনুভব করি। এই তিন ব্যাচের আট মাসের টিউশন ফি প্রায় ২৪ লাখ টাকা। আর তার ২৪ লাখ টাকা টিউশন ফি আদায় করা না গেলে এই প্রতিষ্ঠানের উপর আর্থিক দায় চাপে অনেক বেশী। তাহলে সেশন জটের চক্রে পড়ে এই প্রতিষ্ঠানটি Financial Viability অক্ষুণ্ন থাকার কথা নয়। তারপর আসছে শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ও সন্ত্রাস — নৈরাজ্যের কথা। এখনো গড়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীর জীবন থেকে দু'বছর হারিয়ে যায়, আর মেডিক্যালের কথাতো আপনারাই জানেন এবং নিজেরাই ভুক্তভোগী।

এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত দীর্ঘদিনের অসংলগ্নতা এবং অবক্ষয়ের মুখে বর্তমান সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি নতুন যুগের সূচনাই করেননি, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের কর্তব্য পালনের শ্রেষ্ঠতম নজীর স্থাপন করেছেন। জাতীয় সংসদ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ প্রণয়ন করে আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড বিচার–বিশ্লেষণ করার এবং জবাবদিহির ব্যবস্থা করেছেন।

আজ তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। যারা আমাদের ভুল বুঝে ভুল করেছেন তাদের দায়িত্ব আছে নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেয়ার. আমরা কথা দিতে পারি, আজকের ভুলের জন্যে তাদের আমরা কখনোই বিড়ম্বনার দিকে ঠেলে দেবো না তবুও সকল সংশয় ও সন্দেহ এবং অবিশ্বাস নিরসনকল্পে আমি দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, আইএএইচএস বিলুপ্তি হবার নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তিকৃত আইএএইচএস ছাত্ররা তাদের পছন্দমত নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সরকারী অনুদান ও পৃষ্টপোষকতা সত্বেও দীর্ঘ তিন দশকে বিশ্ববিদ্যালয় কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে আপনারা ভেবে দেখুন। তবে মাত্র তিন চার বছরে আমরা কতটা করেছি তারও সুষ্ঠু মূল্যায়নের অনুরোধ আপনাদের প্রতি থাকবে। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করে যাবোই। সরকারের দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের প্রণীত

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সহযোগীতা প্রদানের। দেশে-বিদেশে অর্জিত আমাদের সুনাম মর্যাদা আজ জাতীয় মর্যাদার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। আমরা কোনভাবেই চাইনা এই সংক্রামক ব্যাধির প্রসার ঘটুক — বিদেশের কাছে আমাদের মাথা হেট থাক। কোনভাবে চাইনা ছাত্রদের আর একটি দিনও নষ্ট হোক। হাসপাতাল আমরা প্রতিষ্ঠা করবোই এবং জানুয়ারী নাগাদ তা চালু হবেই, ইনশাল্লাহ।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বাধা আমাদের আসবেই যেমন এসেছে অতীতে। আমরা বিশ্বাস করি সাফল্যও সমভাবে আমাদের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াবে যেমন এসেছিল অতীতে। আমাদের সকল প্রচেষ্টার সারমর্ম হচ্ছে জনগণের কল্যাণ। এই উদ্যোগ ব্যর্থ হবার নয়।

পরিশেষে আমি একটি ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবো। একজন মানুষের জীবনে যা কিছু চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে আমি মনে করি, আমি আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি। আমার তাই এখন জাতিকে কিছু দেবার সময়। এবং সে জন্যে আমি আমার সাধমত চেষ্টা করে যাচ্ছি।

একটি আর্দশ ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে বিশাল মানবিক-স্বপ্ন আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে এতদিন আশ্রিত ছিল আজ তার অগ্রযাত্রার মুহূর্তে এর গৌরবময় অংশীদার হবার সুযোগ আজ সকলের জন্য অবারিত। আসুন আমরা সবাই মিলে প্রমাণ করি আমাদের শক্তির মূল উৎস কোথায়।

আমাদের সকল সৎ প্রচেষ্টা সফল হোক পরম করুণাময়ের কাছে সেই প্রার্থনা জানিয়ে এবং পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১৯৯৩ ইং।

গণমাধ্যম ও তামাক

আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং পৃথিবীর আরও অনেক উন্নত দেশে নানা সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে গণমাধ্যম অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের উপর ধূমপানের প্রভূত প্রভাব ফেলে। ১৩-১৯ বছর বয়স্কদের মধ্যে কোন কোন দেশে দেখা গিয়েছে ধূমপায়ী ছেলে-মেয়েদের ৭০% বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হয়েছে। তামাক কোম্পানী এদের আকৃষ্ট করে এমন বিজ্ঞাপন প্রচার করে। তাছাড়া খেলাধুলা এদের মন জয় করে আরও বেশি। নানা ধরনের উপহার, T-Shirts, সুন্দর কৌটা, নানা আকর্ষণীয় Snuff (নস্যি), বলপেনের মতো দেখতে সিগারেট, আরও কত কিছু উপহার কোমল মনে গভীর প্রভাব ফেলে। জীবনের এ সময়ে বিজ্ঞাপন মানসিক দিক দিয়েও এদের দুর্বল করে ফেলে। স্বকীয়তা, পৌরুষ, নিজের স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে মনজয়ী বিজ্ঞাপন প্রথম সিগারেট এদের হাতে তুলতে সাহস যোগায়। কৌতূহল এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাব এখানে নগণ্য নয়। এক সময় রেডিও এবং টেলিভিশন বাংলাদেশে ধূমপান প্রচারের প্রধান মাধ্যম ছিল। 'আধূনিক'-এর সফল আন্দোলনে এ দু'টো গণমাধ্যমে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তামাক ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষান্ত হয়নি, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে পোস্টার, লিফলেটে নানা আকর্ষণীয় ছবি যোগ করে হাট-বাজার, বাস-টার্মিনাল, রেল স্টেশন, স্টীমার ঘাট অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গায় জনসমাগম হয় বেশি সেখানে ওগুলোর ছড়াছড়ি ঘটিয়েছে।

যে কোন বিদেশী 'জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর' থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পাবেন, রাস্তার দুপাশে অসংখ্য বিলবোর্ডে 555, গোল্ডলিফ ইত্যাদি। এই বিলবোর্ড এখন সারা শহরের প্রধান প্রধান সড়কপথে। দিন দিনই যেন এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দৈনিক এবং সাময়িকীগুলোতে ধূমপানের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। এমন দৈনিক রয়েছে যেখানে সমস্ত বিজ্ঞাপন অতিরিক্ত চাহিদার কারণে সময় অনুযায়ী ছাপান হয় না, কিন্তু সেখানেও দেখা যায় পৃষ্ঠা জুড়ে তামাকের বিরাট বিজ্ঞাপন স্থান পেয়েছে। গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, বাংলাদেশে অন্তত একটি কাগজ আছে — 'আজকের কাগজ', ধূমপানের কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করেনা। এ অবস্থা কতদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব জানিনা। তবুও তাদের উৎসাহকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

এবারের 'বিশ্ব তামাকবিহীন দিবসে'র প্রতিপাদ্য বিষয় — 'গণমাধ্যম এবং তামাক'। জনসাধারণকে তামাকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। রেডিও এবং টেলিভিশনে বিতর্ক, আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ডকুমেন্টারি ফিল্ম, প্রকৃত

ভুক্তভোগীদের মুখের কথা জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরে তামাকের কুফল সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল করা সম্ভব। দৈনিক এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে, অনেকে অজুহাত তুলতে পারেন, তামাকের বিজ্ঞাপন বাদ দিলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হয়। এই অভিযোগ নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। সরকার যদি এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং বৈষম্যমূলক মনোভাব পোষণ না করেন তাহলে জনকল্যাণমুখী বহু বিজ্ঞাপন এ ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এ ছাড়াও তামাকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে দেশ-বিদেশের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ, নতুন তথ্য তুলে ধরা, এমনকি তামাকবিরোধী কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান নীতি। বাংলাদেশ রেডিও, টেলিভিশন নানাভাবে তামাকবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছেন। তবুও সাম্প্রতিককালে টেলিভিশনের পর্দায় সিগারেটের ধোঁয়া দেখতে পেলে শুধু বেমানান মনে হয় না, মনে হয় যেন আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। পরিবারের সকল সদস্যের সামনে টেলিভিশনের পর্দায় যদি ধূমপানের কুফল আমরা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি — এর প্রভাব অপরিসীম। ধূমপায়ী মা-বাবা অধূমপায়ী ছেলে-মেয়েদের সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই অভিজ্ঞতা অনেকেরই জানা আছে।

দরিদ্র বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যক্রমে ধূমপানের হার বেড়েই চলেছে। বিত্তবান, শিক্ষিতের মধ্যে এর হার যেমন কমতে শুরু করেছে, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে গরিরেব মধ্যে এর হার বেড়েই চলেছে। অশিক্ষিত জনসাধারণের অনেকেই জানে না ধূমপানের কুফল কত মারাত্মক হতে পারে। ধূমপায়ী মা-বাবা কোলের শিশুকে অযত্নে কিভাবে বিষপান করিয়ে চলেছে তা তাঁদের ধারণার বাইরে। অন্যদিকে স্বল্প আয়ে যেখানে খাবার নিয়ে টানাটানি, সেখানে সিগারেটের ধোঁয়ার পিছনে টাকার অপচয় নিঃস্ব গরিবের পুষ্টিহীনতার এক প্রধান কারণ। এছাড়া গ্রামেগঞ্জে ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার আমাদের দেশে আরেক দুঃখজনক পরিস্থিতি। জর্দা, তামাক, গুল, পানের মশলা, তামাকের পাতা (সাদা পাতা) ইত্যাদির ব্যবহার সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ বলে বিবেচিত হয়না, বরং লৌকিকতার একটা নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে মুরুব্বীদের সামনে এর ব্যবহার নির্বিঘ্নে চলে। গ্রামে কারও বাড়িতে গেলে আর কিছু না হোক, পান-সুপারী সাদা-জর্দা দিতে না পারলে অনেকে নিজেদের অপরাধী কিংবা অসহায় মনে করে। এ সকল নিরক্ষর অসহায় জনসাধারণকে তামাকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব শুধু গণমাধ্যমের নয় — জনগণেরও। রেডিও-টেলিভিশন উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়নি এমন জনগণের সংখ্যা বাংলাদেশে বিরাট। পল্লীগীতি, লোকগীতি, জারিগান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রচলিত এবং এমন শিল্পীর পরিচয়

মেলে সামান্য উৎসাহ এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাদের মাধ্যমে জারিগান প্রচার জনগণের মনে প্রভূত প্রভাব ফেলে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা 'আধুনিক'-এর একাধিক শাখায় আছে। গেল বছর তামাকবিহীন দিবসে আমরা এ ধরনের শিল্পীদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বিচারকমণ্ডলীর মাধ্যমে আমরা পুরস্কৃত করি। বিভিন্ন জারিগানের ক্যাসেট আমরা নানা শাখায় দিতে সক্ষম হই! এগুলোর সদ্ব্যবহার হচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

স্বীকার করতেই হবে, তামাকের বিষক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিহার্য। তামাক সম্পর্কে শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেই যথেষ্ট। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে তামাকের বিজ্ঞাপনে যা-কিছু বলা হয়, তা সবই মিথ্যা। তামাক হত্যাকারী — এ সত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। গণমাধ্যমের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, সকল স্তরের জনগণের দায়িত্বও এখানে স্বীকার করতে হবে। তথ্যবহুল সংবাদ পরিবেশন করে গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো আমাদের সকলের দায়িত্ব। আর কিছু না হোক, অন্তত চিঠিপত্র কলামে সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। আপনাদের জানা তামাকজনিত দুঃখজনক ঘটনা গণমাধ্যমে প্রচার করুন। তামাকজনিত কারণে কেউ যদি অকালে প্রাণ হারায়, পরিবার যদি অসহায় হয়ে পড়ে প্রশাসনকে তা জানবার সুযোগ দিন। সবশেষে বলব, আমরা হতভাগা জাতি। তামাকজনিত ক্যানসারের কারণে আমরা দেশের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছি। এদের একজন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, অন্যজন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এস. এম. আলী। স্বীকার করতেই হবে তামাক এদের হত্যা করেছে। এতে জাতির কি অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সকলেই জানেন। আজকের দিনে আমাদের শপথ নিতে হবে — তামাকমুক্ত সমাজ চাই। তামাকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে গণমাধ্যম বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখুক।

৩১ মে ১৯৯৪ বিশ্ব তামাকবিহীন দিবস উপলক্ষে।

তিনটি দেশের রাষ্ট্রদূত ও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার উপদেষ্টার ইউএসটিসি পরিদর্শন উপলক্ষে সাদর সম্ভাষণ

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, ইউএসটিসি'র উপাচার্য, সম্মানিত প্রধান অতিথি, মালয়েশীয় হাই-কমিশনার মাননীয় আহমেদ ফুজি বিন হাজী আবদুল রাজাক, ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রদূত মাননীয় হাদী আহমেদ ওয়াইয়ারাবি আল-হাদার, নেপালী রাষ্ট্রদূত মাননীয় লোক বাহাদুর শ্রেষ্ঠা, সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, সহকর্মী ও প্রিয় শিক্ষার্থীরা।

মহান আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আজ আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। তাই তাঁর অনন্ত প্রশংসা করছি — আলহামদুলিল্লাহ্‌।

চট্টগ্রাম নগরের পৌর-পিতা (মেয়র) আমাদের মধ্যে উপস্থিত হতে পারেননি অনিবার্য কারণবশত তাঁকে এ-সময় ঢাকায় অবস্থান করতে হচ্ছে বলে। তবে তিনি আমাদের কাছে তাঁর লিখিত বক্তব্য রেখে গেছেন। তা থেকে এখানে তাঁর পরোক্ষ উপস্থিতি অনুভব করা যাবে।

একাধিক রাষ্ট্রের দূত এবং বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপদেষ্টার উপস্থিতি ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যকার সহযোগিতার ইঙ্গিত বহন করছে।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরে নানা কারণে তা কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমি মাননীয় হাই-কমিশনারকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যে-সব কারণে এই সম্পর্ক নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, সে-সবের প্রাদুর্ভাব ইউএসটিসি'তে ঘটবেনা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সবসময় অটুট থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আমি নেপালের মাননীয় রাষ্ট্রদূতের মনোভাব উল্লেখ করতে চাই। নেপালী শিক্ষার্থীদের কুশল জানার জন্য তিনি ভোর-সকালে সাগ্রহে বহুবার আমাকে টেলিফোন করেছেন।

তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি। তিনি আমার শেষ-মুহূর্তের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।

ভৌগোলিক দিক থেকে চট্টগ্রামের সঙ্গে নেপালের মিল আছে। আমি সানন্দে জানাচ্ছি, নেপালী শিক্ষার্থীরা আমার মতোই এ নগরে এসে সুখী।

বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে আমাদের গভীর ধর্মীয় বন্ধন রয়েছে। এর সঙ্গে শিক্ষা-সংক্রান্ত যোগাযোগ যোগ হলে আমাদের একতা দৃঢ়তর হবে। ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষার্থীদের আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাব।

রসূলে করিম (সঃ আঃ)—এর প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ ছিল 'ইক্‌রা', অর্থাৎ 'পড়'। ইউএসটিসি'র মনোগ্রামে আরবিতে লেখা 'ইক্‌রা' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক বলয়ে এ মহান্ নির্দেশ ছড়িয়ে দিতে প্রথম থেকেই উদ্যোগী। শুরু থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের চরিত্র আন্তর্জাতিক। এখানে ইতিমধ্যে ভারত, প্যালেস্টাইন, ইউ.এ-ই এবং নেপালের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে।

প্রথমে আইএএইচএস ও পরে ইউএসটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনাড়ম্বর ভাবে। যাহোক, ভবিষ্যতে বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, সমাজভিত্তিক কৃষিবিদ্যা, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞানের মতো অন্যান্য অনুষদ এখানে খোলা হবে।

বাইরের বিশ্বে জাপানে ও যুক্তরাজ্যে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি।

আমাদের শিক্ষার্থীদের বিশেষক্ষেত্রে গ্রহণ করার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ও কমিউনিটি মেডিসিনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহকারিতার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেছে; এ বিষয়ে নথি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা যৌথ গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেব।

এছাড়া আমরা 'নেটওয়র্ক'—এর পূর্ণ সদস্য। এজন্য 'নেটওয়র্ক'—এর বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানগুলোয় জড়িত হবার সুযোগ আমাদের আছে।

ইউএসটিসিতে বর্তমানে দু'টো অনুষদ রয়েছে ঃ এক. বেসিক মেডিকেল ও ফার্মাসিউটিকেল সায়েন্সেস্ অনুষদ ; দুই. মেডিকেল সায়েন্সেস্ অনুষদ। এগুলো ক্রমশ বিকশিত হবে। এখন সগর্বে বলা যেতে পারে বেশ ক'জন নেতৃস্থানীয় শিক্ষক এবং প্রশাসনে দীর্ঘ-অভিজ্ঞ একজন সুদক্ষ উপাচার্য বর্তমানে এখানে ব্যাপৃত আছেন। ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য তা শুভ ইঙ্গিত।

এ পর্যায়ে আমি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে কিছু বলব। এ আইনের বলে সরকারী জটিলতা এড়িয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে।

যদি একটিমাত্র কাজের জন্য বর্তমান সরকারকে প্রশংসা করতে হয়, তা হল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সূচনার মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশকে সুন্দর ও সৃষ্টিশীল রাখাই এ আইনের লক্ষ্য। এমন এক পরিস্থিতিতে ইউএসটিসি'র জন্ম।

অন্যান্য নবজাতকের মতো ইউএসটিসিও শুরুতে নানা সংক্রামক জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর প্রতিরোধ সফল হয়েছে। এখন এই নবজাতক সুস্থ-সবলভাবে বেড়ে উঠছে। তার প্রমাণ আপনারা চোখের সামনে মাত্র কয়েক বছরে বেড়ে ওঠা ভবনগুলোয় দেখতে পাচ্ছেন।

এখানে আমি সবিনয়ে অনেক সহযোগীর অবদান স্বীকার করছি।

সত্যি বলতে পক্ষ-বিপক্ষ সবার কাছ থেকে আমরা দিকনির্দেশ পেয়েছি। সমালোচকদের আক্রমণ ছাড়া আমাদের শক্তির বিকাশ সম্ভব হতো না।

যাহোক, আমি নিজেদের সর্বদোষমুক্ত মনে করিনা। বরং আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখব ইউএসটিসি'র বিকাশে অংশ নিয়ে একে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত করার জন্য।

মাননীয় দূতবর্গ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতি প্রমাণ করে আমাদের অনেক বন্ধু রয়েছে। ভবিষ্যতে এর সংখ্যা আরো বাড়বে।

আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা এসে এখানে শিক্ষাদান করবেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক্ষেত্রে গুরু দায়িত্ব পালন করতে পারে, যেমন, স্বল্পোন্নত দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান, গবেষণা-কাজ সূচিত করা, আন্তর্জাতিক শিক্ষকবর্গকে জড়িত করা, গ্রন্থ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা ইত্যাদি।

বক্তব্য শেষ করার আগে সগর্বে বলতে চাই, আইপিজিএমআর-ও আমার হাতে শুরু হয়েছিল টিনশেডে। ইউএসটিসিও শুরু হয়েছিল টিনশেডে আইএএইচএস হিসেবে। প্রত্যেক মহান পরিণতির সূচনা হয় সামান্য ঘটনায়। এটাই জীবনতত্ত্ব।

প্রার্থনা করুন আমরা যেন সফল হতে পারি।

মরহুম আবদুর রহমান সাহেবের স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সম্মানিত প্রধান আলোচক, বিশিষ্ট আলোচক বৃন্দ এবং আমার বন্ধুগণ —

আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ আমি উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই আমন্ত্রণের বিশেষ কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাইনি। যাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান তাঁর সন্তান আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষ খ্যাত অর্থনীতিবিদ। আমাদের নামের মিল হয়তো আজকের এই মহামিলনীতে আমার আসার একটি কারণ।

মরহুম আবদুর রহমান সাহেবের জীবনের বিভিন্ন দিক আমার পূর্বে বিভিন্ন বক্তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের প্রায় সকলেই এই মহাপুরুষের ছাত্র হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা অতি নিকট থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েছেন। কোনদিন তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে স্কুলে শিক্ষাকালীন পাড়া-গাঁয়ে থেকেও তাঁর নাম এবং গুণগান জানবার সুযোগ হয়েছিল। বার দু'এক তাঁর দর্শনও পেয়েছিলাম। ছাত্র হিসেবে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, ভক্তি শ্রদ্ধা জানাবার কারণে। সাথে আমার বাল্যবন্ধু এবং পরবর্তীকালে নিকট আত্মীয় এবং বর্তমানে চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবদুল ওয়াদুদও ছিলেন।

পরবর্তীকালে নানাভাবে নানাকারণে তাঁর সান্নিধ্যে আসার বার বার সুযোগ এসেছে। বস্তুত আমি তাঁর পরিবারের একজন হিসেবেই গণ্য হয়েছিলাম। যতটুকু মনে পড়ে তাঁর গ্রন্থিত বইটিতে তিনি আমাকে অত্যন্ত আপনজন বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই বিশাল পুস্তক রচনা করে তিনি এক অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। বর্তমান বাজারে এটা পাওয়া যায়না। এই পুস্তকের পুনঃপ্রকাশনা এবং বাজারজাত করলে নুতন প্রজন্মের কাছে একটা মূল্যবান সম্পদ হিসেবে প্রমাণিত হবে।

উৎসাহের অভাবে নয় সময়ের কারণে বইটি উপহার হিসেবে পেয়ে থাকলেও পুরোপুরি এর সৎব্যবহার করতে পারিনি। তবুও যতটুকু সম্ভব পড়তে চেষ্টা করেছি। তার উপর ভিত্তি করে এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সামনে এই ব্যক্তিত্বের জীবনের কয়েকটা দিক তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

১৯১৮ সালে তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। এই সুখবর পাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর পিতার কপালে জুটেনি । ফল প্রকাশের দশদিন আগে তিনি

এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়। রহমান সাহেবের আর্থিক সংগতি ভাল ছিলনা। পিতা রেঙ্গুনে ব্যবসা করে সফলতা অর্জন করতে পারেননি। ছাত্র অবস্থায় বিবাহসূত্রে বন্ধন অনেকটা এ কারণেই হয়েছিল। চাচার উৎসাহ এবং আর্থিক সাহায্যে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। বিষয় ছিল অংক, বাংলা, আরবি।

১৯২৩ সালে মুসলিম হলে এক সাহিত্য সভার আয়োজনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এর আগে এই ধরনের সভা সমাবেশ কোথাও হয়নি। এখানেই সাহিত্য পরিষদ গঠন করার প্রথম প্রস্তাব করা হয়। তাঁর কবিতা লেখার প্রবণতা কিছু লোকের জানা ছিল। এই সভায় তাই উদ্বোধনী কবিতা লিখতে তাঁকে অনুরোধ করা হয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রহমান সাহেবের স্বরচিত কবিতা শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, অনেকদিন এমন প্রাণ দিয়ে লেখা, প্রাণ দিয়ে পড়া কবিতা শুনি নাই।

বাঙ্গালী মুসলমানের রক্ত ধারায় ফার্সী কবি রুমীর এবং কালিদাস, বিদ্যাপতির রক্তধারাও এসে একত্রিত হয়েছে। এ কথাটা এমন করে আগে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কবি হিসেবে এটা ছিল তাঁর প্রথম পরিচিতি। পরবর্তীতে তিনি বহু কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর স্মৃতিকণা।

অংক, পদার্থবিজ্ঞান এবং আরবি ভাষার তিনি ছাত্র। পরে ইংরেজীতে অনার্সসহ এম. এ পাশ করেন। তাঁর কাব্যরচনা, বিভিন্ন প্রকাশনা এবং সর্বোপরি যতটুকু মনে পড়ে গ্রন্থটি পড়লে মনে হবে তাঁর ভাষা কত সহজ সরল। রচনাভঙ্গি কত সুন্দর ।

মহাত্মাগান্ধী ১৯২১ সালে মৌলানা শওকত আলীকে নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। রহমান সাহেবের প্রবল ইচ্ছা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎকার এবং এটা সম্ভব না হলে অন্তত ভক্তি করে তাঁকে স্পর্শ করা। সে সুযোগ তিনি বহুকষ্টে করে নিয়েছিলেন অপেক্ষমান গাড়ীর দরজায়। বিরাট সমাবেশের ঠেলাঠেলিতে মহাত্মাগান্ধী যখন গাড়ীতে উঠছিলেন তাঁর হস্ত স্পর্শ করার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজ ভাষায় যা ব্যক্ত করেছিলেন তা অপূর্ব। এখানে উদাহরণস্বরূপ কিছুটা উদ্ধৃতি দিলাম।

"কি হেরিলাম! কেমন করে বলব কি হেরিলাম। সে যে অপূর্ব, বিচিত্র। সর্বংসহা পৃথিবী আপন বুকের উপর যেমন অনায়াসে যাবতীয় পদার্থের ভার বহন করেও মুসড়ে পড়ে না, বরং ফলে-ফুলে বসন্ত বাহারে বিচিত্র হাসির ছটায় মনোরম হয়ে ওঠে, দেখলাম এ ক্ষীণকায় পুরুষ-সিংহ ও তেমনি সম্পূর্ণ নির্বিকারচিত্তে তেত্রিশ কোটি নরনারীর পরিচালনভার মাথায় নিয়ে নিরুদ্বেগ হাসির ছটায় সবল মুখের ছবি উদ্‌ভাসিত করে রেখেছেন।"

মাথায় সাদা টুপি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী পরণে সাদা লুঙ্গি দেখে অনেকেই হয়তো

মনে করতেন তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান। কিন্তু জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তিনি প্রমাণ রেখে গেছেন পরম সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাহিত্য সভার কবিতায়, মহাত্মাগান্ধীর প্রতি তাঁর অটল ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তাঁর প্রকাশনায় যে মহাসত্যটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে সেটা হল শুধু পোষাকে নয় মানবিক দিক দিয়েও তিনি ভিন্ন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নয়, পরিচ্ছন্ন মনোভাবই পোষণ করতেন।

তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী বিরাট ব্যক্তিত্ব। প্রথম চাকুরীর দরখাস্তে তিনি লিখেছিলেন "আমার চেয়ে উচ্চতর কোয়ালিফিকেশনের মুসলমান প্রার্থী বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা জানা নেই। যদি না পাওয়া যায় আমি আশা করি আমাকে ঐ পদে নিয়োগ করতে মর্জি করবেন"।

জবাবে কর্তৃপক্ষ লিখেছেন চাকুরীর চাহিদা অনুযায়ী তাঁর যোগ্যতা অধিক বিধায় নিযুক্তি পত্র দেয়া সম্ভব হলোনা।

বি সি এস (বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিয়ম আছে। কোন রোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়। কিছুদিন আগে তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে দেখা গেল তাঁর প্রস্রাবে শর্করা রয়েছে। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছিলেন বেশী করে পানি খেতে। তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার আগের দিন ঠিকই তিনি পানি খেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে মিছরি মিশিয়ে সরবত করে এবং আঙ্গুরও খেয়েছিলেন। ফলে মেডিকেল পরীক্ষায় প্রস্রাবে সুগার এবং অ্যালবুমিন আরো অধিক মাত্রায় ধরা পড়ে। বিলতি সাহেব কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মেডিকেল টেষ্ট পরীক্ষায় এ কারণে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করেন। বিষণ্ন মনে দেশে ফিরার পথে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক সাহেবের সাথে তাঁর দেখা হয়। ঘটনাটি জেনে ফজলুল হক সাহেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মন্তব্য করলেন ডেপুটিগিরি একটা গোলামীর চাকুরী তাই তিনি এটা ছেড়ে দিয়েছিলেন বহু আগে। পরবর্তী জীবনে রহমান সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন কথাটি কত সত্য।

ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস ছিল তাঁর বৈশিষ্ট। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রমাণ মিলে। বস্তুত জীবন–দর্শনে তিনি পরিস্কারভাবে লিখে গেছেন। "আমি যে উত্তম পুরুষ তা শুধু ব্যাকরণের বইয়ের ক্ষেত্রে নয় জীবনের ক্ষেত্রেও আমি বিশ্বাস করতাম।" নিজ জীবনের দুঃখ কষ্টে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অর্থের অভাবে কত মেধাবী ছাত্র বিপাকে পড়ে। তাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে পড়াশুনা বন্ধ করে মাঠে নামতে হয় কায়িক পরিশ্রম করে দু'বেলা খাবার যোগাড় করতে। কত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের তিনি সাহায্য করেছেন তা শুধু নিজেই জানতেন। মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির গোড়া পত্তন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার

মোটামুটি ভাবে তাঁর উপরেই ছিল। আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের দু'একজন হয়তো জানতে পারেন তবে অনেকেই যে জানবেন না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কারণ ফলাও করে প্রচারণা চালাবার জন্য তিনি এগুলো করেননি। আমি নিজে এবং আমার সহকর্মী বর্তমানে বিশিষ্ট চর্ম ও যৌন ব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক (ডাঃ) আবদুল ওয়াদুদ তাঁর কাছে চিঠি লিখে আমাদের আর্থিক অনটনের কথা জানালে মাসিক ১৫ টাকা হারে এডুকেশন সোসাইটি থেকে এক বৎসরের বৃত্তি মঞ্জুর করেন। বর্তমানে এই টাকা যৎসামান্য মনে হলেও এর মূল্য তখনকার দিনে ছিল অনেক বেশী। সূত্র থেকে আরো সাহায্য না পেলে আজকে আপনারা যাঁকে প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মান দেখিয়েছেন তাঁর অবস্থান হয়তো ভিন্নতর হতো। দুঃসময়ের এ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে অনুকরণ এবং তাঁর আদর্শ অনুশীলন শুধু আমার নয় সকলেরই কর্তব্য বলে মনে করি।

শিক্ষকতাকে তিনি জীবনের পেশা নয় নেশা হিসাবেই নিয়েছিলেন। আগেই বলেছি তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার স্ত্রী এবং তাঁর দু'ভাই চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুলে তাঁর শিক্ষকতাকালে লেখাপড়া করত। স্ত্রীর মুখে তাঁর আদার যত্ন ভালবাসা এবং আন্তরিক উপদেশের কথা অনেক শুনেছি। যুদ্ধকালীন সময়ে এই স্কুল চট্টগ্রামের বাইরে কোথাও স্থানান্তরের প্রশ্নে উঠলে তিনি তাতে বাধা দেন। শহরেই নিরাপদ স্থানে পাঠ্যক্রম চালাতে থাকেন। এ সময়ে চট্টগ্রামের মত বন্দর নগরীতে নিরাপদ স্থান যে সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারেনা সেটা জেনে শুনেও তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন ছাত্রদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে। ১৯৪৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের সেকেণ্ড ইন্সপেক্টর অব স্কুল পদে নিযুক্ত হন। ফলে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের সমাপ্তি হয়। এই পদোন্নতিতে অনেকেই হয়তো খুশী হতেন কিন্তু তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন "ফুল বাগানের মালির পদ ছেড়ে অরণ্যের প্রহরী বনে গেলাম।"

তাঁর রচিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'কোরান ও জীবন দর্শন' তাঁর এক বিশেষ অবদান। পবিত্র কোরআনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এর বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন হতে বাধ্য। কোরআন যে সর্বকালের অবিসংবাদিত অপরিবর্তনীয় তাঁর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীতে যে মাতৃদুগ্ধ সম্বন্ধে আমরা গণ মাধ্যমে বারংবার প্রচারণা চালাই অনেকে মনে করতে পারেন এবং কেউ কেউ বলেও থাকবেন এটা সাম্প্রতিক কালের গবেষণার ফসল। ১৮ মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিত এবং শিশুদের জন্য মায়ের দুধই শ্রেষ্ঠ সকলের জানা

উচিত পবিত্র কোরআনে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৪০০ বছর আগে পবিত্র কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে সকাল-সন্ধ্যা গণ মাধ্যমের প্রচারণা কান ঝালাপালা করে তোলে। মাঝে-মাঝে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয় তা নগণ্য। শ্রদ্ধেয় আবদুর রহমান সাহেব এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানকে সামনে রেখে যুগের পরিধিতে কোরআনের নির্দেশ নামার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন ইসলাম পরিবার পরিকল্পনার স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন বার বার নানাভাবে। আমি আশা করব তাঁর এই প্রকাশনা গণমাধ্যমে প্রচারিত হবে। এতে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে -এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শারীরিক অসুস্থতা তাঁর চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করলেও তাঁর তীক্ষ্ণ চিন্তা ভাবনার গতি প্রতিহত করতে পারেনি। যখনি অপ্রত্যাশিতভাবে সকাল কিংবা সন্ধ্যা বেলায় তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছি, তাকে দেখেছি কয়েকজন লোক নিয়ে কোন একটা বিশেষ বিষয়ে হয়তো আলোচনা করছেন। না হয় ডিকটেশন দিচ্ছেন। দেখা মাত্রই তাঁর মুখের হাসির কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করার কোন দুর্ভাগ্য আমার হয়নি।

আগেই বলেছি আমি বলতে গেলে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য হতাম। পারিবারিক জীবনে তাঁকে অতি কাছে থেকে দেখবার আমার সুযোগ হয়েছে বহুবার। তাঁকে দেখেছি পরিবারের আপোষহীন শাসক রূপে। আবার দেখেছি সোহাগ করে সকলকে কাছে নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে। বস্তুত তাঁরই স্নেহ ভালবাসার প্রতিদান তিনি যেভাবে পেয়েছেন তার তুলনা মিলেনা। তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র নজরুল ইসলাম জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত যেভাবে তাঁর সেবা করেছেন স্বচক্ষে না দেখলে বর্তমান যুগের পারিবাবিক সম্পর্কের যে অবক্ষয় তাতে অনেকেরই বিশ্বাস করা সহজ হবে না। ভালবাসা দিয়ে কিভাবে মনজয় করা যায়, শাসন করা সহজ হয়ে উঠতে পারে, পারিবারিক সম্পর্ক কত মজবুত হতে পারে তার প্রমাণ তিনি স্বচক্ষে দেখে গেছেন । আমি ছাড়া আরও অনেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

সবশেষে বলবো শ্রদ্ধেয় আবদুর রহমান সাহেব আমাদের জন্য কর্তব্য নিষ্ঠার, সততার, আত্মবিশ্বাসের, সহিষ্ণুতার এবং স্নেহভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর জীবন এবং প্রকাশনা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান পেলে দেশ ও জাতির মঙ্গল হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

চট্টগ্রাম পরিষদ কোলকাতায় প্রধান অতিথির ভাষণ

শ্রদ্ধেয় প্রশান্তবাবু,* কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব জাহাঙ্গীর সাদাত, চট্টগ্রাম পরিষদের ভাইবোনেরা এবং বন্ধুগণ,

আপনাদের আমন্ত্রণে আজ এখানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে প্রথম কলকাতায় এসে দেখেছিলাম উঁচু দালান, মোজাইক করা বাথরুম, বড় বড় রাস্তা। গ্রাম থেকে এসে মনে হয়েছিল কি এক আজব জায়গায় এলাম। আজ আপনাদের মাঝখানে এসে কলকাতাকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে দেখতে পেলাম। মনে হল যেন আমার নিজ শহর চট্টগ্রাম। আমার অনুভূতি আপনাদের সামনে কতটুকু সার্থকতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারব জানি না, তবে চেষ্টার ক্রটি হবে না।

আমার বক্তব্যে সামঞ্জস্য খুঁজে না পেলে ক্ষমা করবেন। বিক্ষিপ্ত হলেও আমি যে সকল ঘটনাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি তাই এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে চট্টগ্রাম আরাকান ও পঁগার রাজাদের শাসনাধীন ছিল। দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তীকালে আরাকানরাজ বৌদ্ধের প্যাগোডা প্রতিষ্ঠা করে। এই সময়ে চটগ্রাম থেকে বৌদ্ধমূর্তির সেবক এবং দাসরূপে চট্টগ্রামের হিন্দুরা সেখানে আগমন করে।

১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিকার সন্ধানে চট্টগ্রামের মুসলমানরা আরাকানে বসতি স্থাপন করে। প্রায় ৩৫০ বছর পর ১৭৮৫ সালে বর্মী রাজার নির্যাতনের ফলে লক্ষাধিক আরাকানী চট্টগ্রামে ফিরে আসে।

ইংরেজ আমলে হাজার হাজার চট্টগ্রামবাসী কাজের সন্ধানে এবং জীবিকার প্রয়োজনে আরাকানে বসতি স্থাপন করে। এভাবে প্রায় ১২ লক্ষ মুসলমান এবং এক লক্ষ হিন্দু রোহিঙ্গার এক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এদের কিছু কিছু পিতৃভূমি চট্টগ্রামে ফিরে আসে, ফলে এখানেও রোহিঙ্গা গোত্রের সৃষ্টি হয়।

দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়ায় সামাজিক এবং আত্মীয়তার বন্ধন রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধের কারণে কিছুটা ব্যাহত হলেও বিলুপ্ত হয়নি।

সাম্প্রতিককালে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আগমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা। বিশ্ব জনমতের চাপে তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা সফল হয়নি।

ঐতিহাসিক আবদুল হক-এর মতে — "বর্মী সরকার ১৯৭৮ সালে আরাকানে

---

* কোলকাতা সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান যাঁর কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি।

রোহিঙ্গা বিতাড়নের মধ্যদিয়ে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে তা সফল হয়নি। সম্ভবত তাই দুদেশের সরকার উভয় দেশের সীমান্তরেখার আট মাইলের মধ্যে বসবাসকারী উভয় দেশের নাগরিকদের কক্সবাজার ও মংডু পরিভ্রমণ করার জন্য টেকনাফ ও মংডু চেকপোস্ট থেকে আট ঘণ্টার টুরিস্ট পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা করে। উভয় রাষ্ট্র দুদেশের নাগরিকদের জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রনীতির মারপ্যাঁচে চট্টগ্রাম–আরাকান দুটি ভিন্ন দেশ হলেও উভয় দেশের হিন্দু–মুসলিম ও আরাকানী, রাখাইন ও মারমা জনগোষ্ঠীর সুপ্রাচীন রক্তের সম্পর্ক ও ইতিহাস অভিন্ন।"

আগেই বলেছি, প্রথম জীবনের পড়াশুনা আমার গ্রামে। কোলকাতায় আসি ম্যাট্রিক পাশ করার পর। তারপর দেশবিভাগের পরেও এখানে থাকি বেশ কয়েক বছর। ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় চাকরিতে যোগ দেই। ছাত্র জীবনে দেশবিভাগের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হানাহানি আমার স্বচক্ষে দেখা।

বাইরের পরিস্থিতি কোলকাতায় একজন মুসলমান হিসাবে আমার জন্য যতই বিপজ্জনক ছিল না কেন, মেডিকেল কলেজের ভিতরে আমাদের সম্প্রীতি ছিল অটুট। কোন এক সাম্প্রদায়িক সংগঠনের ব্যাচ ধারণকারী একজন নেতা গোছের লোক দাড়িওয়ালা আমার এক মুসলমান সতীর্থকে অপমান করতে চাইলে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পঞ্চানন চ্যাটার্জী ঘৃণার স্বরে বলেছিলেন, — 'এটা হাসপাতাল। রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান এখানে নেই।' কথাগুলো এখনো কানে ভেসে আসে। আত্মীয়স্বজন দেশবিভাগের পরে পরেই সবাই চলে যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আমরা ছিলাম পাঁচজন। বাকি বিশজন ঢাকায় চলে আসে। আর চট্টগ্রামের হিন্দুছাত্র ছিল আমাদের সাথে একজন।

সারাদিন পড়াশুনা করে বিকাল বেলা কলেজ স্কয়ারে বেড়াতে যেতাম। অবশ্য পরিবেশ সুন্দর ছিল, লোকজন থাকত কম। বর্তমান প্রজন্মের অভিজ্ঞতা দিয়ে তখনকার কলেজ স্কয়ারকে কল্পনাও করা যাবে না। সে যাই হোক, এই স্কয়ারের চারিপাশে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দেখতে পেতাম চট্টগ্রামের কয়েকজন লোক আমার মতই চারিদিকে টহল দিচ্ছে। তাদের পরিচয় ছিল একটি — সেটা আমাদের আঞ্চলিক ভাষা।

আমাদের বদনাম আছে, আবার অনেকে হিংসা করে বলে, দুজন চাটগাঁইয়া একসাথে হলে তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলে। এ ভাষার মাধুর্য নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। লেখালেখি হয়েছে। আমি বলবো সে একটা দিক। আমার বিবেচনায় এবং অভিজ্ঞতায় এ ভাষায় স্বকীয়তা আছে, আত্মীয়তার টান আছে,

পরিচয়ের সুযোগ আছে। কলেজ স্কয়ারে এই ভাষার মাধ্যমে বহুদিন বহু লোকের সাথে এমনি করে আমার পরচিয় হয়।

মাত্র কয়েক বৎসর আগে রাতের অন্ধকারে আমার স্ত্রীকে নিয়ে রেঙ্গুনে বাইরে থেকে হোটেলে ফিরছিলাম। আমার পরনে ছিল আজকের মত বিদেশী পোশাক। স্ত্রী অবশ্য শাড়িই পরেছিলেন। হঠাৎ দেখি রাস্তায় দুজনে মিলে তর্কাতর্কি, গালাগালি করছিল চাটগেঁয়ে ভাষায়। নিজেকে তখন সামলাতে পারিনি। আমি একই ভাষায় তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে পরিচয় জানতে চাইলাম। তারা লজ্জা পেল। ঝগড়া মিটে গেল। আমাদের পরিচয় হলো।

বছর দুয়েক আগে, নিউইয়র্ক-এ চট্টগ্রাম সমিতির আমন্ত্রণে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দেই। আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে চট্টগ্রামবাসীর আগমন। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে আঁচ করতে পেরেছিলাম কেউ কেউ অঞ্চলভিত্তিক, কিংবা জেলাভিত্তিক সমিতি গঠনের বিরোধী। এই ভাবনার বিপক্ষে আমি মন্তব্য করেছিলাম — 'কয়েকটি বাড়ি নিয়ে পাড়া হয়, পাড়া নিয়ে গ্রাম, গ্রাম থেকে থানা, থানা থেকে জেলা যেমন হয়, তেমনি সৃষ্টি হয় দেশ থেকে মহাদেশ। এদের প্রত্যেকের ভৌগোলিক সীমারেখা আছে। আঞ্চলিক বিশেষত্ব আছে। বহুক্ষেত্রে ভাষার ব্যবধান আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও দেশ এবং জাতি আপন সত্তা নিয়ে টিকে থাকে। বিভেদের মাঝখানে এই এক মহামিলন। চট্টগ্রাম সমিতির অস্তিত্ব অন্য সমিতি গঠনের পথে বাধাস্বরূপ না হয়ে যদি উৎসাহের সঞ্চার করে, সেটা হবে সামাজিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ।' কথাগুলো বলার পর দর্শকদের হর্ষোৎফুল্ল করতালি এই মহাসত্যের সমর্থন প্রমাণ করেছিল।

বেশ কয়েক হাজার সদস্য নিয়ে এই সমিতি এখন অনেক সামাজিক কর্মে নিবেদিত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাংলাদেশী, ভারতীয়, পাকিস্তানী কিংবা বিলাত-আমেরিকার — যেখানকারই নাগরিকত্ব থাকুক না কেন, চট্টগ্রামের বাসিন্দা হিসাবে সকলের সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য স্বচক্ষে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে তাঁদের দানসামগ্রী বিতরণ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। আরেকটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে চট্টগ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সুফল এই সমিতি, আজকে যেখানে আমার উপস্থিতি।

নিউইয়র্ক-এর চট্টগ্রাম সমিতি আর আপনাদের এ সমিতি বা সংসদের কিভাবে তুলনা করব জানি না। তবুও স্বীকার করতে হবে আমাদের ব্যবধান মূখ্যত রাজনৈতিক। ভৌগোলিক দূরত্ব বলতে কি যে বলব ভেবে পাই না। ঢাকার বর্তমান বাসিন্দা হিসাবে নিজ জেলা চট্টগ্রাম যেতে আমার যে সময় লাগে, আপনাদের মাঝে আসতেও লেগেছে একই সময়। যানবাহনটাও একই ধরনের। আমাদের ভাষা

সম্বন্ধে তো প্রশ্নই উঠে না। আমাদের নিজস্ব ভাষা আছে — আঞ্চলিক ভাষা। আমি বলব, আমাদের মাতৃভাষা। নতুন প্রজন্ম এটা স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তবে আমরা যারা চট্টগ্রামের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে কয়েক যুগ কাটিয়েছি, আমাদের জন্মলগ্নে মায়ের মুখে যে ভাষা শুনেছি, সেটা আমাদের শুধু আঞ্চলিক ভাষা নয়, আমাদের মাতৃভাষা।

বাংলা একাডেমীর এক সম্মেলনে বলেছিলাম, 'স্বীকার করতেই হবে, যে ভাষা আমি জীবনে প্রথম শুনেছি আমার মায়ের মুখ থেকে সেটাই আমার মাতৃভাষা। সে হিসাবে আমার মাতৃভাষা চাটগেঁয়ে আর জাতীয় ভাষা বাংলা।'

আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান একটা আঞ্চলিকতার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং আন্তরিকতা, আত্মউপলব্ধি এবং জন্মস্থানের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। এই উপলব্ধি রাজনীতির বহু উর্ধ্বে। আমরা সকলেই যেভাবেই হোক না কেন রাষ্ট্রনীতির আওতায়। তাতে সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। সে নিয়মের প্রতি নিঃসন্দেহে আমরা শ্রদ্ধাশীল কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য এ সবের উর্ধ্বে। এখানে কোন বাধাবন্ধন নেই।

আরাকানের বিতাড়িত রোহিঙ্গা এখন বসতি স্থাপন করেছে বাংলাদেশে এবং মায়ানমারে। আত্মীয়স্বজন উভয় দেশেই। আপনাদের অনেকের আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশের অধিবাসী। দুটো অবস্থার কিছুটা তুলনা মেলে।

আঞ্চলিক ভাষা আমাদের অন্যতম সেতুবন্ধন। একে সুদৃঢ় করার সুযোগ আছে সামাজিক এবং পারিবারিক সেতুবন্ধনের মাধ্যমে। উত্তরোত্তর এই সম্পর্ক দৃঢ় হোক, আমি তাই কামনা করি।

ভ্রাতৃত্ব এবং নামের সম্পর্ক অথবা একটার উপর আরেকটার প্রভাব কতটুকু জানা নেই। সে যাই হোক, চট্টগ্রামের নামের উৎস যেখান থেকেই হোক না কেন, মনে হয় এর প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। বহু পরিব্রাজক এবং পণ্ডিত এ অঞ্চলকে নানা নামে অভিহিত করেছেন। এর সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। পীর বদর শাহের আগমনকে উপলক্ষ করে বলা হয়ে থাকে তাঁর হাতে জ্বালানো একটি চাঁটি বা মাটির প্রদীপে পুরো শহরটি আলোকিত হয়েছিল বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছিল চাঁটিগাঁও। অপরদিকে বৌদ্ধদের মতে তাদের অনেক চৈত্যের অর্থাৎ মন্দিরের এখানে অবস্থান ছিল বলেই এর নাম হয়েছিল চৈত্যগ্রাম। পরবর্তীকালে তা রূপান্তরিত হয়েছিল চট্টগ্রাম নামে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চট্টগ্রাম নামে কিছুই ছিল না। ৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানের রাজা দ্বিগ্‌বিজয়ে বের হন এবং কুমিরার দক্ষিণ দিকে এসে একটি পাথরের বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। তাতে খোদিত ছিল 'চিৎ-তৌং-গৌং।' এর

অর্থ হলো — যুদ্ধ করা উচিৎ নয়। এখান থেকেই পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম শব্দের উৎপত্তি বলে অনেকের বিশ্বাস।

যুগে যুগে যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, বহু রাজা-বাদশা এদেশ শাসন করেছে। এদের কেউ এ অঞ্চলে ছিল না। আরাকান, সমতট, পাল, তুর্কী, পাঠান, সুলতান, মোঘল বাদশাগণ দ্বারা চট্টগ্রাম শাসিত হয়েছিল। ফলে চট্টগ্রামের ইতিহাসে ধারাবাহিকতা ছিল না। একক ইতিহাসের সন্ধান এখানে মিলে না, তবুও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় শতাধিক বছর ধরে। এতে অনেক তথ্য পাওয়া গেলেও একটি পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা এখনও সম্ভব হয়নি।

দেশবিভাগের দু'বছর আগে 'চট্টগ্রাম ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি' হয়েছিল কোলকাতায়। সভাপতি ডঃ বেণী মাধব বড়ুয়া আর সম্পাদক ডঃ বি বি দত্ত। সদস্য ছিলেন ডঃ কালীকারঞ্জন কানুনগো, ডঃ জ্যোতীন্দ্র মোহন চৌধুরী এবং ডঃ বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী। দেশবিভাগের পর এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এ প্রচেষ্টা শুরু হয়, তবে এর সুফল আমরা এখনও পাইনি।

আমি আশা করবো সকলে মিলে এ প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। একটা সঠিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। অবশ্য এতে উভয় দেশের শীর্ষস্থানীয় চট্টগ্রামবাসীদের অবদান থাকতে হবে, নইলে হয়তবা এ প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'যুদ্ধ করা উচিত নয়' বলে যে নামের উৎপত্তি তার প্রভাব আমাদের মাঝখানে আজ যেন নিজ চক্ষে দেখার সুযোগ হল। অনেক বেদনাময় ঘটনা আমাদের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারেনি। আমাদের সুসম্পর্ক আজ এ অনুষ্ঠানে সুস্পষ্ট, আমরা দুই স্বাধীন দেশের বাসিন্দা হলেও আমাদের যোগসূত্র সুদৃঢ়। আমাদের রাজনৈতিক ব্যবধান আছে। সামাজিক দৃষ্টিকাণ থেকে আমরা এক ও অভিন্ন। আমরা সকলেই চট্টগ্রামের অর্থাৎ চাঁটগাইয়া।

মাঝে মাঝে ভাবি, অন্টারিওতে যদি লন্ডন থাকতে পারে, আলাবামায় যদি বার্মিংহাম থাকতে পারে, সিয়েটেলে যদি ওয়াশিংটন থাকতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে চট্টগ্রাম থাকার স্বপ্ন কি একটা দুঃস্বপ্ন? এ চিন্তাধারা কোন রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ নয়, আমার নিজস্ব অনুভূতি। ঐতিহাসিক বিবেচনায় চট্টগ্রাম অনেক গৌরবের অধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান সকলের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের সম্প্রীতির বন্ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এ আশা রাখি।

দমদম, কলকাতা ৮. ১. ৯৫ইং।

বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথির ভাষণ

বাংলাদেশ দর্শন সমিতির আমন্ত্রণে আমি সহজে সাড়া দেইনি। 'দর্শন' শব্দটি অনেকের মত আমার অজানা কোন শব্দ নয়। মরহুম অধ্যাপক সাইদুর রহমান এবং জি. সি. দেব শিক্ষক এবং সমাজসেবী হিসাবে আমার অতি নিকটের। বস্তুত, অধ্যাপক সাইদুর রহমান অস্বাভাবিক স্মরণশক্তির এবং অকৃত্রিম স্নেহপরায়ণতার অধিকারী না হলে কলকাতা বেকার হোস্টেলে বিনা ভাড়ায় একটা আসন দখল করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। সময়মত ভুলে দরখাস্ত করিনি, তবুও তিনি আমার জন্য একটি বিছানা রেখে দিয়েছিলেন, নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটির মধ্য থেকে। আবেদনপত্র নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে আমার কিছু বলার আগেই তিনি বলে দিয়েছিলেন। আমার অবস্থা জানা ছিল বলেই তিনি তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ভুল করে আমি সময়মত দরখাস্ত করিনি, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমার আর্থিক অবস্থাও তাঁর জানা ছিল।

অধ্যাপক জি. সি দেবের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করি একটা অনুরোধ নিয়েই। যক্ষ্মা রোগীদের পুনর্বাসনের জন্য একটা আমেরিকান মঞ্জুরি পাই। ঘরভাড়া বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তার প্রায় এক–চতুর্থাংশ নিয়ে অভয়দাস লেনে ভোলানন্দ আশ্রমে সাড়ে তিন বিঘা জমি তিনি সানন্দে দান করে দিলেন। বর্তমানে এখানেই যক্ষ্মা পুনর্বাসন কেন্দ্র এখনো চালু আছে। এ প্রতিষ্ঠান সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত। যক্ষ্মা রোগীদের জন্য চিকিৎসা এবং প্রশিক্ষণ লাভের জন্য অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। ভাড়া করা বাড়ি নিয়ে কাজ শুরু করলে এর টিকে থাকা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এটা আশ্রমের অব্যবহৃত জায়গা। একটা আশ্রমের জায়গা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলেও নমুনা মূল্য নিয়ে এত সহজে দান করার আর কোনো ঘটনা আমার জানা নেই। অধিকন্তু, পাওনা পাওয়া টাকাটা নিজের আরাম–আয়েশের জন্য ব্যয় না করে দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি ফাউন্ডেশন করার উদ্দেশ্যে। জানতে পারলাম এই ফাউন্ডেশন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনো টিকে আছে।

এ দুই মহাপুরুষের দর্শনশাস্ত্রে অবদান আমার জানার কথা নয়। বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাও আমার নেই। তবুও যে প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁরা জড়িত তার প্রতি আমার কোমল মানসিকতা এবং শ্রদ্ধা অস্বাভাবিক নয়। গোড়ার কথায় যদি ফিরে যাই — পরিচিত 'দর্শন' শব্দ এবং শ্রদ্ধেয় দুইজন দার্শনিকের সাথে আমার সংস্রব

দর্শনশাস্ত্রের গভীরে যাওয়ার কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে নি। মনে কোন প্রভাবও ফেলেনি। তবে সাহসিকতা, যুক্তির মানসিকতা এবং জনকল্যাণমুখী তৎপরতা এসবের অধিকারীরূপে এ দু'জন মহাপুরুষ যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয় এবং তাই তাঁদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আমাকে দর্শন সমিতির কর্মকাণ্ডে না হলেও অনুষ্ঠানের কাছে টেনে এনেছে।

অনুষ্ঠানে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও অতিথি বক্তা হিসাবে কিছু বলবার সৎসাহস আমার আদৌ ছিলনা। অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম এবং তাঁর সহকর্মীর অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারিনি, একাধিক কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁরা আমার ছেলের শিক্ষাগুরু ; দর্শন সমিতির কর্মকর্তা হিসাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করতে গোড়াতে একটু বেগ পেতে হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়নি। শ্রোতার মনোবৃত্তি নিয়ে যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি তৈরি ছিলাম বক্তা হিসাবে আমার উপস্থিতি আমাকে বিপাকে ফেললেও জীবনে প্রথমবারের মত দর্শন শব্দটি উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ হয়েছে।

জীবনকে সুন্দর এবং সফল করে তোলাই আমাদের সকলের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মূল উপাদান জ্ঞান। জ্ঞানের মূলশক্তি শিক্ষা। শিক্ষার প্রথম স্তর অনুসন্ধান অর্থাৎ জানার প্রবৃত্তি। মূল কথা হল — শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের সহায়ক, জ্ঞান অনুসন্ধানের সহায়ক, অনুসন্ধান বিশ্লেষণের সহায়ক। বিশেষণ জ্ঞানের সীমারেখা নির্ধারণ করে বিস্তৃতির প্রয়োজনীয়তার ইংগিত দেয়। অর্থাৎ অজানাকে জানবার, অবুঝাকে বুঝবার প্রেরণা যোগায়। অবস্থান এবং লক্ষ্য এ দুটো নির্ধারণ করতে এসব কিছুরই প্রয়োজন। সত্য, সুন্দর এবং সফল জীবনযাপন করতে হলে এসবই অপরিহার্য। দর্শন আমাদের সেই নির্দেশনা দেয়। যার প্রয়োগে আমরা জীবনকে তথা পৃথিবীকে সুখময় করে তুলতে পারি।

অনেকের ধারণা এবং এককালে আমারও ছিল — দার্শনিক মানে কল্পনার রাজ্যে বসবাসকারী, বহুলাংশে যুক্তিহীন। হয়তোবা কোন কোন ক্ষেত্রে এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক নয়। শুধু দর্শনশাস্ত্র নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিয়ম আছে বলেই নিয়মকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি, এর মাহাত্ম্য বুঝি। কোন কোন দার্শনিকের ভাবনা-চিন্তাধারা ব্যতিক্রমধর্মী যদি হয় দর্শন সেখানে অপরাধী বিবেচিত হতে পারে না। বিবেচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। নিজগুণে মহীয়ান হয়।

দর্শনের জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি এবং আত্মউপলব্ধি। এই বিশ্লেষণে ধর্ম এবং দর্শনে কোন বিরোধ নেই। বাস্তবে আমরা যে রূপ দেখি তা শুধু অপসংস্কৃতি নয়, ধর্ম এবং দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই অবমাননাকর। আমরা ধর্মকে ব্যবহার করি রাজনৈতিক উপকরণ হিসাবে, নৈতিকতার বাহন হিসেবে নয়। ফলে

জনমনে ধর্ম প্রতিফলিত হয় বিকৃতরূপে। ধর্মকে যদি আমরা কর্ম হিসেবে গ্রহণ করি যে — যে যে ধর্মে বিশ্বাসী হোক না কেন এখানে সংঘাত নেই -- সকলের ধর্মের মূল উদ্দেশ্য সুখ এবং শান্তি। যে ধর্মে আমি বিশ্বাসী তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মমত, আমাদের জন্য আমাদের।" সারা বিশ্বে আজকের অশান্ত পরিবেশ, প্রতি মুহূর্তের হানাহানি, প্রতিনিয়ত জীবননাশ ধর্মের বিকৃত অনুশীলনের অনন্য উদাহরণ।

মানুষকে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলা দর্শনের ধর্ম। জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হলে নিজেকে, জীবনকে তথা পৃথিবীকে অনুসন্ধিৎসু মনে বিশ্লেষণ করে একান্তভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সে চলার পথে ধর্মই হবে অন্যতম প্রধান বাহন।

জীবনের গতিপথে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব নেই। তবে দুঃখের বোঝা কমিয়ে জীবনকে সুখময় করে তোলা দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য। জয়-পরাজয় থাকবেই, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সত্য-মিথ্যার কলহ, আলো-অন্ধকারের বিবর্তন কালের গতিতে বিলুপ্ত হবার নয় ; কিন্তু নিজের সত্ত্বাকে সমুন্নত রেখে জীবনকে অর্থবহ করে তুলে একাগ্রচিত্তে এগিয়ে চলার শপথ নিয়ে আমাদের পা বাড়াতে হবে। এ পথে বাধা-বিঘ্ন অনেক, বিপদের সম্ভাবনা সমধিক ; কিন্তু তাই বলে নিজের সত্ত্বা এবং ক্ষমতাকে ভুলে গিয়ে দায়িত্বহীনভাবে নির্লিপ্ত হয়ে সাধুতাকে অবহেলা করে আমরা যদি শঠতাকে প্রশ্রয় দেই, শৃংখলাকে পদদলিত করে বিশৃংখলাকে টেনে আনি, সুশিক্ষাকে অবহেলা করে কুশিক্ষাকে প্রশয় দেই, পুস্তককে পিস্তল এবং বইকে বোমায় পরিণত করি সেখানে জীবনের সার্থকতা কোথায়? দর্শন যেখানে ধুলায় লুণ্ঠিত জীবন সেখানে বিপন্ন।

বাংলাদেশে বর্তমানে আমরা এমন একটি পরিস্থিতিতে বাস করছি, রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন শত দলের সহস্র মতামত, শিক্ষাঙ্গনে তেমন অস্ত্রের ঝনঝনানি, ছাত্র-শিক্ষকের কলহ-বিবাদ, ধর্মশালায় অধর্মীয় কর্মকাণ্ড, এমনকি ধর্মগ্রন্থের অবমাননা যেন আমাদের নিত্য সহচর। আত্মবিশ্লেষণ, আত্মশুদ্ধি এবং ধর্মকে বাহন করে আত্মদর্শন এখনও যদি অবহেলিত থাকে জাতি হিসেবে আমরা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব তা হবে ভয়াবহ। দার্শনিক চিন্তাবিদদের সুসময়ে এর সমাধান বের করতে হবে। এ কাজ যত কঠিনই হোক না কেন দার্শনিকদের এগিয়ে যেতে হবে — নিবিষ্ট মনে সাহসিকতার সাথে সৎ পথে এগিয়ে চলার শপথই দর্শন। আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় দর্শনের মূল উৎস। আমরা সকলেই তার উপাদান। এ দায়িত্ব তাই আমাদের সকলের।

যে দু'জন পরম শ্রদ্ধেয় দার্শনিক চিন্তাবিদের কথা স্মরণ করে আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম, আবার তাদের কথাই স্মরণ করি। বর্তমানে এদের অবস্থান এমন

এক জায়গায়, যেখান থেকে কারও লাভ-লোকসান কিংবা ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। পাল্টা প্রশংসার প্রতিধ্বনিও হবেনা, তবুও তাঁদের কথা এমন একটি পরিবেশে এতদিন পরে আবার তুলে ধরার পেছনে যুক্তি কি? পরিবেশ যত পংকিলই হউক না কেন, পরিচ্ছন্নতা যত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হউক না কেন, নিজগুণে বলীয়ান হয়ে আপন সত্ত্বা বজায় রাখতে সে সক্ষম। আপনাদের সকলের প্রতি আমার অনুরোধ — ছাত্র-শিক্ষক-সমাজসেবী-রাজনীতিবিদ যাই হউক না কেন, আমাদের ভেবে দেখতে হবে, বর্তমান শিক্ষক সমাজে এমন দৃষ্টান্ত কত বিরল। ছাত্র সমাজের প্রতি আমার অনুরোধ — উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে তাদের অবদান কতটুকু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে হবে। রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ — শিক্ষা এবং সমাজকে ভিন্ন চোখে দেখে ছাত্র সমাজকে বিপথে চালালে আমাদের বর্তমান বিপদসংকুল ছাত্র সমাজ দুঃসহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। রাজনীতির প্রতি তাদের স্বভাবগতভাবে আকর্ষণ কিংবা অনুরাগ থাকবে, তবে শিক্ষাকালীন সময়ে রাজপথের দিকে তাদের আকর্ষণ বাড়াবার প্রয়াস প্রতিহত করতে হবে। এ দায়িত্ব সকলের।

৩১শে মার্চ ১৯৮৯ ইং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে আমার বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"বিশ্বাস আর সাহস এ দুটো নিয়ে আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকা প্রকৃতির সনাতন ধর্ম। বরফে ঢাকা সাইবেরিয়া থেকে সাহারা মরুভূমিতে সৃষ্ট জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে জীবনযাপন করে। পরিবেশ যতই প্রতিকূল হউক না কেন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের বেঁচে থাকার মত বাঁচতে হবে — সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক দিক দিয়ে পরনির্ভরশীল, পরজীবী হিসেবে নয়, স্বাধীন, সার্বভৌম জাতি হিসাবে। জীবন থাকতেও আমরা যেন মরে না যাই। আজকের শপথ এগিয়ে চলার, আত্মশুদ্ধির, অনুশোচনার এবং পরিশোধনের — পরিতৃপ্তির নয়।"

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে গুণীজন ও কৃতি সাংবাদিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি জনাব মুহম্মদ ইদ্রিস, বিদায়ী সভাপতি জনাব আক্তার উন-নবী, সাধারণ সম্পাদক জনাব হেলাল উদ্দীন চৌধুরী, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আজকে আপনারা আমাকে যে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গুনীজন হিসাবে সংবর্ধনা পাবার সুযোগ এর আগে আমার বহুবার হয়েছে। তবে আজকের সংবর্ধনা ব্যতিক্রমধর্মী, আমার জন্য গৌরবের। বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সহিত আমাকে সম্পৃক্ত করে আপনারা আমাকে অধিক সম্মানিত করেছেন।

সাংবদিকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দু'এক বছরের নয়। বহু যুগের। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কাছাকাছি। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর হবে।

১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান যক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকরূপে আমি প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করি ঢাকায়। পর দিন বড় বড় হরফে প্রতিটি সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম শিরোনাম ছিল আমার বক্তব্য।

"পূর্ব পাকিস্তানে বৎসরে ৯০ হাজার লোক যক্ষায় প্রাণ হারায়" এ সংবাদ জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাংবাদিকদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গোড়া পত্তন হয় এখানে। কালের গতিতে অনেকে আমার সংস্পর্শে আসেন নানাভাবে। কেউ যক্ষা সমিতির সদস্য রূপে কেউ বা এর কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে, আর কেউ বা রোগী হিসাবে। নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকার ফলেও তাদের সাথে মেলামেশা করার সুযোগ হয় আমার প্রচুর। ফলে এ মহলে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। অনেকের সাথে খোলামেলা আলোচনা এ পেশাকে বিশেষভাবে জানবার সুযোগ দিয়েছে। তারই আলোকে আজকের এই সুযোগে স্বল্প পরিসর সময়ে যতটুকু সম্ভব কিছু তথ্য তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

সংবাদ একটা সংস্কৃত শব্দ। 'সং' মানে 'সম্পূর্ণ' বাদ মানে 'বলা'। অর্থাৎ সংবাদ মানে সম্পূর্ণ বলা। অতএব সাংবাদিক মানে যারা সম্পূর্ণ বলেন, একটু পরেই হয়ত এই দায়িত্ব পালনের নানা দিক আলোচনা করার সুযোগ পাব। সাংবাদিক মানে সম্পূর্ণ বলা হলেও এ বলার পথ নিস্কণ্টক নয়। এখানে বাধা আছে অনেক, এর চারিদিকে অনেক সন্ত্রাস, যে সন্ত্রাস রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আরো বহুরূপের। এতদ্‌সত্বেও আমাদের দেশে এমন সাংবাদিক আছেন যাদের

অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়নি। যাঁরা বিপদ দেখে ভুল পথে চলে যান নি। লোভের বশে নীতি বিসর্জন দেননি। এহেন ব্যক্তি বর্গের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা সফল নীতিবান পাঠকের।

পাঠক হিসাবে আমরা নানান রূপে সাংবাদিকদের দেখতে পাই। যুদ্ধের সময় দেখতে পেয়েছিলাম "ওয়ার রিপোর্টার," অর্থাৎ যুদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদদাতা হিসাবে। আবার দেখতে পেয়েছি মেডিকেল রিপোর্টারকে চিকিৎসা সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করতে। সংবাদদাতাকে আরো অনেক রূপে দেখার সুযোগ হয়েছে। যেমন ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা বিষয়ক ইত্যাদি। নানা বিষয় ভিত্তিক সংবাদ পরিবেশক হিসাবে। এদেরকে এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী হিসাবে গণ্য করা যায়। অবশ্য অনেকে পারদর্শী না হয়েও যে এ কাজ করেননা তা নয়। যেমন একটা বিশেষ ঘটনা এখানে তুলে ধরি।

খবরের কাগজে বড় বড় হরফে লেখা হলো "জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এন্টারোভায়োফরম এর অভাবে অকালে প্রাণ নাশ   অঞ্চলে ডিসেন্ট্রির প্রকোপ বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, এন্টারোভায়োফরমের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু কমপক্ষে তিন জন লোক অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।"

এ সংবাদ পরিবেশনের ফলে এ বিশেষ ঔষধটির জনপ্রিয়তা সাথে সাথে বেড়ে গেল। কালবাজারীদের কপাল খুলে গেল। আর ঔষধ কোম্পানীর তো কথাই নেই।

আসলে সংবাদটি কি সত্য? মোটেই না। এটা নিছক মিথ্যা প্রচার। এন্টারোভায়াফরম একটা নিষিদ্ধ ঔষধ। এর বিষাক্ততার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

যে ঔষধের অভাব হলে জনগণ তার বিপদ থেকে মুক্ত হয়। সেটাকে মহৌষধ হিসাবে প্রমাণ করার প্রয়াসে হয়তো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোন ব্যবসায়ী মহল নানা কৌশলে এ সংবাদ পরিবেশনায় ইন্ধন যুগিয়েছে।

অবশ্য এজন্য আমি সাংবাদিকদের দোষারোপ না করে অজ্ঞ চিকিৎসক যিনি এন্টারোভায়াফরম এর বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি জানেন না। অথবা সুচতুর কোম্পানী যেটা এ ঔষধকে জিকিয়ে রাখতে চায় এই দুই গোষ্ঠীর একজন অথবা উভয়ই সংবাদদাতাকে প্রতারিত করেছেন।

আমার এ কাহিনী বলার উদ্দেশ্য সাংবাদিকদের হেয় করা নয়। তবে অসাবধানতার ফলে কি রকম বিপর্যয় ঘটতে পারে তার একটি উদাহরণ দিলাম।

খবর পরিবেশন করে সাংবাদিকরা সব সময় সুনাম কিংবা দুর্নামের ভাগী হন তা নয়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। ভোর বেলায় খবরের কাগজ হাতে নিলেই প্রথমেই চোখে পড়ে নানা সন্ত্রাস,

প্রাণহানির খবর। অনেক ক্ষেত্রে করুণ ছবি সহ কাগজের প্রথম পাতায়। এ সব সন্ত্রাসীদের খবর পরিবেশন করা কত যে বিপদজনক তা সহজেই অনুমান করা যায়। এদের কবলে পড়ে সাংবাদিকদের প্রাণনাশের ঘটনা অনেকেরই জানা।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিচার করতে গেলে আমার পূর্বসুরী কৃতি সাংবাদিকগণ যে করুন দৃশ্য তুলে ধরেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দিন রাত পরিশ্রম করে নানা বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়ে এ পেশায় যারা নিবেদিত তাদের জীবনযাত্রার মান দায়িত্বের পরিমাপে শুধু দুঃখজনক নয়, এটা জাতির জন্য লজ্জাজনক ব্যপারও বটে।

সাংবাদিকদের মধ্যে সকলেই সৎ, নীতিবান এমন কথা বলি না, বস্তুতঃ কোন পেশার ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না, তবুও বলব অভাব মানুষের স্বভাবকে যে কোন মুহূর্তে দুর্বল করে দিতে পারে। বিত্তবান কিছু লোক বিশেষ করে রাজনীতিবিদরা এ সুযোগ গ্রহণ করে। কিছু না কিছু সাংবাদিককে ভুল পথে পরিচালিত করে।

আমরা দেখেছি বৈদেশিক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিরূপে একই দিনের একটা ঘটনা কেমন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে বিদেশ থেকে প্রচারিত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে। দেশের ভিতরে আমরা দেখেছি আগের দিনের যে ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটে গেল পরের দিন সকালে ভিন্ন ভিন্ন কাগজে তা কি ভাবে নানা রূপ নিল। সামাজিক এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রভাব এ প্রতিপালনের পিছনের শক্তি। তবে সাংবাদিক এখানে প্রকৃত দোষী নাও হতে পারে। আবার না হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি হয়তো সত্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন। কিন্তু তা পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ নিয়েছে। মালিকের মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে, আমার এক বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধু দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে বলেছিলেন — "এমন এক চাকুরি করি যেখানে মনের কথা মুখে বলতে পারি না, কলম দিয়া লিখতে পারি না।"

নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এ পেশায় সৎ, নির্ভিক এবং নিবেদিত প্রাণ লোক না থাকলে আজকে হয়তো আপনাদের এ অনুষ্ঠান করাও সম্ভব হতো না। চিকিৎসক হিসাবে বেশ কয়েক জন বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আমার হয়েছে। মরহুম আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরী, খন্দকার আবদুল হামিদ, তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) এদের সকলকেই চিকিৎসক হিসাবে দেখার এবং পাঠক হিসাবে জানার সুযোগ আমার হয়েছে। তাদের দেখেছি একজন সাংবাদিক কিংবা সম্পাদক হিসাবে শুধু নয়, কলাম লেখক হিসাবেও। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ঐ সংবাদ পত্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা নীতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একজন কলাম লেখকের মতামত আদর্শ এবং চরিত্র প্রতিফলিত করার সুযোগ ঘটে কলামের মাধ্যমে। সে জন্য আমরা দেখতে পাই সম্পাদক আবদুস সালামের

চেয়ে কলাম লেখক আবদুস সালামের সম্মান অনেক বেশী। তার পরিচয় পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদকীয়তে নয় ; তার লেখা পলিটিক্যাল সিন 'রাজনৈতিক অপরাধ' সিরিজে।

সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর চেয়ে একই ব্যক্তির 'দরবারে জহুর' অনেকের প্রিয়, অধিক সম্মানিত। ইত্তেফাক-সম্পাদক মানিক মিয়ার চেয়ে 'মুসাফির' রূপে মানিক মিয়া অধিক সম্মানিত। সাংবাদিক খন্দকার আবদুল হামিদের চেয়ে 'স্পষ্টভাষী' অধিক সম্মানের অধিকারী।

আজকের এ অনুষ্ঠানে এবং পূর্ববর্তীতে যে সকল সাংবাদিককে আপনারা সম্মানিত করেছেন তারা সকলেই এ সমস্ত গুণের অধিকারী এবং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে হয়ত কিছুটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলেও দু'একটি কথা তুলে ধরতে চাই। পরিচিতি পর্বে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকার করি এ উদ্যোগে আমার অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তবে একাজ আমার একার নয়, অনেকের সহযোগিতার সুফল। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এ প্রতিষ্ঠান আমার একার নয়। আমাদের সকলের। আজকের এই সুযোগে আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ এ প্রতিষ্ঠানের গলদ যদি নজরে আসে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হলে আমি মনে করবো আপনারা এর মংগল চান। তেমনি এর অগ্রগতি যদি আপনারা পাঠকের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরেন যারা এ প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত তারা সকলেই উৎসাহিত হবেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনাদের পথ নির্দেশনা এই প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

এবার আবার আপনাদের দিকে ফিরে যাই এবং শেষ কথাটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। যে পেশায় আপনারা নিয়োজিত তার দায়িত্ব অপরিসীম। সমাজ গঠনে এর ভূমিকা বিপুল। দুই ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে একত্রিত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির শক্ত হাতিয়ার আপনাদের কাগজ এবং কলম। বিপদ যতই ভয়ানক হউক না কেন সৎ পথ আপনাদের শক্তির উৎস। এই মহাসত্য বারবার প্রমাণীত হয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে আপনারা যেভাবে এগিয়ে চলেছেন তা উজ্জল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। যে পেশাকে সুদক্ষ সাংবাদিক নেশা হিসাবে গ্রহণ করে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ২৪. ২. ১৯৯৫ইং।

তামাক শিল্প সঞ্চয়ের নয়, সঙ্কটের

বাংলদেশে প্রায় দেড় কোটি পুরুষ ধূমপায়ী ও পঞ্চাশ লক্ষ মহিলা ধূমপায়ী রয়েছে। যদি প্রতিদিন প্রত্যেক ধূমপায়ী গড়ে একটি সিগারেট পোড়ান, তাহলে প্রতিদিন দু'কোটি সিগারেট পোড়ান হয়। একটি সিগারেটের গড় মূল্য পঞ্চাশ পয়সা হলে প্রতিদিন এক কোটি টাকা পোড়ান হচ্ছে। যার অর্থ বছরে পোড়ান হচ্ছে ৩৬৫ কোটি টাকা।

ধূমপানের পরোক্ষ প্রতিফল অসংখ্য। তামাকের বিষাক্ত উপাদান রক্তের মাধ্যমে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাহিত হতে পারে বলে সেগুলোর একটিও ক্ষতির প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়না। তামাকজনিত রোগের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার প্রধান। শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সার তামাকজনিত। এর পরে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ও হৃদরোগের স্থান। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের শতকরা ৮০ ভাগ এবং করোনারী হৃদরোগের শতকরা ২০ ভাগ তামাকজনিত।

এসব সত্ত্বেও তামাকের বিপজ্জনকতা সম্বন্ধে ধূমপায়ীরা, বিশেষতঃ উঠতি তরুণবয়স্করা সজাগ নয়। এর কারণ তামাক হল ধীর বিষ এবং নিঃশব্দ ঘাতক। উঠতি বয়সে এর প্রভাবে পড়তে হয় এবং যখন সমাজে সৃষ্টিশীল অবদান রাখার সময় আসে তখন জীবনের অবসান ঘটে এর হাতে। ধূমপানের অভ্যাস গড়ার ২০ থেকে ৩০ বছর পর এর কুফল প্রকাশ পেতে থাকে। যদি কেউ ১৫ বছর বয়সে ধূমপান শুরু করে, তাহলে ৩৫ বছর বয়সে, যখন সে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে উপনীত, তাকে আক্রান্ত হতে হয় রোগে-ব্যাধিতে। তত দিনে সে হয়ত বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছে। তার ঘরে এসেছে দু'একটি সন্তান। এ সময় ফুসফুসের ক্যান্সার বা হৃদরোগে তার মৃত্যু হলে তার ওপর নির্ভরশীল গোটা পরিবারের ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে।

তামাকজাতীয় দ্রব্য প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ লোককে হত্যা করছে। এর অর্থ হচ্ছে আগামী দশকে ৩ কোটি লোক এর হাতে নিহত হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকার করেছে তামাক হত্যাকারী বিষাক্ত পদার্থ। তারপরও বৈধ পদার্থ হিসেবে তামাকজাতীয় দ্রব্যের অস্তিত্ব টিকে আছে। তামাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে নিকোটিন। এর মাদক শক্তি হিরোইন, এলকোহল, মারিজুয়ানা এবং কোকেইন থেকে বেশি। এরপরও তামাকশিল্প বেঁচে আছে। এ ঘটনা টাকার প্রতি অন্ধ লোভের হীন সাক্ষ্য।

জাতীয় অর্থনীতিতে তামাকশিল্পের অবদান বস্তুত কূট কাহিনী। বিশ্ব ব্যাংকের একজন অর্থনীতিবিদ তামাক ব্যবহারের লাভ–ক্ষতির ওপর সমীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁর হিসাবে দেখান হয়েছে তামাকের ব্যবহার ১,০০০ টন বাড়লে লাভ হয় ২৬ লক্ষ মার্কিন ডলার। ক্ষতি হয় ২ কোটি ৯৮ লক্ষ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ মোট ক্ষতি হয় ২ কোটি ৭২ লক্ষ মার্কিন ডলার।

প্রতি বছর সারা বিশ্বে তামাক ব্যবহারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন হলে বিশ্ব তামাক বাজার প্রতি বছর ২,০০০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষতি সাধন করছে। স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর তামাক ব্যবহারের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে বিশ্ব ব্যাংক একটি তামাক নীতি ঘোষণা করেছে যার উল্লেখযোগ্য প্রথম চারটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

ক. স্বাস্থ্য খাতে বিশ্ব ব্যাংকের ক্রিয়াকলাপে তামাকজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয় ;

খ. তামাকজাতীয় দ্রব্যের উৎপাদনে, প্রক্রিয়াজাতকরণে ও বিপণনে বিশ্বব্যাংক সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করে না ;

গ. যতটা সম্ভব, পরোক্ষভাবেও বিশ্ব ব্যাংক তামাক উৎপাদনে অর্থ ঋণ দেয় না ;

ঘ. বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে প্রক্রিয়াজাত অথবা কাঁচা তামাক, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও সম্পৃক্ত অন্যান্য সেবা আমদানি করা যায় না।

বিশ্বব্যাপী তামাকবিরোধী আন্দোলন জোরদার হবার মুখে তামাকশিল্পের একজন কর্মকর্তা সদম্ভে ঘোষণা করেছেন উন্নত বিশ্বে ধূমপানের হার হ্রাস পেলেও তাঁদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তাঁরা এখন উন্নয়নশীল বিশ্বে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। উন্নত বিশ্বে ১.১% হারে তামাকসেবী হ্রাস পেলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে তা ২.১% হারে বাড়ছে।

তামাক প্রতিরোধে এখন নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। তামাকের ওপর কর বাড়ান নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এই কর বাড়ালে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল এতে বিশেষ করে তরুণ ও দরিদ্রদের মধ্যে তামাক সেবন হ্রাস পায়। দেখা গেছে সিগারেটের দাম ১০% ভাগ বাড়ালে ৪.২% হারে তামাকসেবনের পরিমাণ কমে যায়। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা বর্ধিত দামের মুখে সিগারেট পানের মাত্রা কমাতে বাধ্য হয়। উঠতি তরুণদের বেলায় ১০% ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ১৫% ভাগ ব্যবহার হ্রাস ঘটায়।

১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত তামাক নীতি বিষয়ক ইউরোপীয় সম্মেলনে সমস্ত তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সাধারণ কর ছাড়াও অতিরিক্ত ১% লেভির সুপারিশ করা হয়। এই অতিরিক্ত লেভি থেকে আসা অর্থ তামাকবিরোধী কর্মকাণ্ডে ব্যয় করারও সুপারিশ করা হয়।

মনে হয় বাংলাদেশ সরকার তামাকের ওপর কর বাড়াতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এ দেশে দরিদ্র জনতার মধ্যে ধূমপানের প্রকোপ বেশি। অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন তামাকের ওপর কর বাড়ালে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর বোঝা হবে। এই ধারণা ঠিক নয়। অনেক সমীক্ষায় দেখা গেছে তামাকজাতীয় দ্রব্যের দাম বাড়ার ফলে দরিদ্র জনতা তা ব্যবহার করতে পারে না কিংবা পুরনো অভ্যাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। উন্নত বিশ্বে এ কৌশল প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া তামাকের ওপর কর বাড়ালে তাতে কেউ বাধা দেয় না, যেমন বাধা দেয় মদের ওপর কর বাড়ালে। তামাক শিল্প চুপ করে বসে থাকবে না। তারা তাদের বিপুল সম্পদ নিয়োগ করবে নিজেদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য। যদি শাসকবর্গ নির্দিষ্টভাবে কর বাড়ানোর পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাহলে তা মেনে নিতে তামাকশিল্প বাধ্য হবে। বিশ্বের অনেক দেশে এমনটি ঘটেছে।

রাজস্ব বাড়ানর এবং নিরীহ জনতাকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে তামাকের ওপর কর বাড়ান যখন বিশ্বের নানা দেশে একটি সফল পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, তখন সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই যে তা বাংলাদেশেও সফল হবে না।

তামাকের চাষ কমালে বেকারত্ব দেখা দেবার আশঙ্কা অবাস্তব। এই ধারণা বস্তুত তামাকশিল্পপতিরা সৃষ্টি করেছে এবং জোরদার প্রচারণা--কৌশলের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। অথচ তামাকের বিকল্প চাষ করলে আরো বেশি লাভ হতে পারে। মরিচ, আলু, রসুন, তুলা এমন কয়েকটি শস্য। এই ব্যাপারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং বিকল্প–চাষীদের উৎসাহ দেবার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডাঃ হিরোশি নাকাজিমা বলেন : 'তামাকে ব্যয়ের পরিমাণ দুঃখজনক শারীরিক বৈকল্য পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায়। তেমনি, বিশ্বের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও তামাক ধ্বংসকর। . . . এ খাতে যে স্বল্পমেয়াদী আয় হয় তা মেনে নিলেও প্রতি বছর তামাকের দরুন সারা বিশ্বে ২০০০ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। এই অর্থ পাওয়া গেলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করা সম্ভব হতো। . . . তামাক মহামারী প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সফল কতগুলো পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে এবং সেভাবে তামাক বিক্রি বৃদ্ধি রোধ

করা সম্ভব। এই পদক্ষেপগুলো স্বাস্থ্য খাতের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে, একই সময়ে রাজস্ব আয়কে সর্বোচ্চ করবে এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমাবে।

সমরাস্ত্র বিক্রি অব্যাহত রাখার জন্য যুদ্ধ বাধিয়ে তোলা সমীচীন নয়। তামাক তেমন ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের চেয়ে কম কিছু নয়।

আমরা আশা করব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের উপদেশ বৃথা যাবে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আমরা জনগণের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি আনয়নে কৃতসঙ্কল্প। যে অস্ত্র ঐ দুটোকেই ধ্বংস করে তাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। কাজেই তামাকশিল্প সঞ্চয় আনে না, আনে সঙ্কট।

অনুবাদ : আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম।

দৈনিক জনকণ্ঠ ৩১. ৫. ৯৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

ধূমপান বিসর্জনে মসজিদের ইমাম

নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আধূনিক

তামাক ও ধূমপান এ দুই বিষপান। এই মহাসত্য এখন প্রতিষ্ঠিত। বিতর্কের ঊর্ধ্বে। যে পশ্চিমা দেশগুলোতে সর্বপ্রথম এ মারাত্মক অভ্যাসের যাত্রা শুরু, সেখানে এখন এর বিপর্যয় আরম্ভ হয়েছে। তামাকবিরোধী আন্দোলন সেখানে জোরদার। সমাজ-সচেতন সর্বস্তরের লোক এই আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। চিকিৎসক, গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এমনকি রাজনীতিবিদ্‌সহ সকল পেশার লোক এই আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি জানিয়েছেন। ফলে পশ্চিমা তথা উন্নত দেশগুলোতে ধূমপানের হার বৎসরে শতকরা ১.১ হারে কমে আসছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধূমপায়ীর হার বেড়ে চলেছে বৎসরে শতকরা ২.১ হারে। যথাসময়ে এর গতিপথে যদি রাধার সৃষ্টি করা না হয়, উন্নয়নশীল দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক লোক এ মারাত্মক অভ্যাসের শিকার হবে। ফলে তামাক ও ধূমপানের কুফল প্রতিফলিত হবে সমাজের প্রতি স্তরে। অকাল মৃত্যু, কর্মক্ষমতা হ্রাস, কাজে অনুপস্থিতি, বর্ধিত শিশু মৃত্যুর হার ইত্যাদিতে সমাজ বিপন্ন হবে। অন্যদিকে বিস্তৃত তামাক চাষ এদেশের মাটিতে শুধু বিষ উৎপাদন করবেনা বরং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা বলে চিহ্নিত।

উন্নতমানের অধিক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন এখানে অপরিহার্য, অথচ জমির পরিমান শহর, শিল্প, বাসস্থান গড়ে উঠার ফলে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এমন একটা পরিস্থিতিতে তামাকের চাষ সম্প্রসারণ শুধু আমাদের নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ নয়, জাতির জন্য ক্ষমাহীন অপরাধ। প্রশ্ন উঠতে পারে তামাক চাষে যারা জড়িত, তাদের কি হবে। এর জবাবে বলব, কর্মসংস্থানের নামে আমরা কি দেশে বিষের চাষ উৎসাহিত করব। এর কি কোন বিকল্প নেই।

কৃষিবিদ্‌দের গবেষণা প্রমাণ করেছে তামাকের বিকল্প চাষ সম্ভব। তুলা, মরিচ, আলু ইত্যাদি নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য তামাক চাষের জমিতে চাষ করা সম্ভব এবং লাভজনকও বটে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। এর পিছনে রহস্য কি? প্রতি বৎসর তামাক কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া রাজস্বখাতে বিপুল অর্থ সরকারকে উৎসাহিত করে। তাঁদের আশংকা এমন বিরাট অংকের বোঝা অন্যকারো পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। বিকল্প চাষ আর কতইবা দেবে। গভীরভাবে চিন্তা করলে সহজেই যে মহাসত্য চোখের সামনে

ভেসে উঠবে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। রাজস্বখাতে তামাকের আয় তাৎক্ষণিকভাবে লোভনীয়। কিন্তু এর পরিণাম ভয়াবহ। তামাকজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা অর্থনৈতিক বিচারে আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন করে তা ভেবে দেখতে হবে। শুধু অকালমৃত্যুর কারণে নয় আরো নানাভাবে অর্থনীতিতে এর প্রভাব এখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। 'তামাক শিল্প সঞ্চয়ের নয়, সংকটের' এ মহাসত্য এখন স্বীকৃত। স্বাস্থ্য খাতে তামাকজনিত রোগের পিছনে ব্যয় এর আয়ের চেয়ে বহুগুন বেশি। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারী পর্যায়ে তামাকের বিকল্প ব্যবস্থা যত দ্রুতগতিতে কার্যকরী হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হয় না। শুধু প্রচারকার্যে তামাক শিল্প যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে থাকে, অনেক উন্নয়নশীল দেশে বাজেটের পরিমাণ তার চাইতেও অনেক কম। শুধু প্রচার-মাধ্যমে নয় আর্থিক দিক দিয়ে প্রশাসনকে উৎকোচের মাধ্যমে এরা প্রভাবিত করে নানাভাবে। এমনকি জাতীয় নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রতিনিধিকে এদের আর্থিক সাহায্য প্রদান পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক রাজনৈতিক নেতাকে যে প্রভাবান্বিত করেছে তারও প্রমাণ রয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে বিষের ব্যবসা থেকে মুক্তি পেতে হলে সবকিছুর আগে যে উদ্যোগের প্রয়োজন সেটা হলো তামাকের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করে তোলা। বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী প্রতিষ্ঠান 'আধূনিক' জনগণকে সজাগ করে তোলবার প্রচেষ্টায় বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সেগুলো হলো

- ধূমপানমুক্ত বংগভবন এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়।
- তামাকের বিকল্প চাষে উৎসাহিতকরণ।
- স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তামাকের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে প্রবন্ধ সংযোজন।
- অভ্যন্তরীণ বিমানে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ।
- অনেক প্রতিষ্ঠানকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা।

উপরোল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি জনগনকে নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত করেছে। তবে সে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে বিশেষ করে শিক্ষিত সামাজে। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণ ধূমপান সম্বন্ধে এখন কিছুটা ওয়াকিবহাল হলেও এ বদ-অভ্যাস বিসর্জনে তাদের উৎসাহ এখনো জোরালো হয়েছে বলে বুঝা যায় না। তাদেরকে উৎসাহিত করবার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা কিছুটা অভিনব হলেও সম্ভাবনাময়। ধূমপান বিষয়ক জারিগান এবং টেলিভিশনে এর কুফল সম্বন্ধে প্রচার, ছাত্রদের মধ্যে বির্তক প্রতিযোগিতা ধূমপান বিসর্জনে অনেকটা সহায়ক হলেও এসকল ব্যবস্থা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্ব সাম্প্রতিক কালে 'আধূনিক' ধর্মভিত্তিক ধূমপানবিরোধী প্রচারণা শুরু করেছে। বাংলাদেশের

শতকরা ৯৫ জন মুসলমান। সারা বাংলাদেশে দুইলক্ষের অধিক মসজিদ রয়েছে। এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে এক বা একাধিক মসজিদ নেই। প্রতিটি মসজিদের ইমাম জনগনের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের ধর্মীয় উপদেশ সহজ সরলপ্রাণ জনসাধারণ শ্রদ্ধাভরে পালন করতে উৎসাহী। একটি প্রচারপত্রের মাধ্যমে প্রতিটি মসজিদের ইমামকে ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপানের অবস্থান বর্ণনা করে সকল ইমামকে ধূমপানবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের আগে তাঁদের বক্তৃতার অংশ হিসাবে বলার জন্য নেশা সৃষ্টিকারী ধূমপান ইসলামের দৃষ্টিতে কেন হারাম বিবেচিত হবে, সে বিষয়ে এ প্রচারপত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছে।

এতে যে সকল যুক্তি দেখানো হয়েছে তার সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো।

ক) তামাক ও ধূমপান বিষের সমতুল্য

কারণ সিগারেট ও বিড়ির ধোঁয়া অসংখ্য বিষাক্ত পদার্থের সমষ্টি, যেগুলো সিগারেটের/বিড়ির তামাক পোড়ার ফলে তৈরী হয়। শরীরে এমন কোনও অংগ-প্রত্যংগ নেই যেগুলো এই ধোঁয়ার বিষের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পারে।

ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন সাদা, জর্দা, গুল সেবনের ফলে বিভিন্ন ধরনের গলার ক্যান্সার হতে পারে। মুখগহ্বর ও শ্বাসনালীর ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে সামান্য লক্ষণাবলীর জন্য প্রায়ই গুরুত্বসহকারে দেখা হয় না। যখন এগুলো চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে, তখন রোগের মাত্রা এতটা ছড়িয়ে যায় যে যথাযথ চিকিৎসা আর সম্ভবপর হয় না। তাই বলা হয় তামাক ও ধূমপান এ দুই বিষপান।

খ) আত্নহত্যা ও নরহত্যা

বিশ্বব্যপী এখন স্বীকৃত যে তামাক হত্যাকারী। তামাক ব্যবহারের ফলে কোটি কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। কাজেই যে ব্যক্তি এই বিষ সেবন করে সে আত্নঘাতী।

বাবা -মা ধূমপান করলে তা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ঘন ঘন শ্বাসরোগ সৃষ্টি করে। এতে স্থায়ী শ্বাসরোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পায় এবং শৈশবে ও কৈশোরে ফুসফুসের কার্যক্রম ও বিকাশ ব্যহত হয়। ....পরোক্ষ ধূমপান প্রকৃত প্রস্তাবে একধরণের অনৈচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক ধূমপান। কারণ এক্ষেত্রে কোনও ধূমপায়ী ব্যক্তির ত্যাগ করা ধোঁয়া প্রশ্বাসে টেনে নিতে বাধ্য হন।

একজন অধূমপায়ী ফুসফুসের ক্যান্সার রোগীর মৃত্যুর অন্যতম কারণ তাঁর সহকর্মীদের, যাঁদের সংগে তিনি একই কক্ষে দিনের পর দিন কাজ করেন কিংবা থাকেন।

কাজেই ধূমপান আত্নহত্যা ও নরহত্যার সমতুল্য। বলা বাহুল্য, ইসলামে আত্নহত্যা এবং নরহত্যা হারাম।

গ) ধূমপান একটি নেশা

ধূমপান এখন একটি নেশা বলে প্রতিষ্ঠিত। তামাকের উল্লেখযোগ্য উপাদান নিকোটিন একটি শক্তিশালী নেশা সৃষ্টিকারী। কেউ তামাক সেবন শুরু করলে ভবিষ্যতে মদ পর্যন্ত এগুনোর সম্ভাবনা থাকে।

যে কোন ধরনের নেশা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, নিঃসন্দেহে হারাম।

ঘ) ধূমপানজনিত অগ্নিকান্ড ও সম্পদ নষ্ট

সারা বিশ্ব জুড়ে ধূমপানজনিত অগ্নিকান্ডের ঘটনা অনেক। লন্ডনে পাতালরেলের র্দুঘটনা থেকে শুরু করে নানা অগ্নিকান্ডের জন্য ধূমপানের আগুনকে দায়ী করা হয়। তাই অনেক দেশের পাতাল রেল এখন ধূমপানমুক্ত।

বাংলাদেশের ফায়ার ব্রিগেডের হিসাব অনুযায়ী বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার সম্পদ সিগারেট/বিড়ির আগুনে পুড়ে নস্ট হয়। এর মধ্যে গ্রামের অগ্নিকান্ডের হিসেব ধরা হয়নি। কারো ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হারাম। আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলেন ঃ 'নিজেদের হত্যা বা ধ্বংস ক'রো না, কারণ অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের উপর পরম করুনাময়'।

ঙ) অর্থের অপচয়

পবিত্র কোরান বলে অতিব্যয় অথবা অপব্যয় হারাম। তামাকের জন্য অর্থব্যয় স্পষ্টতঃই অপব্যয় এবং ইসলামে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তামাকের পেছনে টাকা ব্যয় করতে গিয়ে গরীবেরা খাবারের টাকা নষ্ট করে এবং ধূমপায়ী পরিবার অপুষ্টিতে ভোগে। আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমাদের সম্পদ অযৌক্তিকভাবে উড়িয়ে দিও না। অপব্যয়ীরা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ভাই। অপব্যয় ইসলামে হারাম'।

চ) পরিবেশ দুষণ

তামাকের ধোঁয়া পরিবেশ দুষিত করে। এই ধোঁয়ায় অসংখ্য বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এসব পদার্থ ক্যান্সার এবং অনেক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অধূমপায়ীদের জন্য এই ধোঁয়া ভীষণ ক্ষতিকর। পাশের কিংবা একই কক্ষের অধূমপায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থকেন। এ কারনে অনেক দেশে আইন করে

কর্মস্থলে ধুমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'তামাকমুক্ত কর্মস্থল' বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি শ্লোগান। ইসলামের বিধান মতে অপরের ক্ষতি করা, পরিবেশ দূষণ করা ও স্বাস্থ্যের অনুপযোগী করা হারাম।

এ সকল তথ্য ইমামদের মাধ্যমে প্রচারিত হলে প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান এই বদ-অভ্যাস বিসর্জন দেবে এমন প্রত্যাশা অবাস্তব নয়। এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে এদের প্রভাব সমাজের প্রতিস্তরে প্রতিফলিত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ধুমপান বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হবে, সামাজিকভাবে যার প্রভাব পড়বে সকলের উপর।

লেখকের অন্যান্য বই

১৯৬৩ A Simplified Tuberculosis Control Programme for East Pakistan.
১৯৬৪ Tropical Eosinophilia.
১৯৬৯ Symposium On Medicine.
১৯৭৪ Essentials of Medical Treatment.
১৯৭৭ Medical Diagnosis And Treatment (First Edition).
১৯৭৮ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কথা
১৯৭৮ History of IPGMR.
১৯৮০ Medical Diagnosis And Treatment (Second Edition).
১৯৮৪ প্রেসক্রিপশন (প্রথম সংস্করন)
১৯৮৫ Prescription And Professionals.
১৯৮৫ প্রেসক্রিপশন (দ্বিতীয় সংস্করন)
১৯৮৬ প্রেসক্রিপশন (পশ্চিম বঙ্গ সংস্করন)
১৯৮৬ পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (প্রথম সংস্করন)
১৯৮৭ Medical Diagnosis And Treatment (Third Edition).
১৯৯০ পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (দ্বিতীয় সংস্করন)
১৯৯১ তামাক ও ধূমপান : অভিমত - প্রশ্ন - উত্তর
Tobacco Smoking :
Opinions — Question — Answer.
১৯৯১ জীবন স্রোতে
১৯৯২ সবাক বিবাক : The Voice of Conscience.
১৯৯৬ কিছু ভাবনা
১৯৯৬ Some Thought.
১৯৯৬ ভাসানী ও শেখ মুজিব (যন্ত্রস্থ)

জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম এ দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠ আই.পি.জি.এম.আর.-এর রূপকার --- 'ফাউন্ডিং ফাদার' হিসেবেই কেবল নন, অসামান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও তৃতীয় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় ওষুধ নীতির অন্যতম স্রষ্টা হিসেবেও বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। কর্তব্যানুরাগ তাঁকে শুধু মহান মানুষে পরিণত করেনি, গত পাঁচ দশকের সাধনা ও ত্যাগ তাঁকে গড়ে তুলেছে এক প্রতিষ্ঠানে। তাঁর চিকিৎসা, সংস্পর্শ, জনভাষণ, গবেষণা ও প্রশাসন এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বাইরে দূর-গাঁয়ে জনজীবনে তাঁর মিশে যাওয়ার দিকগুলো লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। মওলানা ভাসানীর অন্তিম দিনগুলো কেটেছে তাঁরই কাছে। ১৯৮৯ সনে বঙ্গভবনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করার কথা প্রেসিডেন্ট এরশাদ উচ্চারণ করেছেন এ ব্যক্তিত্বকে কাছে রেখে।

জন্ম তাঁর ১৯২৮ সালে ১লা এপ্রিল, চট্টগ্রামে। মা বেগম গুলমেহের তাঁর জীবনে অপরিমেয় প্রভাব রেখেছেন। বাবার নাম সৈয়দুর রহমান। তাঁর দু'মেয়ের নাম দীনা ও নীনা ইসলাম, এক পুত্র আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম। আনোয়ারা ইসলাম তাঁর সহধর্মিণী।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৯৫১-র এম.বি.বি.এস. প্রফেসর ইসলাম বিলাতের ওয়েল্‌স ভার্সিটির টি.ডি.ডি.তে প্রথম স্থান অধিকার করার পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রথম পরীক্ষাতেই এম.আর.সি.পি. (এডিন) হয়েছিলেন '৫৬ সনে। ঢাকা, মিটফোর্ড এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার পর '৬৩ সালে আবার তিনি যান বিলাতে, এবার নাফিল্ড ফেলোশীপে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। এখানেই যকৃৎ রোগের উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়। ব্রিটিশ সাময়িকী তাঁকে অভিহিত করেছে আই.পি.জি.এম.আর.-এর ফাউন্ডিং ফাদার বলে। '৬৫ থেকে ৮৭-র ৩১শে মার্চ জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাঁর হাতে। লন্ডন রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস '৬৭তে বিনা পরীক্ষায় এম.আর.সি.পি. ডিগ্রী দিয়েছে তাঁকে। এ অঞ্চলে এ বিরল সম্মান এটাই ছিল প্রথম। আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতেক গবেষণা নিবন্ধ। একাডেমী অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক বিজয়ী এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী '৬৩র প্রেসিডেন্ট পদক, '৮৫র কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, '৭০-এর সিতারা-ই-ইমতিয়াজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৯০ এবং ১৯৯২-এর স্মারক স্বর্ণপদক, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ভারতের গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পদক এবং পাকিস্তানের মদিনাতুল হিকমতের ওসিকা-এ-আতরাফ ও মহাত্মা এম. কে. গান্ধী অহিংস শান্তি পুরস্কার, নরওয়ে, সহ বহু পদক অর্জন করেছেন। বিশ্বনন্দিত 'আধুনিক', আই.এ.এইচ.এস. এবং ইউ.এস.টি.সি.র (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের) তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ইসলামিক মেডিকেল মিশন তাঁরই সৃষ্টি। মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, জাতীয় এইডস কমিটি, জনসংখ্যা কাউন্সিল, বার্ডেম ন্যাশনাল কাউন্সিল, একাডেমী অব সায়েন্সেস ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাংলায় তাঁর পুস্তক 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ', গ্রন্থ 'প্রেসক্রিপশন' ও ইংরেজিতে 'মেডিকেল ডায়াগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট' আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। সুলেখক, অমায়িক ও জনসেবক এ চিকিৎসক রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকসহ অজস্র পেশার মানুষের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। জাতীয় অধ্যাপক ডা: ইসলাম আজও এ দেশের সর্বস্তরের আর্ত মানুষের কাছে নিজেকে হাজির করছেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অক্লান্ত সমাজসেবীরূপে।

— না. মো.

USTC

CENTRAL LIBRARY

IASH

9580

Call no. DS423

ISBN 984-30-0188-4